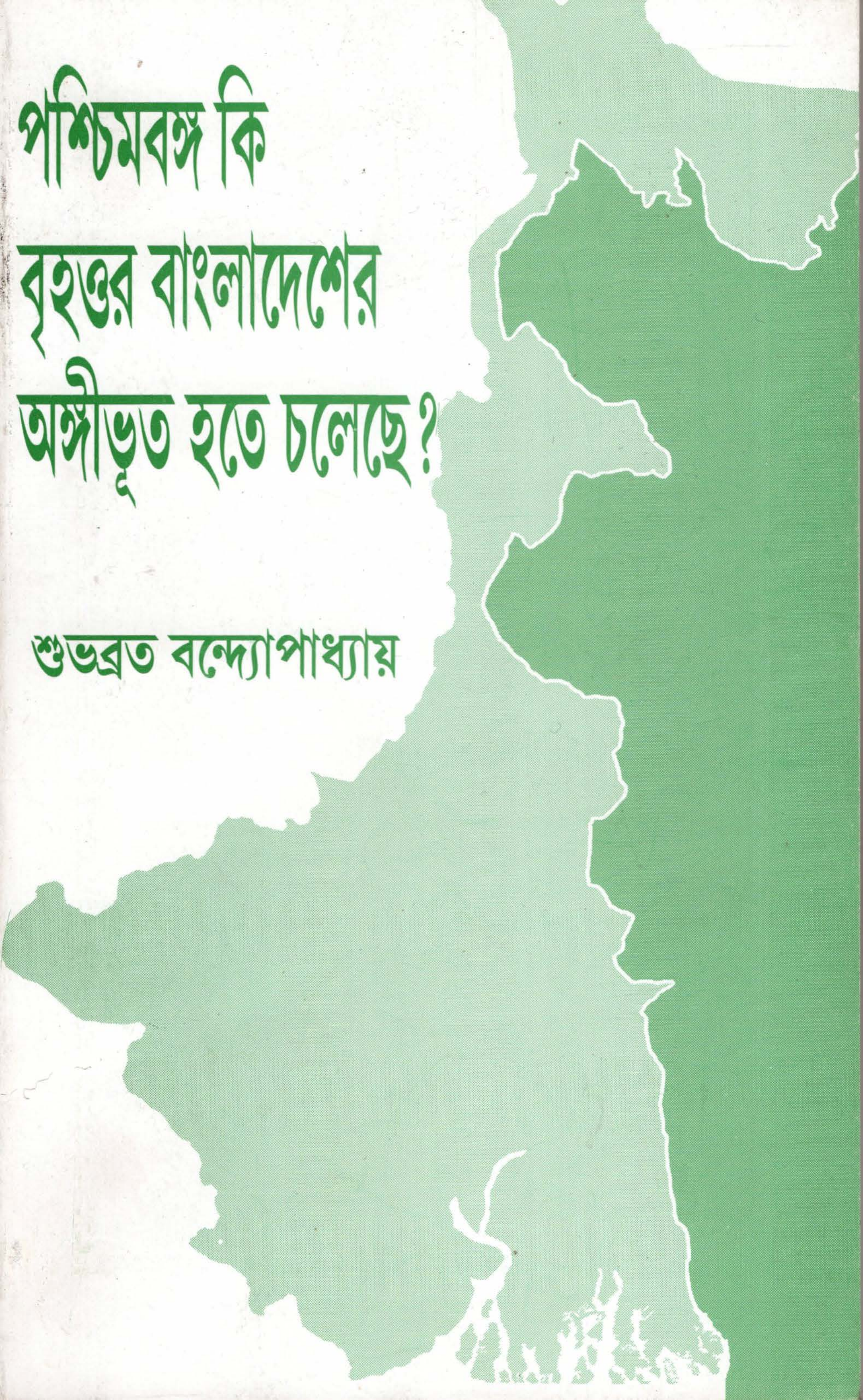
পশ্চিমবঙ্গ কি বৃহত্তর বাংলাদেশের অঙ্গীভূত হতে চলেছে?

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়





লেখক পরিচিতি

অবসরপ্রাপ্ত ম্যানেজার ট্রাফিক ডিপার্টমেন্ট, দুর্গাপুর স্টীল প্লান্ট। বারাণসীতে মাতুলালয়ে, ১৯৩৫ সালে জন্ম। পৈত্রিক বসতবাটি অবিভক্ত বাংলার রংপুর জেলার ঘড়িয়ালডাঙ্গা গ্রামে। দেশভাগের সময় সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র, পিতামাতার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা। প্রথম দু বছর নবদ্বীপে মাতুলালয়ে, পরে ১৯৫০ সাল থেকে কলকাতায় পার্কসাকাসে বসবাস। সুরেন্দ্রনাথ কলজিয়েট স্কুল এবং সুরেন্দ্রনাথ কলেজে পড়াশোনা। পরে কর্মসূত্রে ভিলাই স্টীল প্লান্ট এবং বিদেশে স্টীল কোম্পানী অব ওয়েলস্, জন সামারস্ অ্যান্ড সন্স প্রভৃতিতে শিক্ষানবিশির পর দুর্গাপুর স্টীল প্লান্টে কর্মজীবন। সে কারণে ৩৩ বছর দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীর বাসিন্দা। ৯৩ সালে অবসর-এর পর থেকে চন্দননগরের স্থায়ী বাসিন্দা। ১৯৪৬ সালে বারাণসীতে সঙ্ঘের সংস্পর্শে আসা। পরে ১৯৪৮ সালে নবদ্বীপে এবং দুর্গাপুরে থাকাকালীন সঙ্ঘের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ। ১৯৯৪-তে রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ। পরে বীতশ্রদ্ধ হয়ে রাজনীতির সংশ্রব ত্যাগ করে বিভিন্ন গঠনমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ। বিভিন্ন পত্রিকায় লেখালিখি শুরু। কয়েকটি পুস্তক, পুস্তিকার রচয়িতা।

পশ্চিমবঙ্গ কি বৃহত্তর বাংলাদেশের অঙ্গীভূত হতে চলেছে?

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

বি.এস.সি, এম.এ, এম.আই.আই.এম, এ.এম.আই.আই.আই.ই

পি. আর. কুণ্ডু

কলকাতা - ৭০০ ১২৯

পশ্চিমবঙ্গ কি বৃহত্তর বাংলাদেশের অঙ্গীভূত হতে চলেছে?

লেখক শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

Paschembanga Ki Brihattara Bangladesher Ongibhuta Hote Choleche?

by Shbhabrata Bandyopadhyay

প্রথম প্রকাশ : শুভ দীপাবলী ২৪ অক্টোবর, ২০০৩
দ্বিতীয় প্রকাশ : ২৩শে জানুয়ারী ২০০৫
তৃতীয় প্রকাশ : ২৬শে অক্টোবর শ্যামাপূজা, ২০১১

প্রকাশক : প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডু
পি-৪৭, এল আই সি টাউনশিপ
মধ্যমগ্রাম, কলকাতা ১২৯

মুদ্রাকর : ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রাঃ লিঃ
গঙ্গানগর, কলকাতা ১৩২

মূল্য : ৬০ টাকা

উৎসর্গ

যাঁর সান্নিধ্যে এসে এবং রচনাবলীতে সমৃদ্ধ হয়ে
আমার এই প্রয়াস সেই শিবুদার (প্রয়াত শিবপ্রসাদ রায়)
স্মৃতিতে নিবেদিত হল। — লেখক

মুখবন্ধ

(প্রথম প্রকাশ)

ইংরাজীতে একটা কথা আছে old wine in a new bottle। বাংলায় বলা যেতে পারে পুরোনো কথা নতুনভাবে বলা। বর্তমান পুস্তিকাটির বিষয়বস্তু একরকম তাই। প্রশ্ন উঠতে পারে এর প্রয়োজনীয়তা কোথায়? প্রয়োজন এটাই যে অধিকাংশ হিন্দু বাঙালীদের কোন কথা একবার বা দুবার বললে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না। করলেও বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। তাই একই কথা বারবার বলা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। পুস্তিকাটিতে পুরোনো কথা তো বটেই একই কথা একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বিস্তারিতভাবে নয়, সংক্ষিপ্তাকারে। কারণ অধিকাংশ ঘটনা বা তথ্যই সাম্প্রতিক কালের এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে সংগৃহীত। অনাবশ্যকভাবে পুস্তিকাটির কলেবর বৃদ্ধি করা হয়নি। সাম্প্রতিক কালের ঘটনাগুলি পর্যালোচনা করে পাঠকবর্গ দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সচতেন হবেন এবং নিজেদের কর্তব্য স্থির করবেন এটাই প্রত্যাশা।

পুস্তিকাটির অসম্পূর্ণতা ও ভুল ত্রুটিগুলি সচেতন পাঠক আমাদের জানিয়ে সংশোধনের সুযোগ দিলে বাধিত থাকব।

প্রকাশক

লেখকের অন্যান্য বই

১। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ইসলামিক জেহাদ

২। আরবের দাস বাজার এবং ভারতের ইসলামাইজেশন

৩। ইসলামীস্তানের পথে হিন্দুস্থান

প্রকাশকের নিবেদন

আমার জীবনের ধ্রুবতারা অগ্নিযুগের বিপ্লবী মেজর জ্যোতিশ্চন্দ্র জোয়ারদার, জেল জীবনের এক চিঠিতে, দেশপ্রেমিদের উদ্দেশ করে লিখেছিলেন, "শুধু কর্তব্যের চলা, সে যে 'লগি-ঠেলে উজান চলা। তার কোন সার্থকতা নেই, সে কথা বলবো না। তবে তাতে কতদূরইবা এগুনো যায়। অথচ ভেতর থেকে চলার ইঁশারা যে পায়, সে তো শুধু একা চলে না, আরও দশজনকে চালিয়ে নিয়ে যায়।' আমার জীবনে, এই উপলব্ধি বা উপদেশ যাই বলুন, কতখানি বাস্তবায়িত করতে পেরেছি, বলতে পারবো না। তবে চেষ্টার যে ত্রুটি করিনি তার প্রমাণ আমার জীবনের প্রতিটি বাঁকে ধরা আছে।

দেশহিতৈষী দেশসেবক শ্রী শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় আমার নবলব্ধ বন্ধু। তাঁর 'ইসলামীস্তানের পথে হিন্দুস্থান' শীর্ষক পুস্তকটি প্রকাশের পর "পশ্চিমবঙ্গ কি বৃহত্তর বাংলাদেশের অঙ্গীভূত হতে চলেছে?" শীর্ষক পুস্তকটি প্রকাশের দায়িত্বও স্বেচ্ছায় আমি গ্রহণ করেছি। আশা আছে, প্রথমটির মতো এটিও, পথভ্রষ্ট, দিকভ্রষ্ট, বঙ্গসন্তান তথা ভারতবাসীর চৈতন্যের উদয় ঘটাবে।

ভারত আজ ঘর ও বাহির থেকে শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত। এখনো যদি তারা আত্মরক্ষার কাজে সচেষ্ট না হয় তবে অনতিবিলম্বেই দেশটি 'ইসলামীস্থানে' পরিণত হবে। স্বয়ং ভগবানও এই হতভাগ্য দেশটিকে রক্ষা করতে পারবেন না। লেখকের এই হুঁশিয়ারী যেন পাঠক অনুধাবন করে যথাকর্তব্য স্থির করেন। ইতি—

বিনীত
প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডু

মধ্যমগ্রাম, কলকাতা ৭০০১২৯
১৪.১০.২০১১

লেখকের কথা

বর্ধিত কলেবরে ৩য় প্রকাশ প্রসঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় গ্রামে গঞ্জে যে সমস্ত ঘটনা প্রায়ই ঘটছে তা ভীতিপ্রদ এবং আতঙ্কজনক। অথচ পশ্চিমবঙ্গের বিদ্বজনেরা এ সব নিয়ে ভাবিত নন, চিন্তিত নন কারণ এ ধরনের সংবাদ, বহুল প্রচারিত সংবাদ পত্রগুলিতে প্রকাশিত হয় না। প্রচার মাধ্যমগুলিতেও এ ধরনের ঘটনা প্রচারিত হয় না, বা হলেও এমনভাবে হয় যাতে প্রকৃত ঘটনা প্রতিফলিত হয় না। অত্যন্ত সামান্য কারণে সশস্ত্র মুসলমানরা দলবদ্ধভাবে হিন্দু এলাকাগুলি আক্রমণ করছে, বাড়ী, ঘর, দোকান ভাঙচুর করছে লুঠপাট করছে তারপর অগ্নিসংযোগ করছে। হিন্দু কিশোরী বা তরুণী অপহরণ এবং শ্লীলতাহানি এখন নিত্যনৈমিত্তিক সংবাদে পর্যবসিত। সরকারি বা বেসরকারি জমিতে পাঁচিল তুলে দিয়ে দখল নিচ্ছে মসজিদ বা কবরস্থান করার নামে। রাজনৈতিক নেতাদের মদতে এবং পুলিশ প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তায় এরা দিনকে দিন উদ্ধত, বেপরোয়া আর দুঃসাহসী হয়ে উঠছে। এদের গগণচুম্বী ঔদ্ধত্যের কারণে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় ফাঁকা পেয়ে হিন্দুবাড়ীতে ঢুকে হিন্দু কিশোরীকে ধর্ষণ করে। দিনের বেলা প্রকাশ্যে রাস্তায় স্কুল ফেরৎ মুসলমান ছাত্রীদের চলে যেতে দিয়ে হিন্দু ছাত্রীদের ধর্ষণ করে তাদের অচৈতন্য, নগ্নদেহ, রাস্তার ধারে ফেলে রাখে। বহুদিন ধরে চলে আসা হরি সংকীর্ত্তনে বাধা সৃষ্টি করে, এমন কি ফাঁকা রাস্তায় হিন্দু তরুণীকে একা পেলে জোর করে গাড়ীতে তুলে নিয়ে গণধর্ষণ করে তারপর রাস্তাতেই অচৈতন্য দেহ ফেলে দিয়ে চলে যায়। অর্থাৎ যে সমস্ত ঘটনা পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশে ঘটে, সেগুলি এখন পশ্চিমবঙ্গেই প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। কিন্তু মুসলমানদের হিন্দু নারীদের প্রতি এত আকর্ষণের কারণ কি? মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস, কাফের রমণী ধর্ষণ করলে এন্তেকালের পর বেহেস্তের পথ সুগম হয়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার কমলা বক্তৃতামালায় বলেছিলেন : কাফেরের মেয়ে শাদী করলে এন্তেকালের পর বেহেস্তের চির বসন্তময় রাজ্যে যৌবনবতী হুরীদের নিয়ে সুরা সেবন করে আনন্দে থাকা যায়। সম্ভবতঃ তাই।

দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে, হিন্দুদের ওপর মুসলমানদের অত্যাচারের ঘটনাবলী এখন পশ্চিমবঙ্গেই অবাধে ঘটে চলেছে। এর প্রধান কারণ পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গলাদেশী মুসলমানদের অবাধ অনুপ্রবেশের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল গড়ে ওঠা, রাজনৈতিক নেতাদের প্রশ্রয় এবং পুলিশ প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা। বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলি তো বটেই, হলদিয়ার নিকটবর্তী নয়াচরে ২০০টি বাংলাদেশী মুসলিম পরিবার আগ্নেয় অস্ত্রসহ জবরদস্তি বসবাস করছে। স্থানীয় বাসিন্দারা আগ্নেয়াস্ত্রর ভয়ে চুপ। প্রশাসন নির্বিকার।

জেলাশাসক বলছেন "খোঁজ নিয়ে দেখছি।" এদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ, ক্যানিং, বাসন্তীসহ সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপ বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের দখলে চলে গেছে। আশঙ্কা অমূলক নয়, ঘটনাবলী যেভাবে ঘটে চলেছে তাদের অচিরে পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশের অঙ্গীভূত হবে, যদি না প্রশাসন সক্রিয় হয়, কঠোর ব্যবস্থা না নেয়।

এত কিছু ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু নির্বিকার। তারা ব্যস্ত রবীন্দ্রসার্ধ শতবর্ষ আর পদ্মার ইলিশ নিয়ে তাছাড়া আছে শারদোৎসব। দেশ ভ্রমণ, বইমেলা পিক্‌নিক সহ আরও অনেক কিছু। তাছাড়া বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক মধুর করার একটা সরকারি প্রচেষ্টা চলছে। এখন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হয় এমন কোন কিছু করা বা বলা উচিত নয়। কিন্তু এঁরা কি একবারও চিন্তা করেন না এদের স্ত্রী, কন্যা, ভগিনীরা যখন মুসলমান দুষ্কৃতীদের দ্বারা আক্রান্ত হবেন, ধর্ষিতা হবেন, তখনও কি এঁরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নেশায় বুঁদ হয়ে থাকবেন? তখনও এঁরা "একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান" গান গাইবেন? জানা নেই।

পুস্তকটির বিষয়বস্তু হিন্দু সমাজকে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করার একটা প্রচেষ্টা মাত্র। বিভিন্ন ঘটনাবলী সংগৃহীত হয়েছে, বিভিন্ন সংবাদপত্র বিশেষ করে 'স্বদেশ সংহতি সংবাদ' থেকে। প্রাসঙ্গিকতা রক্ষার কারণে একই ঘটনা একাধিকবার উল্লেখিত হয়েছে। তবে এর প্রয়োজনীয়তাও এটাই যে, অধিকাংশ বাঙ্গালী হিন্দুর কোন কথা একবার দুবার বললে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না। করলেও বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। তাই একই কথা বারবার উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়। রাজনীতি-বিতৃষ্ণ সাধারণ মানুষ পুস্তকটি পাঠ করে কিছুটা সচেতন হলে পরিশ্রম সার্থক হবে।

যাঁর অনুপ্রেরণা এবং সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এই পুস্তক প্রকাশ করা একেবারেই সম্ভব হত না তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী অগ্রজপ্রতিম শ্রীপ্রিয়রঞ্জন কুণ্ডু মহাশয়। নানারকম শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও নানাভাবে তিনি আমাকে উৎসাহিত করেছেন, অনুপ্রাণিত করেছেন এবং তাঁর ৮৮ বছর বয়সেও প্রকাশনার সব দায়িত্ব নিজে বহন করেছেন। তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। তাঁকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

প্রথম পর্ব

কিছুদিন আগের ঘটনা। এক প্রতিবেশী ভদ্রলোক আমার বাড়ী এসেছিলেন একটু আলাপ পরিচয় করতে। এ পাড়ায় নতুন এসেছেন। কোন এক কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। বর্তমানে অবসর প্রাপ্ত। কিছুক্ষণ আলাপচারিতার পর আমাকে একটা বই দিয়েছিলেন। ওনারই লেখা। মুখে বললেন পড়ে দেখবেন। পাঁচ সাত দিন পর আবার এলেন। একথা সে কথার পর জিজ্ঞাসা করলেন ওনার বইটা আমি পড়েছি কিনা। আমি হ্যাঁ বলাতে জিজ্ঞাসা করলেন বইটা কেমন হয়েছে। আমি বললাম "বই-এর শুরুটা তো বেশ ভালই হয়েছে। তবে সবই তো বরিশাল আর বরিশালবাসীদের নিয়ে লেখা। বরিশাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসে কে কোথায় আশ্রম বানিয়েছেন কে কোথায় বাড়ি-ঘর করেছেন, কার ছেলে আমেরিকায় রয়েছে, এসমস্ত আমার খুব একটা ভালো লাগার কথা নয়। তবে একটা কথা বুঝতে পারলাম আপনারা বরিশালবাসীরা, বরিশালকে খুব ভালো বাসেন, শ্রদ্ধা করেন। বরিশাল সম্পর্কে আপনাদের খুব উচ্চ ধারণা, আর আপনারা বরিশালবাসী বলে গর্ব অনুভব করেন, বলুন ঠিক কিনা।" ভদ্রলোকের মুখটা আনন্দে জ্বল জ্বল করে উঠল। মুখে বললেন, "আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমরা বরিশালবাসী বলে বেশ গর্ব বোধ করি।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম "এবার তাহলে বলুন আপনারা যে আপনাদের সাধের বরিশাল ছেড়ে, পিতৃপুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এলেন তার কারণ তো কিছু লিখলেন না। ভদ্রলোক হই হই করে উঠলেন, "কেন কারণ তো রয়েছে, বললাম "তাহলে সেটা একবার বলুন না, আমি তো কিছু পাইনি।" ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, "দেশভাগজনিত কারণ।" আমি বললাম "এটা কোন কারণ হল? দেশভাগের সময় কোন নির্দেশ ছিল বা কোন আইন পাশ হয়েছিল পাকিস্তান সরকার, ইংরেজ সরকার বা ভারত সরকারের পক্ষ থেকে যে পাকিস্তানে কোন হিন্দু বাস করতে পারবে না। সেরকম তো কোন আইন বা নির্দেশ ছিল না, তা হলে আপনারা পালিয়ে এলেন কেন?" ভদ্রলোক নিরুত্তর। একটু চাপ সৃষ্টি করাতে বললেন "মুসলমানদের অত্যাচারের ভয়ে।" আমি বললাম, "এটাও ঠিক হল না। মুসলমানদের অত্যাচারের ভয়ই যদি কারণ, তাহ'লে তো আপনারা সবাই মুসলমান হয়ে যেতে পারতেন। তা হলে মুসলমানরা আর অত্যাচার করত না। আর করলেও থানায় নালিশ করলে থানা উপযুক্ত ব্যবস্থা নিত। অপরাধীরা সাজা পেত। আপনারা বরিশালেই পিতৃপুরুষের ভিটে মাটিতে বহাল তবিয়তে বাস করতে পারতেন। চাই কি অন্য যে সব হিন্দু নিজের জমিজমা বাড়ি-ঘর ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল তাদের জমিজমা দখল করে নিজেদের ভূ-সম্পত্তি বাড়িয়ে নিতে পারতেন। সে সব না করে আপনারা পালিয়ে এলেন কেন?" ভদ্রলোক যথারীতি নিরুত্তর রইলেন। বার বার চাপ

সৃষ্টি করেও এবার কোন কাজ হল না যখন, তখন বললাম "যখন ঠিক করেছেন কিছু বলবেন না, তখন আমিই উত্তরটা দিই। আপনারা বরিশালবাসীরা বরিশালকে যতটা ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন তার চেয়ে অনেক বেশী ভালবাসেন অনেক বেশী শ্রদ্ধা করেন হিন্দু ধর্মকে। তাই সেই হিন্দুধর্ম তথা হিন্দুত্ব বাঁচাতে আপনারা আপনাদের, সাধের বরিশাল ছেড়ে, পিতৃপুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে এই পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এসেছেন। আর এখন সে কথা মুখ-ফুটে বলতে লজ্জা পাচ্ছেন। এখন সব কিছু ভুলে গিয়ে নিজেদের জীবিকা আর সংসার নিয়ে মেতে রয়েছেন। মুসলমানদের নির্মম অত্যাচারের বিভীষিকা মন থেকে মুছে ফেলে ধর্ম নিরপেক্ষ সেজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির 'রামধুন' গাইছেন। সত্যিই অদ্ভুত এই মানসিকতা। আপনাদের অনেকে এখনও মাঝে মধ্যে বাংলাদেশে যান। যে সমস্ত আত্মীয়স্বজন এখনও সে দেশে রয়ে গেছেন তাদের সঙ্গে দেখা করতে বা অন্য কোন কারণে। আপনাদের অনেকে আবার পিতৃপুরুষদের ভিটে মাটি পরিদর্শনে যান। গিয়ে দেখেন সেখানে হয়ত একটা মসজিদ বা মাদ্রাসা তৈরী হয়েছে, বা কোন মুসলমান সপরিবারে বাস করছে। আপনাদের বুকের মধ্যে তখন হয়ত একটু চিন্ চিন্ করে ওঠে। কিন্তু ব্যাস ওই পর্যন্তই। আপনাদের অনেকে পিতৃপুরুষের ভিটে থেকে হয়ত এক মুঠো মাটি পরম শ্রদ্ধায় এবং সযত্নে সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। নিজের বাড়ীতে হয়ত বা পুজোর ঘরে সেটা রেখে দেন। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের সগর্বে সেটা দেখান। "দেখ আমার পিতৃপুরুষের ভিটের মাটি।" হয়ত সেখানে গো-কোরবানি হয়েছিল। গো-রক্ত মিশে আছে সেই মাটিতে। সেটা আর মনে থাকে না? সেই গো-রক্ত মিশ্রিত মাটি স্থান পেয়েছে পুজোর ঘরে। মনে এ প্রশ্নও জাগে না আমার পিতৃপুরুষের ভিটেতে অন্যে কেন বাস করবে? আমরা কেন বাস করব না? আমরা তো এ ভিটে বিক্রি করে দিই নি। তবে? পূর্ববঙ্গের ক্ষেত ভরা ধান আর পুকুর ভরা মাছের গল্প হয়, সুপারি আর নারকেল বাগানের গল্প হয়, ইলিশ মাছের গল্প হয়, অহোরাত্র কীর্তন আর খিচুরী ভোগের গল্প হয় অথচ যে অত্যাচার আর নির্যাতনের ভয়ে দেশ ছেড়ে পালাতে হয় সে গল্প হয় না।" অদ্ভুত এই মানসিকতা এ প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে।

১৯৪৬ সালে লাহোরের এক সভায় মুসলীম লীগ নেতা মহম্মদ আলী জিন্না ঘোষণা করেছিলেন যদি ভারত ভেঙ্গে এক টুকরো পাকিস্তান বানাতে পারি তাহলে সমস্ত ভারতবর্ষ ধ্বংস করতে আমার খুব বেশী সময় লাগবে না। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। কিন্তু স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে পাকিস্তান সৃষ্টি করা হল। তখন পাকিস্তান সৃষ্টি করা হয়েছিল কেন? পাকিস্তানের যারা প্রবক্তা তথা মুসলীম সমাজের নেতা তাদের বক্তব্য ছিল হিন্দু এবং মুসলমান দুটো ভিন্ন জাতি। ভিন্ন তাদের আচার, আচরণ, খাদ্যাভ্যাস, উপাসনা পদ্ধতি এবং জীবনযাত্রা প্রণালী। সুতরাং হিন্দুদের সাথে বসবাস করা মুসলমানদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের চাই এক পৃথক বাসভূমি। তাই ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে পাকিস্তান সৃষ্টি করা হয়েছিল। পাকিস্তান হাসিল হওয়ার পর পাকিস্তানের জনক মহঃ আলী জিন্নাহ বলেছিলেন "আমাকে পোকায় কাটা পাকিস্তান দেওয়া হয়েছে।" মহঃ আলী জিন্নার লক্ষ্য ছিল সমস্ত ভারতকে ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করা এবং তার অধীশ্বর হওয়া। কিন্তু আপাতত তাকে পোকায় কাটা পাকিস্তান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল। দেশভাগের পর মহম্মদ আলী জিন্না চেয়েছিলেন লোক বিনিময় করে সমস্ত মুসলমানকে পাকিস্তানে নিয়ে

যেতে এবং পাকিস্তানের হিন্দুদের ভারতে পাঠিয়ে দিতে। তিনি আশঙ্কা করে ছিলেন ১৯৪৬ সালে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে হিন্দুদের ওপর যে নারকীয় অত্যাচার হয়েছিল, দেশভাগের পর হিন্দুরা অবশ্যই তার বদলা নেবে। কিন্তু গদীর লোভে আচ্ছন্ন আমাদের ধান্দাবাজ জাতীয় নেতারা লোক বিনিময়ে রাজী হলেন না। ধর্মের ভিত্তিতে এরা দেশভাগ করলেন কিন্তু লোক বিনিময় করলেন না।

মহঃ আলী জিন্নার এন্তেকাল হয়েছে বহুকাল। কিন্তু তাঁর সেই আশা আকাংখা স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টা রয়েছে অব্যাহত। ভারতের পাকপন্থী পাকদরদী নাগরিকেরা সচেষ্ট রয়েছে ভারতবর্ষকে ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং ইসলামিক আরব রাষ্ট্রগুলিও চাইছে ভারতকে কাফেরীয়ানার দোজখ থেকে মুক্ত করে পবিত্র ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে। মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত এই বিরাট ভূখণ্ডকে ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য প্যান ইসলাম এক পরিকল্পনা করেছে। কিন্তু এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার প্রধান প্রতিবন্ধক ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ হিন্দুপ্রধান দেশ। ১০০ কোটি হিন্দুর বাসভূমি এই ভারতবর্ষ। এই বিরাট হিন্দুভূমিকে ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। পাকিস্তান চারবার ভারত আক্রমণ করেছিল কিন্তু প্রতিবারই পরাজিত হয়েছে। তাই চেষ্টা চলছে সমস্ত ভারতবর্ষকে খণ্ড বিখণ্ড করে ছোট ছোট রাষ্ট্রে পরিণত করা। তারপর সেই ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলিকে কুক্ষিগত করে ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করা অসম্ভব হবে না। তাই সারা দেশে আজ বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। কাশ্মীর আজ অগ্নিগর্ভ, বিচ্ছিন্নতাবাদী কাশ্মীরী মুসলমানরা পাকিস্তানে যোগ দিতে চলেছে। পাঞ্জাব আপাতত শান্ত। তবে সেখানেও খালিস্তানীরা সক্রিয় রয়েছে। তারা স্বাধীন খালিস্তান চাইছে। অসমে আলফা জঙ্গীরা স্বাধীন অসম চাইছে, নাগারা স্বাধীন নাগাল্যান্ড চাইছে, মিজোরা মিজোরাম চাইছে, টি এনভি জঙ্গীরা স্বাধীন ত্রিপুরা চাইছে, গোর্খারা গোর্খাল্যান্ড চাইছে। সম্প্রতি আবার শুরু হয়েছে কামতাপুরী আন্দোলন। একথা আর অজানা নেই যে বিদেশী রাষ্ট্রগুলি এই বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে মদত দিয়ে চলেছে, প্রতি বছর হাজার হাজার পেট্রোডলার এদের জন্য খরচ করছে। কাশ্মীরী জঙ্গী আর খালিস্তানীরা পাকিস্তানে আশ্রয় পাচ্ছে, সাহায্য পাচ্ছে, প্রশিক্ষণ পাচ্ছে, অস্ত্রশস্ত্র পাচ্ছে। আলফা জঙ্গী, টি এনভি জঙ্গী আর মিজোজঙ্গীরা বাংলাদেশে আশ্রয় পাচ্ছে সাহায্য পাচ্ছে। বিদেশী মিশনারীরা নাগাল্যান্ডে মিজোরামে, মেঘালয়ে গোপনে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে, ভারত বিরোধীতায় উস্কানী দিচ্ছে।

আজ কাশ্মীর, পাঞ্জাব, দিল্লী, গুজরাট থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, অসম দেশের সর্বত্র সন্ত্রাসবাদীরা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে, পাকিস্তানি গুপ্তচর বাহিনী আই এস আই-এর মদতে। কাশ্মীরের বিধানসভা ভবন, দিল্লীর সংসদ ভবন, গোধরায় সবরমতি এক্সপ্রেস, অক্ষয়ধাম মন্দির, কলকাতায় অমেরিকান তথ্য কেন্দ্র সব কিছুই সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এহ বাহ্য।

১৯৮০ সালে লন্ডনে ইসলামিক কালচারাল সেন্টার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে ২০০০ সালের মধ্যেই ভারতে মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করতে হবে। আর সেটা সম্ভব করতে হবে কোটি কোটি অনুপ্রবেশ, গণধর্মান্তরকরণ আর অসম্ভব জন্ম হার বৃদ্ধির দ্বারা। North India by infiltration and south India by mass conversion। এর সঙ্গে অসম্ভব জন্মহার বৃদ্ধির স্থায়ী পরিকল্পনা তো থাকছেই। এরজন্যে যত টাকা লাগে আরব

রাষ্ট্রগুলি তা দেবে। তাই সারা দেশে শুধুমাত্র সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি করে প্যান ইসলাম ক্ষান্ত হয়নি। ভারতে মুসলিম জন সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য অনুপ্রবেশ এবং ধর্মান্তকরণে মদত দিয়ে চলেছ। দেশভাগের পর থেকেই কাশ্মীরে মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরা সেখানকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে চলেছে। পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাটের সীমান্ত অঞ্চলগুলিও সুরক্ষিত না থাকায় অনুপ্রবেশকারীদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছিল। তবে এই অনুপ্রবেশকারীদের স্বর্গোদ্যান পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও অসম। বাংলাদেশে দরিদ্র মুসলমানদের প্রভাবিত করে তাদের ভারতে পাঠানোর জন্য প্যান ইসলামের এজেন্টরা গ্রামে গঞ্জে কাজ করে চলেছে। তারা দরিদ্র মুসলমানদের প্রলোভিত করছে এই বলে যে তোমাদের এখানে কাজ নেই, খেতে পাও না। তোমরা ইন্ডিয়ায় চলে যাও সেখানে গেলে অনেক কাজ পাবে সেখানে যাওয়ার ব্যবস্থা, থাকার ব্যবস্থা, সিটিজেনসিপ, রেশনকার্ড সব করে দেওয়া হবে। ক্রমাগত প্রলোভনে দরিদ্র বাংলাদেশী মুসলমানরা প্রলোভিত হচ্ছে আর সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে এসে ঢুকছে। এজেন্টরাও সক্রিয় রয়েছে এদের সীমান্ত পার করিয়ে যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়ার, থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়ার। যাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল তারা পাশপোর্ট ভিসা নিয়ে ভারতে আসছে তারপর ভিসা পাশপোর্ট গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলে এদেশের নাগরিক বনে যাচ্ছে। বছরের পর বছর ধরে এ ভাবে পশ্চিমবঙ্গ অসম, ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ ঘটে চলেছে। গত ৪০-৪৫ বছর ধরে এভাবে অনুপ্রবেশ ঘটছে। অথচ একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া এ ব্যাপারে কোন রাজনৈতিক দল সোচ্চার হয় নি। বরং প্রাক্তন কংগ্রেসী নেতা সুব্রত মুখার্জী মন্তব্য করেছিলেন "বিজেপি জানল কি করে যে এদেশে অনুপ্রবেশ ঘটছে। অনুপ্রবেশকারীরা কি সবাই বিজেপির খাতায় নাম লিখিয়েছে?" অনুপ্রবেশকারীরা এদেশে এসে প্রথম কিছুদিন একটু গোপনে সাবধানে থাকে। তারপর দেখে এদেশে তাদের সাহায্য করার লোকের অভাব নেই। এদেশের মুসলমানরা তো তাদের সব রকমভাবে সাহায্য করছেই। উপরন্তু এদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিও নিজেদের ভোট ব্যাঙ্ক বাড়াবার উদ্দেশ্যে তাদের নানাভাবে মদত দিচ্ছে, কেউ ভোটার লিস্টে নাম তুলে দিচ্ছে কেউ রেশনকার্ডের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জনপ্রতিনিধিরাও নানাভাবে এদের সাহায্য করে চলেছে। ফলে অসম, ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটছে। স্বাধীনতার সময় পশ্চিমবঙ্গের একটি মাত্র জেলা মুর্শিদাবাদ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। কিন্তু এখন মুর্শিদাবাদ ছাড়াও মালদহ, উত্তর দিনাজপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদীয়া, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলাও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। এ ছাড়া বীরভূম, হাওড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলাগুলিতেও মুসলমান জনসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের দশ লক্ষ বিহারী মুসলমান যারা একসময় হুমকি দিয়েছিল ভারতের ওপর দিয়ে লং মার্চ করে পাকিস্তান যাওয়ার, তারা এখন সবাই ভারতের বাসিন্দা হয়ে গেছে। কলকাতার মেটিয়াব্রুজ, খিদিরপুর, গার্ডেনরিচ, পার্কসার্কাস, রাজাবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে এরা পাকাপাকিভাবে আস্তানা গেড়ে বসেছে। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে সীমান্ত থেকে ৫ কিলোমিটার কোন কোন অঞ্চলে ১০ কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকা মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের দখলে চলে গেছে। ঐ সমস্ত এলাকায় হিন্দুরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। বেছে বেছে হিন্দুদের বাড়ী ডাকাতি, গরু, মহিষ, চুরি, হিন্দু মেয়েদের শ্লীলতাহানি বা শ্লীলতাহানির চেষ্টা প্রায়ই ঘটছে। হিন্দুরা নিরাপত্তার অভাব

বোধ করে নিজেদের জমি বাড়ী ফেলে রেখে বা অল্পমূল্যে বিক্রি করে সীমান্ত অঞ্চল থেকে আরও ভেতরে হিন্দু প্রধান অঞ্চলে চলে আসছে। এই সমস্ত কারণে প্রয়োজন হলে বাংলাদেশী সেনা বিনাবাধায় সীমান্ত থেকে ৫-১০ কিলোমিটার ভেতরে চলে আসতে পারবে। ঐ সমস্ত অঞ্চলে তাদের সাহায্য করার জন্য, নানারকম খোঁজখবর দেওয়ার জন্য রয়েছে হাজার হাজার বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারী যারা ঐ সমস্ত অঞ্চলে পাকাপাকিভাবে বসতি স্থাপন করে রয়েছে। বনগাঁ, বারাসাত, বসিরহাট, কৃষ্ণনগর, ধুলিয়ান, মালদহ প্রভৃতি অঞ্চলগুলি বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীতে ভরে গেছে। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ নয়, অসম, ত্রিপুরা এবং বিহারের কিছু কিছু অংশেরও এই একই অবস্থা। কিন্তু উদ্দেশ্য কি? প্রথম উদ্দেশ্য বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা কিছুটা কমিয়ে ফেলা। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ভারতে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, অসম, ত্রিপুরায় মুসলীম সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে বৃহত্তর বাংলাদেশ গঠনের আন্দোলনকে জোরদার করা। বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা মোটামুটি ভাবে ১৬ কোটি। আর ৭/৮ বছরে সেটা হয়ে যাবে প্রায় ২০ কোটি। কিন্তু অত লোকের স্থান সংকুলান ভরণ-পোষণ সে দেশে হওয়া সম্ভব নয়। তাই বাংলাদেশ থেকে হিন্দু বিতাড়ন তো সমানে চলছেই, বাংলাদেশী মুসলমানদেরও সেদেশ থেকে ভারতে চালান করা হচ্ছে। এতে একদিকে বাংলাদেশের লোকসংখ্যা কমান সম্ভব হচ্ছে। অন্যদিকে ভারতে মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটান হচ্ছে। এই সমস্ত অনুপ্রবেশকারীরা আমাদের দেশে শুধু যে সামাজিক বা অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করছে তা নয়। এরা আমাদের দেশের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন করে তুলছে। পশ্চিমবঙ্গকে দ্বিতীয় কাশ্মীর বানাতে চাইছে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় কাশ্মীরের জনসংখ্যার সিংহভাগই ছিল মুসলমান। তাই অল্প সংখ্যক হিন্দু কাশ্মীরী পণ্ডিতকে নিজেদের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হতে হয়েছে। এদের নিজেদের পাকা বাড়ী, আপেল বাগান, শালের কারখানা থাকা সত্ত্বেও এদেরকে আজ দিল্লী, হরিয়ানা, জম্মুর বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরে অসহনীয় পশুর জীবনযাপন করতে হচ্ছে প্রায় ৩০/৩৫ বছর। কাশ্মীর আজ প্রায় হিন্দু শূন্য। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম জনসংখ্যা যে ভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে তাতে খুব শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গ মুসলীম সংখ্যা গরিষ্ঠ অঞ্চলে পরিণত হবে। ফলে সৃষ্টি হবে আর একটা কাশ্মীর। তবে সেদিনেরও আর খুব বেশী দেরী নেই। কারণ পশ্চিমবঙ্গের ৭-৮টি জেলা ইতিমধ্যে মুসলীম সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। এছাড়া হাওড়া, বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলাগুলিও খুব শীঘ্রই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে পরিণত হবে। সুন্দরবন অঞ্চলের কয়েকটি দ্বীপ এখন বাংলাদেশী মুসলমানদের দখলে চলে গেছে। সুন্দরবন অঞ্চলের জম্মুদ্বীপ সংরক্ষিত বনাঞ্চল। পাশপাশি অন্যান্য দ্বীপগুলিতেও বসবাস করতে দেওয়া হয় না। অথচ ঐ সব দ্বীপে নির্বিবাদে বসবাস করছে বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা। যে মরিচঝাপি থেকে ৪০ হাজার হিন্দু উদ্বাস্তুকে নৃশংসভাবে অত্যাচার করে উৎখাত করা হল, সেই মরিচঝাপি এখন চলে গেছে বাংলাদেশী মুসলমানদের কব্জায়। আর এ সব কিছুই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের পরোক্ষ সহযোগিতায়। ঐ সব অঞ্চলে এখন কোটি কোটি টাকার ব্যবসা আর বেআইনী কাজকর্ম হচ্ছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকার সব কিছু জেনে শুনেও বোবা কালা সেজে রয়েছে। মুসলিম ভোট অক্ষুন্ন রাখার জন্য সরকারের কি জঘন্য প্রয়াস। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে ব্যাঙের ছাতার মত মসজিদ এবং মাদ্রাসা গড়ে উঠছে। ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের দশটি

জেলায় ২০৮টি মাদ্রাসা আর ৪৫৮টি মসজিদ গড়ে উঠেছে গত কয়েক বছরে। ঐ সমস্ত মাদ্রাসা এবং মসজিদগুলি থেকে ভারত বিরোধী কাজকর্ম চালানো হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরা অসম এবং বিহারের কিছু অংশ নিয়ে কিভাবে বৃহত্তর বাংলাদেশ গড়া হবে তার পরিকল্পনা করা হয়। যেহেতু ঐ সমস্ত অঞ্চলে হিন্দুরা ইতিমধ্যে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে সেহেতু নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। ঐ সমস্ত অঞ্চলে হিন্দু মেয়েরা শঙ্খধ্বনি বা উলুধ্বনি দিতে পারে না। মসজিদের সামনে দিয়ে প্রতিমা নিয়ে যাওয়া চলে না। সমবেত পূজার্চনা এবং সংকীর্ত্তন করা চলে না। মুসলমানদের আপত্তির কারণে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার কারণে পুলিশ প্রশাসন অনুমতি দেয় না।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর যে ধরনের অত্যাচার চালানো হয় পশ্চিমবঙ্গেও তার মহড়া শুরু হয়ে গেছে আর এতে মদত জোগাচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ। সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া ধানতলার আইসমালি গ্রামের ঘটনা বা কোচবিহারের ঘোকসাডাঙ্গার ঘটনা এরই কিছু বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এরকম ঘটনা ভবিষ্যতে ভয়াবহ আকার ধারণ করবে আর প্রশাসন থাকবে নির্বিকার। কি ঘটেছিল ধানতলার আইসমালিতে আর কোচ বিহারের ঘোকসাডাঙ্গায়? নদীয়া জেলার আইসমালি গ্রামে ২০০৩ সালে ৫ ফেব্রুয়ারী রাত্রি সাড়ে দশটা নাগাদ রাস্তা জ্যাম করে বিয়েবাড়ীর বরযাত্রী বোঝাই একটি বাস আটকানো হয়। ঘটনাস্থল আইসমালির বেলেডাঙ্গা অঞ্চলে নির্মীয়মান মাদ্রাসায় কাছে। বাসের ড্রাইভার স্থানীয় সিটু ইউনিয়নের নেতা সমীর ঘোষ আক্রমণকারীদের কয়েকজনকে চিনে ফেলার অপরাধে দুষ্কৃতিদের গুলিতে প্রাণ হারান। বেলেডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা এবং সিপিএম লোকাল কমিটির সদস্য শহিদুল কারিগর-এর নেতৃত্বে দুর্বৃত্তরা বাসের মহিলাদের বাস থেকে নামিয়ে টেনে হিঁচড়ে কাছের নির্মীয়মান ইব্রাহিমিয়া মাদ্রাসায় নিয়ে যায়। দুর্বৃত্তরা প্রথমে মহিলাদের গয়নাগাটি খুলে নেয়। তারপর জনা ২৫ দুষ্কৃতী প্রায় চারঘণ্টা ধরে মহিলাদের ওপর গণধর্ষণ চালায়। পরে সব মহিলাদের আবার বাসে ঠেলে উঠিয়ে দেয়। ইতিমধ্যে রাত বারটা নাগাদ আরও একটি বিয়েবাড়ীর বাস সেখানে এসে পৌঁছালে একইভাবে আক্রান্ত হয়। কয়েকজন সশস্ত্র ডাকাত বাস ড্রাইভারকে মেরে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে যাত্রীদের সর্বস্ব লুঠ করে। মহিলা যাত্রীদের ব্লাউজ ছিঁড়ে লুকনো গয়নাগাটি কেড়ে নেয় এবং কিছু মেয়েকে ধর্ষণ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঘটনার সময় এক বিশাল জনতা ঘটনাস্থলটি ঘিরে রেখে ডাকাতদের সাহায্য করছিল। ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ডাকাতরা চলে যায় আর সবাইকে শাসিয়ে যায় পুলিশের কাছে মুখ খুললে মরতে হবে। তাই ঘটনার পরও বেশ কিছুদিন এই নারকীয় গণধর্ষণের কথা গোপন থাকে। কিন্তু এলাকার অসুস্থ আহত মহিলাদের দেখে সব কিছু প্রকাশ হয়ে যায়। ঘটনার পরদিন অর্থাৎ ৬ই ফেব্রুয়ারী সকালে দুষ্কৃতীরা ফিরে এসেছিল। তারা মাদ্রাসা ঘরের মেঝে, জল ও ফিনাইল দিয়ে রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলে মেয়েদের ছেঁড়া অন্তর্বাসগুলি এক জায়গায় জড়ো করে পুড়িয়ে দেয়। এরপর পুলিশ এলে পুলিশকে সাহায্য করার জন্য দুষ্কৃতীদের পাণ্ডা শহিদুল কারিগর, আমানুল্লা শৌকত প্রভৃতি পুলিশের সঙ্গেই ঘুরছিল। এই ঘটনাকে বামফ্রন্ট সরকার এবং কয়েকটি সংবাদপত্র সিপিএম-এর স্থানীয় দুই নেতার দ্বন্দ্বের কারণ হিসেবে প্রচার করতে চাইলেও আক্রান্ত বাস দুটি যে অঞ্চলের, সেখানকার হিন্দু গ্রামবাসীরা অভিযোগ করে এই ঘটনা সাধারণ বাস ডাকাতি বা মহিলাদের শ্লীলতাহানির ঘটনা নয়। এক শ্রেণীর মুসলিম দুবৃত্তদের সুপরিকল্পিত জেহাদ, যাতে ক্রমাগত অত্যাচারিত হয়ে

হিন্দুরা ঐ এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়, যেমন পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী অনেক অঞ্চলেই হচ্ছে। এটি একটি মাত্র ঘটনা নয়। ২০০৩ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর ঐ অঞ্চলে চারটি হিন্দু পরিবারের বিয়ে হয়েছিল এবং বিয়েবাড়ীর চারটি বাসই ঐ অঞ্চলে আটক করে ব্যাপক লুণ্ঠন এবং মহিলাদের গণধর্ষণ করা হয়। তবে কোন প্রাণ হানির ঘটনা না ঘটায় এলাকার মুসলমান কম্যুনিস্টরা পুলিশের সাহায্যে ঘটনাগুলি চেপে দেয়।

এবার দেখা যাক কোচ বিহারের ঘোকসাডাঙ্গা অঞ্চলে কি ঘটেছিল? ঘোকসাডাঙ্গার ছেঁড়ামারি ও আশপাশের গ্রামের সর্বময় কর্তৃত্ব সিপিএম নেতাদের হাতে। মূল অভিযুক্ত সমিরুদ্দিন মিঞা স্থানীয় এক সিপিএম নেতা। তার নামে গরু পাচার, মদের ব্যবসা, তহবিল তছরূপ প্রভৃতি নানারকম দুর্নীতির অভিযোগ থাকলেও পুলিশ এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে অপারগ। পুলিশ এখানকার সিপিএম নেতাদের পরামর্শ মতই কাজ করে। ঘটনার সূত্রপাত জয়ন্তী হাটে রাজেন্দ্রনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ে কর্মী নিয়োগ নিয়ে। গৃহবধূ রুনু দাস চাকরীর জন্য আবেদন করেন। বিভিন্ন কারণে চাকরীটি তারই পাওয়ার কথা হলেও নিয়োগপত্র দেওয়া হয় নি। সমিরুদ্দিন মিঞার নিজের প্রার্থী থাকায় রুনু দাসকে চাকরী দেওয়ার বিরোধিতা করেন তিনি। রুণু দেবী জেলাশাসক এবং শিক্ষা দপ্তরে অভিযোগ জানালে তাকে চরম শিক্ষা দেওয়া হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়। এরপর ২০০৩ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে বাড়ীর লোকের অনুপস্থিতিতে তাঁকে গণধর্ষণ করা হয়। গণধর্ষিতা হওয়ার পর মহিলা কিন্তু ভেঙ্গে পড়েন নি। তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গেলে প্রথমে অভিযোগ নেওয়া হয় নি। পরে অবশ্য অভিযোগ গৃহীত হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হলেও মূল অভিযুক্ত সমিরুদ্দিন মিঞাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নি। পরে স্থানীয় পার্টি নেতার নির্দেশে সমিরুদ্দিন আদালতে আত্মসমর্পণ করে। এ সমস্ত কিছু ঘটনার পর সিপিএম নেতা অনিল বিশ্বাস কলকাতায় বসে মন্তব্য করেন মহিলার জীবনযাপন প্রণালী স্বাভাবিক নয়। অর্থাৎ অভিযুক্তদের দোষ খাটো করার চেষ্টা। অভিযোগকারিণী রুণু দাসের জীবনযাপনে কোন অসঙ্গতি দেখেননি শ্বাশুড়ি মায়া দাস এবং ননদ কণিকা দাস। এখানেও দেখা যাচ্ছে সিপিএম তার পার্টিকর্মীদের সবরকমভাবে মদত দিচ্ছে। তাদের দোষ লঘু করে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে।

এখন দেখা যাচ্ছে খোদ পশ্চিমবঙ্গেই বামফ্রন্ট সরকার তথা সিপিএম-এর সরকারি মদতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হাতে সংখ্যাগুরু হিন্দুরা নানাভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে, নানাভাবে তাদের হেনস্থা করা হচ্ছে। কয়েকটি ঘটনা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

১) ডায়মন্ডহারবার মহকুমার ছোট্ট গ্রাম পারুলা। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বসবাস করে। কিছুদিন আগে সেখানে সিপিএম এবং তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের ব্যবস্থাপনায় এক অদ্ভূত লেভি প্রথা চালু হয়েছে। অবশ্যই অলিখিত। একটু স্বচ্ছল আয়ের হিন্দুদের অপেক্ষাকৃত কম আয়ের মুসলমান প্রতিবেশীদের লেভি দিতে হবে। সাম্প্রদায়িক চিহ্নিত হওয়ার ভয়ে অন্য কোন রাজনৈতিকদল এর প্রতিবাদ করেনি। হঠাৎ এক হিন্দু দোকানদার এর প্রতিবাদ করল, লেভি দিতে অস্বীকার করল। লেভি নিতে আসা মুসলমান প্রতিবেশীকে বলল "তোমাকে লেভি দেব কেন? তোমার আয় তো আমার থেকে কম নয়। তুমি চারটে বিয়ে করেছ ১২/১৪টা ছেলেমেয়ে। সেজন্য আমি লেভি দেব কেন? ব্যস্ হই হই করে সব তেড়ে এল। ধর্মে আঘাত? দাঙ্গা বাধে আর কি! তবে নির্বাচনের সময় বলে প্রশাসন সেটা হতে দেয় নি। তবে ১৫০ জন সংখ্যালঘুর ভয়ে ৪০০ জন হিন্দু দিশেহারা।

২) বারাসাতের কাছেই এক শান্ত গ্রাম নাম খামারগাছি। ওখানে গ্রামের এক প্রান্তে এক প্রাচীন বটগাছের গোড়ায় ঠাকুরের থান মনে করে হিন্দুরা পুজো দেয় অনেক দিন ধরে। কিছু দিন ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে কিছু মুসলমান ঐ জায়গা দিয়ে গোমাংস নিয়ে যাচ্ছে। দেবস্থানের কাছে গো-রক্তও পড়ছে। ওখানকার ছেলেরা ভালোভাবে বুঝিয়ে বারণ করেছিল গোমাংস নিয়ে যেতে। মুসলমানরা শোনেনি। ফলে একদিন হাতাহাতি হয়ে গেল। এই গণ্ডগোলের পর পঞ্চায়েত প্রধান সিপিএম নেতা এনামুল হক বিচারসভা বসিয়ে রায় দিলেন যেহেতু এটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সেহেতু গরুর মাংস নিয়ে যাবার হক আছে সবার। অতএব হিন্দু ছেলেদের চার হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে।

৩) ২০০১ সালে ১০ ফেব্রুয়ারী বাসন্তী থানার উত্তর সোনাখালি গ্রামে চারজন স্বয়ংসেবককে নৃশংসভাবে হত্যা করা হল। হত্যার কারণ সিপিএম এবং আরএসপি মদত পুষ্ট স্থানীয় সমাজ বিরোধী তথা নেতা আনোয়ার হোসেন, ইছা লস্কর ইরান সর্দার, জাকির হোসেন প্রভৃতির অত্যাচারে স্থানীয় বাসিন্দাদের অতিষ্ঠ হয়ে ওঠা। সিপিএম, আরএসপি প্রভৃতি স্থানীয় রাজনৈতিক দলগুলির কাছ থেকে কোন সাহায্য না পেয়ে তারা আরএসএস-এর শরণাপন্ন হয়। আরএসএস ঐ অঞ্চলে হিন্দুদের সাহায্যে এগিয়ে আসে আর সংগঠন গড়ে তোলে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে দুষ্কৃতীরা। এরা মাইক লাগিয়ে প্রচার করে আরএসএস-এর শাখায় কেউ গেলে তাকে গ্রামে থাকতে দেওয়া হবে না। এরা আর এসএসএর শাখা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেয়। কিন্তু এদের কথায় ভীত না হয়ে অকুতোভয় ঐ চার স্বয়ংসেবক অভিজিৎ, পতিত পাবন, অনাদি এবং সুজিত নিজেদের কাজ চালিয়ে যায়। ফলে তাদের খুন হতে হল অত্যন্ত নৃশংসভাবে। এই ঘটনায় পুলিশের আচরণ অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। ঘটনার সময় পুলিশকে খবর দেওয়া হলেও পুলিশ আসে রাত্রি সাড়ে দশটায়। অর্থাৎ ঘটনার পাঁচ ঘণ্টা পরে। পুলিশের সি আই আবুল হাসেম জনতার সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেন এবং সকলের সামনেই মৃত দেহগুলিতে লাথি মারেন।

৪) ২০০০ সাল। নারকেলডাঙ্গা মেইন রোড কলকাতা ৫৪, কাদাপাড়া অঞ্চল। কলকাতা পুরসভার ৩১ ও ৩৩নং ওয়ার্ডের সংযোগ রাস্তায় ইদের দিন দুপুরে যখন রাস্তায় লোক প্রায় নেই তখন কে বা কারা রাস্তার অনেকটা জায়গায় গরুর মাংস ছড়িয়ে গেছে। স্থানীয় লোকজন দেখার পর হই চই হয়। পুলিশ-এ খবর যায়। পুলিশ বলে তারা কি করবে? তবে অনেক বলার পর থানা থেকে লোক এসে জায়গাটা পরিষ্কার করে দেয়। পুলিশ ইচ্ছে করলেই দুষ্কৃতীদের ধরতে পারত। কিন্তু সেক্যুলার পুলিশ আইএসআই-এর দালালদের ধরবে না।

৫) ১৯৯৬ সালের ঘটনা। জয়নগরের খাকুরদহ গ্রাম। গ্রামটি মুসলিম প্রধান হলেও একটি বৈষ্ণব মন্দির রয়েছে। প্রধান মোহান্ত হরিসাধন দাস, বয়স ৮২ বছর। প্রতিদিন সন্ধ্যায় মন্দিরে কীর্ত্তন হয়, মাইক ছাড়াই। কিন্তু এতেও মুসলমানদের আপত্তি। তারা মোহান্তকে কীর্ত্তন করতে বারণ করে। মোহন্ত বলেন এটা তার কাজ। সারা জীবন তিনি কীর্ত্তন করে এসেছেন, এখন বন্ধ করতে পারবেন না। ফল পাওয়া গেল সাথে সাথে। রাত্রিবেলা জানলা দিয়ে পেট্রোল কেরোসিন ভেজা কাপড় ঘরে ছুঁড়ে দিয়ে আগুন লাগান হল। জীবন্ত দগ্ধ করা হল ৮২ বছর বয়স্ক মোহান্ত হরিসাধন দাসকে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার অজুহাতে ঐ শবদেহ নিয়ে শোভাযাত্রা করতে চাইলেও সেটা করতে দেওয়া হয় নি প্রশাসন থেকে।

এধরনের ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান প্রধান অঞ্চলে প্রায়ই ঘটছে। তারা মদত পাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার তথা সিপিএম-এর কাছ থেকে। কিন্তু কেন? কমিউনিস্টদের এত মুসলিম প্রীতি কেন? কমিউনিস্টরা চিরকাল মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার পৃষ্ঠপোষকতা আর হিন্দুদের সর্বনাশ করছে কেন? বিশেষ করে ৯০ শতাংশ কমিউনিস্টই যেখানে হিন্দু। খিলাফত আন্দোলনের সময় কিছু ধর্মান্ধ মুসলমান না-পাক ভারত ত্যাগ করে আফগানিস্তানে যায়। তারা আফগানদের সাহায্য নিয়ে ভারত থেকে ইংরেজদের তাড়িয়ে ভারতকে ইসলামিক রাষ্ট্র বানাতে চেয়েছিল। প্রয়াত মানবেন্দ্রনাথ রায় সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্যে এদের দিয়েই তাসখন্দ শহরে ১৯২০ সালের ১৭ই অক্টোবর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা করেন। তাই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির হিন্দু সদস্যরাও হিন্দুদের বিরুদ্ধাচরণ করলেও কখনই মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলে না। সব রকমভাবে তাদের সাহায্য করে। তাই ভারত ভাগ করে মুসলমানদের হোমল্যান্ড পাকিস্তানের দাবী ওঠা মাত্র কমিউনিস্টরা সোল্লাসে ঘোষণা করল The Pakistan is a just progressive and national demand। কমিউনিস্টরা মুসলিম লীগের সঙ্গে গলা মিলিয়ে রাস্তাঘাটে স্লোগান দিতে থাকল "পাকিস্তান মানতে হবে, তবেই ভারত স্বাধীন হবে।" সেই কমিউনিস্টরা এখনও যে মুসলমানদের তোয়াজ করে চলবে সব বিষয়ে মদত দেবে, এতে আর আশ্চর্য কি? পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরাও সব ব্যাপারে সরকারের কাছ থেকে প্রশ্রয় পেয়ে সাহায্য পেয়ে আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে। তারা বুঝে গেছে ভারত ভাগ করে পাকিস্তান সৃষ্টিতে যারা মদত জুগিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গকে বৃহত্তর বাংলাদেশের অঙ্গীভূত করতে তারা সাহায্য করতে পিছিয়ে যাবে না। তাই তাদের ভারত বিরোধী কার্যকলাপ দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে ব্যাঙের ছাতার মত মসজিদ এবং মাদ্রাসা গজিয়ে উঠছে। এক আইবি Report-এ জানা যায় পশ্চিমবঙ্গের দশটি জেলায় ২০৮টি মাদ্রাসা এবং ৪৫৮টি মসজিদ তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে ১২৫টির মত মাদ্রাসা বেআইনি এবং সন্দেহ-জনক। এ রিপোর্টও বহু বছর আগেকার। এর মধ্যে আরও বহু মাদ্রাসা গজিয়ে উঠেছে। বাংলাদেশ থেকে আসা আই এস আই-এর এজেন্ট এবং সন্ত্রাসবাদীরা আশ্রয় নিচ্ছে ওই সমস্ত মাদ্রাসাগুলিতে। ভারতের বুকে অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম চালাবার পরিকল্পনা করা হচ্ছে ওই সমস্ত মাদ্রাসা থেকেই। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলের বহু অংশই ইতিমধ্যেই 'সেমি ইসলামিক' জেলায় পরিণত হয়েছে। ওই সমস্ত অঞ্চলের বসবাসকারী হিন্দুরা সর্বদাই আতঙ্কিত রয়েছে। কার বাড়ী কখন ডাকাতি হবে, ঘরের মেয়ে বা বউকে অপরহণ করা হবে, সেই ভয়ে তটস্থ থাকে। যাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে তারা নিজেদের বাড়ীঘর জমি ফেলে রেখে বা অল্পদামে বিক্রী করে আরও ভেতরে, হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে চলে আসছে। কিন্তু সেও বা কদিনের জন্য? সমস্ত পশ্চিমবঙ্গটাই এখন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যে পরিণত হতে চলেছে। সব কিছু জেনে বুঝে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কিছু বেফাঁস মন্তব্য করে ফেলেছিলেন। এতে যেন ভিমরুলের চাকে ঢিল পড়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সমাজ হই হই করে উঠেছিল। অবস্থা বেগতিক দেখে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় গদী সামলাতে ডিগবাজী খেয়ে মন্তব্য পালটিয়ে ফেললেন। বললেন রিপোর্টাররা ভুল ছেপেছে। তিনি ও ধরনের কথা বলেন নি। এরপর মুখ্যমন্ত্রী "মিঞাদের" নিয়ে রাইটার্সে বৈঠক করলেন। মাদ্রাসার অনুদান বাড়িয়ে দিলেন, তবে "মিঞারা" ঠাণ্ডা হল।

ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। অথচ ধর্মনিরপেক্ষতার নামে চলে চূড়ান্ত ভণ্ডামী। বেআইনী হিন্দুমন্দির ভেঙ্গে দেওয়া হয়। অথচ বেআইনি মসজিদে হাত পড়ে না। হিন্দুদের জন্য এক আইন, মুসলমানদের জন্য "মুসলিম পার্সোনাল ল"। হিন্দুদের তীর্থযাত্রায় তীর্থকর দিতে হয়, মুসলমানদের হজযাত্রায় সরকার থেকে ভর্তুকি দেওয়া হয়। হিন্দুদের পূজায় ছাগবলি বন্ধ করার দাবি ওঠে। অথচ মুসলমানদের ঈদ বা অন্য পরবে কোরবানি বন্ধ করার ব্যাপারে সকলেই নীরব থাকে। মসজিদের ইমামদের সরকার থেকে হাজার কোটি টাকা মাইনে দেওয়া হয়। অথচ দরিদ্র হিন্দু পুরোহিতদের সরকার থেকে একটা টাকাও ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। কয়েকটি উদাহরণ এসব কিছুর যথার্থতা প্রমাণ করবে।

১) যশোর রোড বিরাটি মোড়ে চারটি হিন্দুমন্দির (শিব, কালী, শিতলা, শনি) ভেঙ্গে দেওয়া হল। কেন? না যশোর রোডের সম্প্রসারণ করা হবে। অথচ সেখানেই দমদম বিমান বন্দরের ভেতরে রানওয়ে সম্প্রসারণের জন্য একটি সমজিদ ভেঙ্গে ফেলা দরকার। অথচ সেটি ভাঙ্গা যাচ্ছে না, কারণ মসজিদ কর্ত্তৃপক্ষ তাতে রাজী নয়। সরকার কোন ব্যবস্থা নিতে অপারগ।

২) ১৯৯৯ সালের ৩১শে জানুয়ারী কলকাতা বাবুঘাটে পোর্ট ট্রাস্টের কাছ থেকে লিজ নেওয়া জমি হরিসভা এবং ভাগীরথী সংঘ নামে দুটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বহু দুষ্প্রাপ্য পুঁথি, শিবলিঙ্গ, অষ্টধাতুর বিগ্রহ, পূজার বাসন কোসন প্রভৃতি সহ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল অথচ ঐ একই জমিতে ১০০ থেকে ১৫০ মিটার দূরে বাঁশের দরমা, প্লাস্টিক শীট টালি প্রভৃতি দিয়ে তৈরি মসজিদ (ঝোপড়ি) অক্ষত অবস্থায় রেখে দেওয়া হল।

৩) কলকাতায় ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের মেন গেটের পাশেই ফুটপাথ সম্পূর্ণ দখল করে একটি মাজার তৈরি হয়েছে। ফলে ঐ জায়গায় পথচারীদের চলাচল করতে হয় ফুটপাথ ছেড়ে রাস্তা দিয়ে। এটা আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ বামফ্রন্ট সরকারের নজরে আসে না। ফলে মাজারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে দিন দিন।

৪) পার্ক সার্কাস রোকেয়া পার্ক-এ স্বাধীনতা সংগ্রামের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক চারণ কবি মুকুন্দ দাসের এক মূর্তি বসাবার ব্যবস্থা করেছিল চারণ কবি মুকুন্দ দাস স্মারক সমিতি। এজন্য ঐ কমিটি রাজ্য সরকার এবং কলকাতা পুরসভার লিখিত অনুমোদনও নিয়েছিল। কিন্তু এক ইমাম তার অনুগামীদের নিয়ে ওই মূর্তি বসাতে বাধা দেয়। তাদের বক্তব্য মুকুন্দ দাস একজন কাফের। কোন কাফেরের মূর্তি ওখানে বসানো চলবে না। কারণ ইসলাম ধর্ম মূর্তি বিরোধী। শুধুমাত্র এই নয়, ওই পার্কে মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্তের যে মূর্তিটি রয়েছে সেটাকেও সরিয়ে নিতে বলে হুমকি দেয়।

৫) হিন্দু পাড়ায় যেখানে সেখানে হঠাৎ হঠাৎ মাজার গজিয়ে উঠছে ইদানিং। কিছুই না। পাঁচ বাই তিন হাত জায়গা। সামান্য কয়েকখানা ইট বা বেড়া দিয়ে ঘিরে মাঝে একটু উচুঁ জায়গায় একটা চাদর বিছিয়ে দেওয়া হল, সন্ধ্যেবেলা দুটো মোমবাতি জ্বালানো হতে লাগল। ব্যাস, হয়ে গেল মাজার। শুরু হল পীর ফকিরের আনাগোনা। হিন্দুদের পক্ষ থেকে এর কোন প্রতিবাদ তো হয়ই না। বরং অনেকে নানাভাবে সাহায্য করে থাকেন। কয়েকটি উদাহরণ—

ক) দক্ষিণ কলকাতায় চারু মার্কেটের কাছে হিন্দুপাড়ায় একটা পীরের থান হয়েছে।

খ) টালিগঞ্জ সুপার মার্কেটের পূর্বদিকে একটা মাজার হয়েছে সম্প্রতি।

গ) কলকাতায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে 'মসজিদ ইউসুফ' নামে একটি মসজিদ তৈরি হয়েছে।

ঘ) কলকাতার শ্যামবাজার থেকে মৌলালী পর্যন্ত আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোডে অসংখ্য মসজিদ আর মাজার তৈরি হয়েছে। অথচ রাজাবাজার ছাড়া সমস্ত এলাকাটাই হিন্দু এলাকা। এধরনের আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। হিন্দুদের মনে কোন প্রশ্ন জাগে না যে হিন্দু পাড়ায় এ রকম নতুন নতুন মাজার গজিয়ে উঠছে কেন? এগুলি হচ্ছে সম্প্রসারণ। মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে যা আছে তা তো আছেই। হিন্দু প্রধান অঞ্চলে নিজেদের বিস্তার ঘটানোর প্রচেষ্টা। মাজার তৈরি হলে ক্রমে ক্রমে মুসলমানদের আসা যাওয়া বাড়বে। সুযোগ সুবিধামত দু-চার ঘর মুসলমান বসতি স্থাপন করবে। পরে তাদের সংখ্যাটাও বাড়বে। মুসলমান প্রধান অঞ্চলে হিন্দুরা সপরিবারে থাকতে ভরসা পায় না। অথচ হিন্দু প্রধান অঞ্চলে মুসলমানরা নিঃশঙ্কচিত্তে বাস করে। তারা জানে যে তাদের কোন বিপদ ঘটবে না। কারণ সরকার তাদের সহায়, ক্যাডাররা তাদের খিদ্‌মতগার। শুধুমাত্র এই নয়। হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে মুসলমানরা মাংসের দোকান করছে, ফলের দোকান করছে স্কুটার বা সাইকেল রিপেয়ারিং শপ, পানের দোকান চালাচ্ছে, কাশ্মীরী শালওয়ালারা এসে দোকান দিচ্ছে, বসবাস করছে। হিন্দুরাই ঘর ভাড়া দিচ্ছে। আর হিন্দু ছেলেরা একটা চাকরীর খোঁজে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাশ্মীরী শালওয়ালাদের অধিকাংশই সন্ত্রাসবাদী। কাশ্মীর থেকে নিরাপত্তাকর্মীদের তাড়া খেয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে আশ্রয় নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার পুলিশের পক্ষপুটে শান্তিতে বিশ্রাম নিচ্ছে। পাঞ্জাব থেকে, উত্তরপ্রদেশ থেকে পুলিশ এসে মাঝে মাঝে রেইড করে, উগ্রপন্থীদের এ্যারেস্ট করে। অনেক সময় গুলি বিনিময়ের ফলে ২/১ জন উগ্রপন্থী নিহত হয়। কলকাতা পুলিশ ঘুমিয়ে থাকে। কোন খবরই রাখে না বা চেপে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাশয় পশ্চিমবঙ্গকে একবার মরুদ্যান বলেছিলেন। অবশ্যই মরুদ্যান, তবে উগ্রপন্থীদের, সন্ত্রাসবাসীদের। পশ্চিমবঙ্গ এখন বারুদের স্তূপে পরিণত হয়েছে। রশীদের ডেরায় বিস্ফোরণ ঘটেছিল। তাই সব কিছু জানা গিয়েছিল। এরকম কত ডেরা তৈরি রয়েছে তার খবর কে রাখে? সময় উপযুক্ত হলেই তার বিস্ফোরণ ঘটবে।

সত্যিকথা বলতে কি পশ্চিমবঙ্গে এখন ১৯৪৬ সালের 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে'র পটভূমি তৈরি হয়েছে। কলকাতা শহরের বিভিন্ন মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা এক একটি মিনি পাকিস্তানে পরিণত হয়েছে। কিছু কিছু এলাকায় পুলিশও ঢুকতে ভয় পায়। কলকাতা পুলিশের ডাকাবুকো ডি সি পোর্ট বিনোদ মেহতার কথা আমরা ইতিমধ্যে ভুলে যাই নি নিশ্চয়ই। ১৮ই মার্চ ১৯৮৪। স্মাগলার, দুর্নীতি পরায়ণ পুলিশ এবং অসৎ রাজনীতিকদের ত্রাস কলকাতা পুলিশের দুর্লভ রত্ন ডি.সি. পোর্ট বিনোদ মেহতাকে নির্মমভাবে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হল গার্ডেনরিচের এক কুখ্যাত গলিতে। বিনোদ মেহতার দোষ তিনি দুষ্কৃতীদের ধরতে তাদের ডেরায় ঢুকেছিলেন। হয়তবা ফাঁদ পেতে তাকে ঢোকানো হয়েছিল খতম্ করার উদ্দেশ্য। কলকাতা শহরের বুকে একজন ডেপুটি কমিশনারকে হত্যা করতে পারে যারা তাদের স্পর্ধা, দুঃসাহস এবং শক্তি কতটা তা আন্দাজ করা যেতে পারে। যে চক্র ভাঙ্গতে গিয়ে বিনোদ মেহতাকে খুন হতে হল, সেই চক্র এখনও সক্রিয় রয়েছে, সম্ভবত আরও শক্তিশালী হয়েছে। শুধু কলকাতা নয় মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে বিভিন্ন জেলায় বহু মিনি পাকিস্তান গড়ে উঠেছে, ঐ সমস্ত এলাকায় বাংলাদেশ থেকে আইএসআই-এর এজেন্ট এবং জঙ্গীরা আসছে, নানারকম খোঁজ খবর নিচ্ছে এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা তৈরি করছে। প্যান

ইস্‌লামের এজেন্টরা পশ্চিমবঙ্গকে যখন বৃহত্তর ইসলামিক বাংলাদেশের অঙ্গীভূত করতে নানারকম পরিকল্পনা করছে পশ্চিমবঙ্গবাসী হিন্দুরা তখন নিজেদের জীবিকা, সংসার, দোকান, বাজার, ছেলেমেয়ের পড়াশোনা আর ক্রিকেট দূরদর্শন, দেশভ্রমণ ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। মাঝে মধ্যে অনুৎপাদক রাজনীতি। আমেরিকার আসল উদ্দেশ্যটা কি? সাদ্দাম হোসেন কি বেঁচে আছে, ওসামা বিন লাদেন এখন ঠিক কোথায় আত্মগোপন করে আছে, ভারতের ভূমিকা এখন কি হওয়া উচিৎ ইত্যাদি। আশ্চর্য হতে হয় পূর্ব পাকিস্তান থেকে মুসলমানদের হাতে অত্যাচারিত হয়ে অথবা অত্যাচারের ভয়ে পালিয়ে আসা বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক এবং সাধারণ মানুষদের আচার আচরণ দেখে। এরা নিজেদের স্ত্রী কন্যা বা ভগিনীকে মুসলমানদের দ্বারা ধর্ষিতা বা অপহৃতা হতে দেখে নিজেদের পিতৃপুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এলেন। এবার একটু আশ্রয় অর্থাৎ পায়ের নিচে একটু জমি আর মাথার ওপর একটু ছাদের ব্যবস্থা হতে সব ভুলে গিয়ে "একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান" গান গাইতে শুরু করলেন। নিজেদের পিতৃপুরুষের ভিটে মাটিতে ফিরে গিয়ে ও গান গাওয়ার সাহস নেই। নিজেদের অপহৃতা স্ত্রী, কন্যা বা ভগিনীদের উদ্ধারের কোন সৎসাহস নেই। "হিন্দু, মুসলিম ভাই ভাই, বিভেদ নয় ঐক্য চাই" এসব স্লোগান পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে গিয়ে দেওয়ার সাহস নেই। পূর্ব পাকিস্তান থেকে এরা পালিয়ে এসেছেন বহুকাল আগেই। কিন্তু যারা পালিয়ে আসতে পারেনি, এখনও থাকতে বাধ্য হচ্ছে আর মুসলমানদের হাতে অত্যাচারিত হচ্ছে নির্যাতিত হচ্ছে নিয়মিতভাবে, তাদের জন্য এতটুকু মর্মবেদনা অনুভব করেন না পূর্ব-পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা পূর্ববঙ্গের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক আর সাধারণ মানুষরা। তবে এরা ইরাকে আমেরিকার বোমাবর্ষণের ঘটনায় ক্রুদ্ধ হন। বোমা বিধ্বস্ত ইরাকের জনসাধারণের দুঃখ কষ্টের জন্য বিচলিত হন, বেদনায় কাতর হন। ইরাকী জনসাধারণের জন্য রক্ত সংগ্রহ করেন, অর্থ সংগ্রহ করেন। অথচ স্বজাতীয়, স্বধর্মীয় মানুষদের বিষয়ে উদাসীন থাকেন। এঁরা কেন বুঝতে চাননা এখনও সতর্ক না হলে, সচেতন না হলে অচিরে পশ্চিমবঙ্গ থেকেও পালাতে হবে। তখন এঁরা কোথায় পালাবেন? ওড়িশা, বিহার বা অসমে? কোথাও টিকতে পারবেন না।

২০১১ সালে ভারতে জনগণনা হয়েছে অথচ এখনও ভারতে বা পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যা কত জানানো হচ্ছে না। সরকার জানতে দিচ্ছে না। কিন্তু কেন? শোনা যায় এবারজনগণনায় ধর্মকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ভারতের মোট জনসংখ্যার কতজন হিন্দু, কতজন মুসলমান বা খৃষ্টান, শিখ, বৌদ্ধ ইত্যাদি তা জানা যাবেই না। এটা তো সংঘাতিক। ভারতে যে ভাবে মুসলমানদের জন বিস্ফোরণ ঘটছে তাতে অচিরে তাদের সংখ্যাটা কোথায় গিয়ে ঠেকবে কোনদিনও তা জানা যাবে না। হিন্দুদের বেলায় শ্লোগান হচ্ছে "হম দো, হমারা দো", আর মুসলমানদের বেলায় "হম পাচ হমারা পচিশ"। পরিবার পরিকল্পনার যত কিছু নিষেধাজ্ঞা শুধু হিন্দুদের বেলায়। অন্য সম্প্রদায় যথেচ্ছভাবে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিয়ে চলেছে। ভারতের মুসলমানরা পরিবার পরিকল্পনাকে গুনাহ্ মনে করে। গ্রামে গঞ্জে মুসলিম মহল্লায়, মসজিদে মৌলানা মৌলভীরা প্রচার করে বেড়ায় পরিবার পরিকল্পনা করলে এন্তেকালের পর দোজখে স্থান হবে। তাদের প্রচার যত পার মুসলিমদের সংখ্যা বাড়াও। "পয়দা করে ফায়দা তোল" খাজা নাজিমুদ্দীনের সেই পুরানো স্লোগান নতুন করে কার্যকরী করা হচ্ছে। ১৯৮৩ সালের ২২ ডিসেম্বর আনন্দবাজার

পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায় বাগুইহাটির কাছে হাতিয়ারা পীর সাহেবের ২৬টি বিবি ও ৬৪টি পুত্র কন্যা। বর্ধমানের এক শিক্ষকের ২৩টি সন্তান। এক একটি মুসলমান পরিবারে ১০ থেকে ১৫টি সন্তান অস্বাভাবিক কিছু নয়। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মুসলিম জনসংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা কাজ করছে। কারণ হিন্দু পরিবারগুলির সন্তান সংখ্যা এক বা দুই এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যা ৩০ শতাংশ হয়ে গেছে। অচিরেই পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় কাশ্মীরে পরিণত হবে। তখন কাশ্মীরী হিন্দু পণ্ডিতদের মত হিন্দু বাঙালীদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে অন্য কোন রাজ্যে উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নিতে হবে। অথবা নিহত হবে। বাঙ্গালী হিন্দু হয়ত ভাবছে "মৃত্যু আমার পায়ের ভৃত্য।" তাই বাঙ্গালীর চিত্ত ভাবনাহীন।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইয়ং বেঙ্গল নামে খ্যাত হিন্দু কলেজের প্রতিভাবান কিছু ছাত্র তাদের শিক্ষক হেনরী ডিরোজিওর প্ররোচনায় গোমাংসভোজী হয়ে হিন্দুদের কিছু সংস্কার আচরণ বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের পরম শত্রুতে পরিণত হয়েছিল। তারা হিন্দুধর্মকে হেয় জ্ঞান করত। তারা হিন্দুধর্ম নিপাত যাক, হিন্দুধর্ম মিথ্যাধর্ম' জাতীয় ধ্বনি তুলত। মাধব মল্লিক নামে এক ছাত্র বলেছিল "If there is anything that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism." রাজা রামমোহন সহ তৎকালীন হিন্দু সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের প্রভাবে এবং হস্তক্ষেপে ইয়ংবেঙ্গলদের আন্দোলন খুব বেশী প্রসার লাভ করেনি। বর্তমানে অর্থাৎ এই একবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুধর্মকে ধ্বংস করার জন্য একশ্রেণীর রাজনীতিক আর বুদ্ধিজীবী আদাজল খেয়ে লেগেছেন। এদের কাজ হচ্ছে ছুতো নাতায় হিন্দুধর্মের কুৎসা করা এবং ইসলামের প্রশস্তি করা। এই সমস্ত রাজনীতিক আর বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই রয়েছেন।

মুরতাহিন বিল্লাহ, ফাজলি প্রণীত 'হিন্দুত্ব ও ইসলাম' নামে একটি পুস্তকে হিন্দুধর্ম এবং ইসলামের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। পুস্তকটি মাদ্রাসা মক্তবে ছাত্রদের নাকি পড়ানো হয়। পুস্তকটিতে হিন্দুধর্ম, হিন্দুদের দেবদেবী, অবতার হিন্দু ধর্মগ্রন্থ প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ কুৎসিৎ ভাবে নিন্দা করা হয়েছে। শাস্ত্রজ্ঞান বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান না থাকার জন্য লেখক অন্তর্নিহিত রহস্য উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়েছেন এবং স্থূলভাবে সব কিছু বিশ্লেষণ করতে সচেষ্ট হয়ে কদর্যভাবে সব বর্ণনা করেছেন। অন্যদিকে ইসলামকে শ্রেষ্ঠ এবং মহান ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন, কুরআনকে শ্রেষ্ঠ এবং সর্বোত্তম সাহিত্য বলেছেন। সুকুমারমতি বালক বালিকা সে হিন্দুই হোক বা মুসলমান অথবা শাস্ত্রজ্ঞানহীন যে কোন মানুষ এই পুস্তক পাঠ করলে, হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে তার অত্যন্ত হীন ধারণা এবং ইসলাম সর্ম্পকে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা জন্মাবে। ক্রমশ তারা হিন্দুধর্মকে ঘৃণা করতে শিখবে। পরবর্তী কালে তাদের যদি প্রলোভিত করা হয় তারা সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করবে। শুধুমাত্র এই নয়। স্বামী বিবেকানন্দর বক্তব্য অনুযায়ী হিন্দুর এক বা একাধিক শত্রু বাড়বে। স্বামী বিবেকানন্দ বলে গেছেন হিন্দুধর্ম থেকে একজন চলে যাওয়া মানে শুধুমাত্র হিন্দুর সংখ্যা একজন কমে যাওয়া নয়, হিন্দুর একজন শত্রু বৃদ্ধি পাওয়া। একটা প্রবাদই আছে 'হিন্দু যদি মুসলমান হয় গরু খাওয়ার যম হয়।' সত্যিই ভারতে যে ১০/১২ কোটি মুসলমান রয়েছে তারা তো সবাই ধর্মান্তরিত'। মহাত্মা গান্ধী এবং মহঃ আলী জিন্নাহ্‌র

প্রপিতামহরা ছিলেন দুই সহোদর ভাই। সে যাই হোক, এই সমস্ত ধর্মান্তরিত হিন্দুরা আরও উগ্র হিন্দু বিদ্বেষী হয়ে ওঠে। ১৯৪৬ সালে কলকাতা নোয়াখালি বা পাঞ্জাবে যে, বিভৎসভাবে হিন্দু হত্যা এবং হিন্দু নির্যাতন হয়েছিল সেতো এই ধর্মান্তরিত হিন্দুরাই করেছিল।

বর্তমানে দেশের বুদ্ধিজীবী এবং রাজনীতিকরা যে ভাবে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করছেন, বিকৃতি ঘটাচ্ছেন, তা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। যে সতীদাহ প্রথা এবং প্রথম সন্তানকে জলে বিসর্জন দেওয়ার প্রথা বা নরবলি বহু কাল আগেই বিলুপ্ত রয়েছে সেগুলি নিয়ে এঁরা এখনও ভীষণভাবে সোচ্চার রয়েছেন। এতে বর্তমান প্রজন্ম বা পরবর্তী প্রজন্ম কি জানবে? কি শিখবে? তারা জানবে, তারা শিখবে হিন্দু ধর্ম অতি নোংরা, কদর্য, কুসংস্কারে ভরা কতগলি আচার আচরণ। তারা আরও শিখবে আরও জানবে স্যার যদুনাথ সরকার ঔরঙ্গজেব সম্পর্কে যা লিখে গেছেন সেগুলি সবই ভুলে ভরা। ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার একজন সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিক। মহঃ বিন কাশিম থেকে শুরু করে সুলতান মামুদ, তৈমুর লং, নাদির শাহ, আহমদ শাহ অবদালী এরা আক্রমণকারী ছিলেন বটে, তবে ধর্মান্ধ বা নৃশংস ছিলেন না। এরা কোন হিন্দু মন্দির ভাঙ্গেন নি বরং বহু হিন্দু মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এরা লক্ষ লক্ষ হিন্দু হত্যা করেন নি। হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করেন নি। এরা ধ্বংস করা মন্দিরের বিগ্রহগুলিকে বিভিন্ন মসজিদের বা প্রাসাদের সিঁড়িতে পদদলিত হওয়ার জন্য প্রোথিত করেননি। হিন্দু রমনীদের বন্দী করে নিয়ে গিয়ে গজনী বা আরবের দাস বাজারগুলিতে দাসী হিসেবে বিক্রী করেননি, আরও কত কি। সুতরাং সামান্য প্রচেষ্টা বা প্রলোভনে এদেরকে ধর্মান্তরিত করা যাবে। তাতে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যা লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছলেই পশ্চিমবঙ্গকে কাশ্মীরে পরিণত করার প্রচেষ্টা শুরু হয়ে যাবে। অর্থাৎ যেটা এখন সীমান্ত অঞ্চল এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রয়েছে সেটা সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে পড়বে। সারা পশ্চিমবঙ্গেই এখানে সেখানে আইসমালি ধানতলার ঘটনা ঘটতে থাকবে। খুন ডাকাতি বিশেষ সম্প্রদায়ের কাছে তখন 'জলভাত' এ পরিণত হবে। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের তখন মান আর জান বাঁচাতে কাশ্মীরের হিন্দু পণ্ডিতদের মত নিজেদের বাড়ী ঘর, সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে উদ্বাস্তু শিবিরে অসহনীয় পশুর জীবনযাপন করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু এখনও সচেতন হচ্ছে না, তাঁরা এখনও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বপ্নে বিভোর রয়েছেন আর হয়ত বলছেন "জাগিও না আমায় জাগিও না।" কিন্তু সেদিনের আর বেশী দেরী নেই, যেদিন এদের স্ত্রী কন্যা, ভগিনীদের গায়ে হাত পড়বে। এদের স্ত্রী কন্যা ভগিনীরা যেদিন দুষ্কৃতিদের দ্বারা অপহৃতা এবং ধর্ষিতা হবেন সেদিন এদের চেতনা ফিরবে। কিন্তু তখন বড় দেরী হয়ে যাবে। তখন আর কিছু করার থাকবে না, বুক চাপড়ে আর্তনাদ আর অনুশোচনা করা ছাড়া।

বাঙ্গালীর এই আত্মঘাতী মনোবৃত্তিই বাঙ্গালীর সর্বনাশের কারণ। আমার তো কোন ক্ষতি করেনি, আমি তো আক্রান্ত হই নি, তাহলে আমি শুধু শুধু এ নিয়ে মাথা ঘামাই কেন? বাঙ্গালীর এই মানসিকতা, একটু ভুল হল, হিন্দুর এই মানসিকতা হিন্দু সমাজের সর্বনাশের মূল কারণ। মুসলমান যে সাতশো বছর ধরে ভারতে ক্রমাগত আক্রমণ আর ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পেরেছে তার প্রধান কারণ এই মানসিকতা। একটা হিন্দু রাজ্য আক্রান্ত হয়েছে। পাশের রাজ্যে হিন্দু রাজা নাকে তেল দিয়ে নিদ্রা যাচ্ছেন। পরিণতি

সেই একই। রক্তের হোলি খেলা আর রাজ অন্তঃপুরিকাদের গজনী বা আরবের দাস বাজারে ক্রীতদাসী হিসাবে বিক্রি হয়ে যাওয়া। হিন্দুর এই মানসিকতার কোন পরিবর্তন হয়নি। দেশভাগের পর কয়েক কোটি হিন্দু প্রাণ বাঁচাতে পিতৃপুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে-ভারতে পালিয়ে এলেন তারপর সব ভুলে গিয়ে রামধুন গাইতে শুরু করলেন "ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম সবকো সুমতি দে ভগবান," যে সমস্ত হিন্দু পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে পড়ে রইলেন ভারতে পালিয়ে আসতে পারলেন না বা এলেন না আজ তারা বাংলাদেশে যে অবর্ণনীয় অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন সেকথা পূর্ববঙ্গ থেকে আসা হিন্দুরা একবারও চিন্তা করে দেখেন না। নিজেদের জীবিকা, সংসার আর বিনোদন নিয়ে দিব্যি আছেন। বাংলাদেশে হিন্দুদের জমির ফসল কেটে নেওয়া, পুকুরের মাছ তুলে নেওয়া লুঠপাঠ, ডাকাতি, বাড়ী ঘরে অগ্নিসংযোগ তো নিত্য নৈমিত্তিক, অতি সাধারণ ঘটনা। হিন্দু তরুণী অপহরণ, ধর্ষণ এবং বলপূর্বক শাদি করা আকছার ঘটে চলেছে। পুলিশ প্রশাসন নির্বিকার, কোন কেস্ নেয় না। বরং দুষ্কৃতীরা প্রাণনাশের হুমকি দেয়। এ সমস্ত ঘটনা আজকাল আর বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ নেই। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলগুলিতেও আকছার ঘটছে। এত সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গবাসীর কোন বিকার নেই। তার আফগানিস্তান আর ইরাকে আমেরিকার বোমাবর্ষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার, সেখানকার জনগণের অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের জন্য বিচলিত। নিজের ভালো পাগলেও বোঝে। হিন্দুরা বোঝেনা। নিজের সম্ভাব্য বিপদ জেনে বুঝেও এরা বেশ নির্বিকার থাকতে পারে। এই যখন অবস্থা তখন পশ্চিমবঙ্গকে বৃহত্তর ইসলামিক বাংলাদেশের অঙ্গীভূত করতে অসুবিধে কোথায়? বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের কাছ থেকে পরোক্ষভাবে সব রকম সহযোগিতাই যখন পাওয়া যাচ্ছে। কয়েকটি ঘটনা এর যথার্থতা প্রমাণ করবে।

১। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার-এ মুসলিম সন্ত্রাসবাদীদের বিমান হামলার পরিপ্রেক্ষিতে ধানতলা থানার দত্তপুলিয়া পশ্চিম পাড়ার কয়েকজন হিন্দু যুবক ওসামা বিন লাদেনের কুশপুত্তলিকা নিয়ে দত্ত ফুলিয়া মোড়ে মাইক-এর সাহায্যে ওসামা বিরোধী শ্লোগান দিতে থাকে। এতে স্থানীয় লাদেন অনুগামীরা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। তারা স্থানীয় থানায় ফোন করে জানায়। থানা থেকে লাদেন অনুগামীদের 'খাদিমরা' দ্রুত গাড়ী নিয়ে ঘটনা স্থলে যায় এবং ঐ হিন্দু যুবকদের থানায় ধরে এনে বেদম পেটায়। কোনরকম অভিযোগ ছাড়াই ঐ যুবকদের থানায় দুদিন আটক করে রাখে। মাইকটিও বাজেয়াপ্ত করে রেখে চারদিন পর ফেরৎ দেয়।

২। এই ধানতলা থানারই সীমান্ত গ্রাম মনসাহাটিতে গত ২৫ বছর ধরে প্রতি বছর জৈষ্ঠ মাসের শেষ সপ্তাহে তারক ব্রহ্ম হরিনাম অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। গত বছর একই সময়ে আয়োজন হয়েছিল তারক ব্রহ্ম হরিনামের। কিন্তু প্রতিবেশী এক 'বান্দা'র এসব পছন্দ নয়। তিনি অনুষ্ঠানের কর্ম কর্তাদের অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করে থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। থানা থেকে সশস্ত্র পুলিশ এসে তারকব্রহ্ম হরিনামে উপস্থিত আনুমানিক পাঁচশত ভক্তের ওপর নির্বিচারে লাঠি চালিয়ে অনুষ্ঠান পণ্ড করে দেয়। ভক্তদের জন্য তৈরি প্রসাদ লাথি মেরে উল্টে ফেলে দেয়। গত বছর তারকব্রহ্ম হরিনাম ওই গ্রামে অনুষ্ঠিত হতে পারে নি। যে বান্দার আপত্তিতে ওই গ্রামে তারকব্রহ্ম হরিনাম অনুষ্ঠিত হতে পারে নি, কয়েক বছর আগেও প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যে তার দিন কাটলেও এখন সে ২৫-৩০ লক্ষ টাকার মালিক।

৩) বিদেশী টাকায় খাগড়াডাঙ্গা দত্তপুলিয়া এলাকায় বে-আইনীভাবে মাদ্রাসা তৈরি হচ্ছে স্থানীয় এক মুসলিম নেতার তৎপরতায়। প্রশাসন নির্বিকার।

৪) বছর তিনেক আগে এই থানারই নগরপোতা গ্রামের অষ্টম এবং নবম শ্রেণীর দুই হিন্দু ছাত্রী স্কুল থেকে বাড়ী ফেরার পথে মুসলমানদের দ্বারা অপহৃতা এবং ধর্ষিতা হয়। কিন্তু রাজনৈতিক দাদারা ঘটনাটি চাপা দিয়ে দেয়।

এ ধরনের ঘটনা আকছার ঘটে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে। সাধারণ মানুষের সন্দেহ বাংলাদেশ সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা ডি.জি.এফ.আই.-এর এজেন্টরা প্রচণ্ড রকম সক্রিয় রয়েছে সীমান্ত এলাকায়। বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ কি এতই অপদার্থ যে তারা কোন খোঁজ খবর রাখে না। নিশ্চয়ই নয়। তাহলে এর কারণ কি এই যে মার্কস এবং মহম্মদের অনুগামীরা একজোট হয়ে দেশটাকে কব্জা করতে চাইছে। মহম্মদের অনুগামীরা চাইছে দেশটাকে ইসলামিক রাষ্ট্র বানাতে আর মার্কসবাদীরা চাইছে দেশটাকে মার্কসবাদের পীঠস্থানে পরিণত করতে। কিন্তু কমিউনিস্টরা কি ভুলে গেছে ইন্দোনেশিয়া বা ইরানে কমিউনিস্টদের কি পরিণতি হয়েছিল? ইন্দোনেশিয়ায় ৬২ সালে লক্ষাধিক কমিউনিস্টকে হত্যা করে কমিউনিস্টদের নির্মূল করেছিল সে দেশের তৎকালীন সরকার। ইরাকেও কমিউনিস্টদের নির্মমভাবে কোতল করা হয়েছিল। পাকিস্তান বাংলাদেশ ইসলামিক রাষ্ট্র। সে দেশগুলিতে মার্কসবাদীরা ক'জন আছেন, কেমন আছেন? আমাদের দেশের মার্কসাদীরা কি তা জানেন না? অবশ্যই জানেন। তা সত্ত্বেও তাদের এই মুসলিম প্রীতি রহস্যজনক নয় কি? মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক অক্ষুন্ন রাখার জন্যই এই মুসলিম প্রীতি না অন্য কোন প্রাপ্তি যোগ? মনে হয় গাড়ী, বাড়ী, নানা রকম পুরষ্কার আর মাঝে মধ্যে আমন্ত্রিত হয়ে ঢাকার পাঁচতারা হোটেলের সেবা, যত্ন আতিথ্যের লোভে এরা ভুলে গেছেন কি অবর্ণনীয় অত্যাচার, নির্যাতন এবং অসম্মান সহ্য করতে না পেরে এদের পিতৃপুরুষরা পূর্ব পাকিস্তান-এ নিজেদের ভিটে মাটি ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। অবশ্য খুব বেশী একটা দোষ দেওয়া যায় না বর্তমান প্রজন্মের রাজনীতিক আর বুদ্ধিজীবীদের। কারণ এদের পিতৃপুরুষ যারা একসময় পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসেছিলেন মুসলমানদের অত্যাচারের ভয়ে, তারা পশ্চিমবঙ্গে এসে একটু আশ্রয় পেয়ে ভুলে গেছেন সেই বিভৎস গ্লানিময় দিনগুলির কথা। ফলে তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে জানালেন না কেন তারা পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এসেছিলেন নিজেদের পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে। ফলে বর্তমান প্রজন্ম ১৯৪৬ সালের Great Calcutta Killings আর নোয়াখালির বিভৎস দিনগুলির কথা জানতে পারল না। জানল না তাদের পিতৃপুরুষের জমিজমা, পুকুর, সুপারী বাগান প্রভৃতি কিভাবে মুসলমানরা দখল করে নিয়েছিল। কি নৃশংসভাবে তাদের মা, মাসী, কাকী-ঠাকুমা, দিদিমারা তাদের সম্ভ্রম বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছিলেন তাদেরই বাড়ীর, আশ্রিত অনুগৃহীত মুসলমান চাষী এবং অন্যান্য কর্মচারীদের দ্বারা। তাদের জানতে দেওয়া হল না তাদের মা, মাসী, পিসী, কাকীমা মুসলমানদের দ্বারা অপহৃতা হয়ে ধর্ষিতা হয়ে অপহারক মুসলমানদেরই ঘরণী হয়ে বিবি হয়ে সেই দেশেই রয়ে গেছেন আর এ নিয়ে কোন বিকার নেই, নেই কোন চিত্ত বৈকল্য এদের পিতৃ-পুরুষদের। এরা পশ্চিমবঙ্গে এসে একটু আশ্রয় খুঁজে নিয়ে নিজেদের সংসার জীবিকার্জন বিনোদন আর হরি সংকীর্ত্তন নিয়ে ব্যস্ত রইলেন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসার সময় ট্রেনে আনসার বাহিনীর অকথ্য অত্যাচার, লাথি মেরে জিনিষপত্র ভেঙ্গে ফেলা, জোর করে ট্রেন থেকে নামিয়ে নেওয়া যুবতী মেয়েদের

করুণ আর্তনাদ বাবা আমাকে ফেলে যেওনা, বাবা আমাকে ছেড়ে যেও না সব ভুলে গিয়ে বোধিসত্ব বনে গেলেন। সব নির্বিকার মহাপুরুষ। তাহলে বর্তমান প্রজন্মকে কি কিছুই জানানো হয় নি, জানতে দেওয়া হয়নি? অবশ্যই হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে তাদের জমিজমা সুপারী বাগান, পুকুর, পদ্মার ইলিশ, অহোরাত্র হরিসংকীর্ত্তন আর খিচুড়ী ভোগের গল্প ফলাও করে বলা হয়েছে। গল্প হয়েছে দোল দুর্গোৎসবের পালাগান আর যাত্রার গল্প। কিন্তু মুসলমানদের হাতে মার খাওয়ার গল্প, বেইজ্জৎ হওয়ার গল্প? না না সেসব বলা যায় নাকি? সে সব বলা যায় না। তাই বর্তমান প্রজন্ম কিছুই জানল না সেই বিভীষিকাময় দিনগুলির কথা, ঘরে আসবাবপত্রের মত লুঠ হয়ে যাওয়া তাদের মা, মাসী পিসীদের করুণ পরিণতির কথা। যারা কিছুটা জনে তারা আবার এক কাঠি ওপরে। তারা বলে বেচারা মুসলমানরা কি হিন্দুদের ওপর শুধু শুধু অত্যাচার করেছে নাকি? হিন্দুরা এক সময় মুসলমানদের ওপর ভীষণ অত্যাচার করেছিল, তাই মুসলমানরা ক্ষমতা পেয়ে প্রতিশোধ নিয়েছে। বলা বাহুল্য এদের জ্ঞানের পরিধি শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্প পর্যন্ত, যদিও মুসলমানদের বক্তব্য কোন মুসলমান কখনও মহেশ নাম ব্যবহার করে না এমন কি গরু ছাগলের জন্যও না। শরৎচন্দ্র যে লিখে গেছেন "মুসলমান যদি কখনও বলে— হিন্দুর সহিত মিলন করিতে চাই সে যে ছলনা ছাড়া আর কি হইতে পারে ভাবিয়া পাওয়া কঠিন" সেটা জানা নেই। শরৎচন্দ্র আরও লিখে গেছেন "একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যই, ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই। সেদিন কেবল, লুঠ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্ব হানি করিয়াছে, বস্তুত অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের ওপর যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায় কোথাও কোন সঙ্কোচ মানে নাই। দেশের রাজা হইয়াও তাহারা এই জঘন্য প্রবৃত্তির হাত হইতে মুক্তি লাভ করতে পারে নাই।" বর্তমান প্রজন্ম শরৎচন্দ্র-র এ লেখাগুলি পড়ে নি। তাদের যত দরদ গফুর আর আমিনার জন্য।

শুধুমাত্র এই নয়। বর্তমান প্রজন্মের পিতৃপুরুষের যারা পূর্ব পাকিস্তান থেকে মুসলমানদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে, বেইজ্জত হয়ে, ভিটে মাটি হারিয়ে শুধুমাত্র প্রাণটুকু সম্বল করে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন তারাও পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা প্রয়াত শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর অবদান, বর্তমান প্রজন্মকে কিছুই জানালেন না। ফলে, বর্তমান প্রজন্ম শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সম্পর্কে কিছুই জানল না। স্বাধীনতার প্রাক্কালে দেশ বিভাগ যখন অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল এবং মুসলিম লীগের দাবীর কাছে নতিস্বীকার করে কংগ্রেসের জাতীয় নেতারা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা হেতু সমগ্র বাংলা পাকিস্তানে ঠেলে দিচ্ছিলেন তখন রুখে দাঁড়িয়েছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। তিনি দাবী করেছিলেন, যদি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান গঠন করা হয় তাহলে বাংলার হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলি কেন পাকিস্তানে যাবে? বাংলা ভাগ করে হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলি অবশ্যই ভারতে রাখতে হবে। তৎকালীন ইংরেজ সরকার শ্যামাপ্রাসাদের দাবীর যৌক্তিকতা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই বাংলা ভাগ হয়েছিল, রক্ষা পেয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ। পূর্ববঙ্গের মানুষ তাড়া খাওয়া কুকুরের মত পালিয়ে এসে আশ্রয় নিলেন এই পশ্চিমবঙ্গে। পরে একটু ধাতস্থ হয়ে, একটু আশ্রয় জোগাড় করে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে বঙ্গভঙ্গকারী হিসাবে দোষারোপ করতে শুরু করলেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা হিসাবে স্বীকার করলেন না। পরবর্তী প্রজন্ম জানল ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে বঙ্গ ভঙ্গকারী হিসাবে।

কিছু দিন আগের ঘটনা। ঘটনাটি শুনেছিলাম আমার এক শিক্ষক বন্ধুর কাছে। দিনটা ছিল ২৩শে জুন। শিক্ষক বন্ধুটি স্কুলে দশম শ্রেণীর ছাত্রদের একটি ক্লাস নিচ্ছিলেন। পড়াতে পড়াতে তিনি এক সময় ছাত্রদের একটা প্রশ্ন করলেন। তিনি ছাত্রদের সেদিনের তারিখটা জিজ্ঞাসা করলেন। ছাত্ররা উত্তর দিতে তিনি প্রশ্ন করলেন, "আজকের দিনটা কোন এক কারণে একটা বিশেষ দিন; কেন বলতে পার?" ছাত্ররা কেউ বলল আজ উল্টোরথ, কেউ বলল আজ একাদশী। বেশীভাগ ছাত্রই নিরুত্তর রইল। তখন শিক্ষক বন্ধুটি প্রশ্ন করলেন আচ্ছা তোমরা কেউ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নাম শুনেছ? ছাত্ররা যথারীতি নিরুত্তর। মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। শেষে একজন ছাত্র বলল হ্যাঁ স্যার আমি নামটা শুনেছি, আর কিছু জানি না। "শিক্ষক বন্ধুটি দুঃখ করে বললেন, "দেখুন অবস্থা, বর্তমান প্রজন্মের কাছে পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নামটা পর্যন্ত তুলে ধরা হচ্ছে না। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়কে পশ্চিমবঙ্গের রূপকার বলা হয়। তাঁর নামে কলকাতা শহরে রাস্তা আছে, হাসপাতাল আছে, রেলস্টেশন আছে, পার্ক আছে, নগর আছে, অথচ পশ্চিমঙ্গের স্রষ্টা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর নামটা পর্যন্ত বর্তমান প্রজন্মের কাছে অজানা।"

একদল বাঙালী বুদ্ধিজীবী আছেন যারা বাঙালী বাঙালী করে খুব মাতামাতি করেন এদের যত রাগ হিন্দীওয়ালাদেরওপর। অসমে যখন বঙাল খেদা আন্দোলন চলছিল তখন এরা নির্বিকার ছিলেন। বাংলাদেশ-এ এখনও হিন্দুদের ওপর যে বিভৎস অত্যাচার ঘটে চলেছে তাতে এরা বিন্দুমাত্র ব্যথিত বা চিন্তিত নন। এদের যত আক্রোশ, যত বিদ্বেষ হিন্দীওয়ালাদের ওপর। তাই দিল্লীর তখতে এ বসা বিজেপি নেতাদের এরা সহ্য করতে পারে না। বিজেপির বিরোধীতা করতে গিয়ে সিপিএম এর দলভারী করছে। এই সিপিএম অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি, যে একসময় মুসলীম লীগের দাবী অনুযায়ী দেশভাগ সমর্থন করেছিল, নেতাজীকে তোজোরকুকুর, ফিফ্থ্ কলাম্ ইত্যাদি বলেছিল বাংলার বীর বিপ্লবীদের গোপন খবর ইংরেজ সরকারের পুলিশের কাছে পৌঁছে দিত সেটা আর মনে থাকল না। সিপিএম-এর মিটিং ও মিছিলে শ্লোগান দিতে লাগলেন "হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই, বিভেদ নয় ঐক্য চাই।" মনে থাকল না যে মুসলমানদের অত্যাচার আর বেইজ্জতি সহ্য করতে না পেরেই তারা পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এসেছেন। আর পশ্চিমবঙ্গ যদি মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে তাহলে এখান থেকেও পাততারি গোটাতে হবে। কিন্তু মনে এ প্রশ্ন জাগলো না তখন তারা পালিয়ে যাবেন কোথায়?

পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম জনসংখ্যা বর্তমানে ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ। হয়ত বা আরও কিছু বেশী। অসমে ৪০ শতাংশেরও বেশী। কেরালায় সিপিএম মুসলিম লীগের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে সরকার গঠন করেছিল আর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কেরালার একটি জেলা মোল্লাপুরম মুসলিম জেলা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। ৮০০ হরিজনকে প্রলোভিত করে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হল। সাথে সাথে কয়েক হাজার বছরের মীনাক্ষীপুরমের নাম পালটিয়ে রহমৎনগর করা হল। এগুলো হিন্দুদের মনে কোন দাগ কাটে না। কোন বিকার নেই হিন্দুদের। উত্তরপ্রদেশে এলাহাবাদ শহরের নাম ইলাহাবাদ রাখা হল, শুধুমাত্র মুসলমানদের মনোরঞ্জনের জন্য। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক-এর লালসায় যেভাবে মুসলমানদের প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে পুলিশ এবং প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ পদে মুসলমান নিয়োগ করা হচ্ছে তাতে অচিরে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান মুখ্যমন্ত্রীর দাবী ওঠা অস্বাভাবিক কিছু নয়। হয়ত দেখা যাবে মুসলমানদের দাবীর কাছে নতিস্বীকার করে জনাব

কলিমুদ্দিন সাম্‌সকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী করা হল। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার মুসলিমদের মনোরঞ্জনের জন্য একের পর এক রাস্তাঘাটের নাম পালটিয়ে চলেছেন। ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের নাম রাখা হল মির্জা গালিব স্ট্রীট, কলুটোলার নাম হল মহঃ আলি সরণি, কলিন্‌স লেনের নাম হল সৌকত আলি সরণি। এ সব কিছুর আগে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজের নাম বদলিয়ে রাখা হয়েছে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কলেজ। বাংলার বীর বিপ্লবীদের কারও নাম খুঁজে পাওয়া গেল না। সম্প্রতি আবার লক্ষ্ণৌ-এর নবাব এস ওয়াজেদ আলীর নামে কলকাতা গার্ডেন রিচ-এর নামকরণ করার প্রস্তাব উঠেছে। সুরা আর বাঈজী নাচ ছাড়া নবাবের কি অবদান কলকাতার জন্য সে প্রশ্ন ওঠে না। মুসলমানদের সন্তুষ্ট করে মুসলিম ভোট চাই।

কলকাতায় পার্কসার্কাসে হজ যাত্রীদের জন্য বিশাল হজ নিবাস তৈরি হয়েছে, বামফ্রন্ট সরকারের বদান্যতায়। পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃত টোলগুলি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে উঠে গেলেও মাদ্রাসা মক্তবগুলিতে সরকারি অনুদান বৃদ্ধি পাচ্ছে। উর্দু ভাষা শিক্ষা প্রচারের জন্য ১১৫ কোটি টাকারও বেশী সরকার থেকে ব্যয় করা হচ্ছে প্রতি বছর। এর জন্য টাকার অভাব হয় না। এত করেও শেষ রক্ষা হচ্ছে না। কারণ, 'খায় দায় পাখীটি বনের দিকে আঁখিটি।' মুসলমানদের পরিকল্পনা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা অসমকে বৃহত্তর ইসলামিক বাংলাদেশের অঙ্গীভূত করা। তাই এরা সরকার থেকে সবরকম সুযোগ সুবিধা নিচ্ছে আর তলে তলে নিজেদের সংখ্যাবৃদ্ধি করছে, সংগঠিত করছে, শক্তি বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে, ১৯৪৬ সালের ডাইরেক্ট অ্যাক্‌শন ডের পটভূমি তৈরি করছে। গত দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গে ৭৫০০০ এর মত মসজিদ তৈরি হয়েছে। এত টাকা কে দিচ্ছে? কোথা থেকে আসছে? অথচ বলা হয় অনুন্নত মুসলিম সমাজ। মসজিদের ইমামদের মাইনে দেয় ভারত সরকার। তালক প্রাপ্তা মুসলিম মহিলাদের ভরণ পোষণের জন্য অর্থ জোগায় ওয়াকফ বোর্ডের মাধ্যমে ভারত সরকার। মসজিদের ইমামদের কাজ কি? জাতীয়তা বিরোধী মুসলিম তৈরি করা, ভারতকে ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য জেহাদী তৈরি করা, আত্মঘাতী ফিদায়েঁ তৈরি করা। আর এর জন্য অর্থ জোগাচ্ছে ভারত সরকার। প্রয়োজনীয় সংখ্যক জেহাদী তথা সন্ত্রাসবাদী তৈরি হলে শুরু হবে প্রদীপ জ্বালানো, অর্থাৎ এখন চলছে সল্‌তে পাকানোর কাজ। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাকে শুধুমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলায় পরিণত করার চেষ্টা চলছে তা নয়, ঐ সমস্ত জেলায় বিভিন্ন মসজিদ এবং মাদ্রাসায় মুসলিম তরুণদের মগজ ধোলাই করা হচ্ছে। প্রধান মদতদাতা পাকিস্তানী গুপ্তচর সংস্থা আই.এস.আই. আর বাংলাদেশের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা ডি.জি.এফ.আই.।

বৃহত্তর বাংলাদেশ গঠনের পরিকল্পনা শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গে কুচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বিহারের পূর্ণিয়া, কাটিহার, সহরসা, ভাগলপুর, দুমকা প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলও রয়েছে। এছাড়া রয়েছে বাংলাদেশ সংলগ্ন অসম এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকা। বামফ্রন্ট সরকারের প্রচ্ছন্ন মদতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল আইএসআই-এর এজেন্টদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের ধর্ম নিরপেক্ষতার মুখোশের আড়ালে আইএসআই-এর এজেন্টরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে চক্রান্তের জাল ছড়িয়ে চলেছে। কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ আপাত শান্ত। তবে পরিণত হয়েছে শুকনো বারুদের স্তূপে। যে কোন দিন যে কোন সময়ে ঘটবে বিস্ফোরণ। এক জায়গায় নয়, বিভিন্ন জায়গায়।

হতাহতের সংখ্যা দাঁড়াবে কয়েক লক্ষ। এর সঙ্গে চলবে খুন, জখম, লুঠপাট, নারী নির্যাতন, অপহরণ, ধর্ষণ, বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ। ১৯৪৬ সালে ১৬ই আগস্টের গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস আরও বিভৎস ভাবে আত্মপ্রকাশ করবে। সেদিন রেহাই পাবেন না ধর্মনিরপেক্ষ-তার ধ্বজাধারী সিপিএম বা কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীরাও। ইসলামিক জেহাদীদের কাছে, রাজনৈতিক নেতা আর কর্মীদের "হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই, বিভেদ নয় ঐক্য চাই" শ্লোগানের এক কানা কড়িও দাম নেই। ইসলাম কবুল না করলে কাফের বধযোগ্য। কাফেরদের স্ত্রী কন্যা বাড়ীঘর, সম্পত্তি সব কিছু গণিমতের মাল' আর জেহাদ লব্ধ 'কাফের নারী' মুসলমানদের জন্য বৈধ। ইসলামিক ধর্মতত্ত্ব অনুযায়ী কাফের নারী অপহরণ ধর্ষণ, বলপূর্বক নিকাহ্ করা পরম পূণ্যের কাজ। তাই এই সমস্ত কাজে তাদের উদ্দীপনা থাকা স্বাভাবিক। কাশ্মীরে, পাকিস্তানে, বাংলাদেশে যে কোন অজুহাতে হিন্দু নারী অপহরণ ধর্ষণ প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। কারণ এতে তাদের লালসা চরিতার্থ তো হয়ই উপরন্তু তারা বিশ্বাস করে এতে তাদের আল্লাতালা সন্তুষ্ট হবেন আর তাতে বেহেস্ত-এর দরজা তাদের জন্য উন্মুক্ত হবে। মুসলমানরা যে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হিন্দু হত্যা করে, হিন্দু নারী নির্যাতন করে এর কারণ ইসলামিক ধর্মতত্ত্ব। মহম্মদ সুপারিশ করলে আল্লাহ পাপীদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন আর সৎকাজের জন্য তাদের পুরস্কৃত করবেন। এই বিশ্বাসের জন্যই মুসলমানরা নৃশংসতা করতে ভয় পায় না।

পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, পুলিশেও তেমনই তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনও আছে একটা অঞ্চলের এস.ডি.পি.ও, সি.আই, ওসি. সবাই মুসলমান। কোন মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ অঞ্চলে যদি এরকম হয় তাহলে সে অঞ্চলের সংখ্যালঘুদের কি অবস্থা হবে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। ১৯৪৬ সালে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস এর আগে কলকাতার সমস্ত থানা থেকে হিন্দু পুলিশ অফিসার সরিয়ে নিয়ে মুসলিম পুলিশ অফিসার পোস্টিং করা হয়েছিল। ২/৩টি থানায় এ্যাংলো ইন্ডিয়ান পুলিশ অফিসার। পরিণতি আমাদের অজানা নয়। ১৯৪৬ সালের ১৬, ১৭ এবং ১৮ আগস্ট এই তিনদিনে ১৭ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল, আহতদের সংখ্যার হিসেব নেই। নিহতদের এই সংখ্যা শুধুমাত্র কলকাতা এবং কলকাতা সংলগ্ন অঞ্চলের। দাঙ্গা চলেছিল এক বছর ধরে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত। এই এক বছরের দাঙ্গায় কলকাতা, ত্রিপুরা, নোয়াখালি প্রভৃতি অঞ্চল সহ সারা প্রদেশে নিহতদের সংখ্যা কত তা জানা যাবে না কারণ হিসেব রাখা হয়নি। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট মুসলিম লীগ পাকিস্তানের দাবীতে হিন্দুর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করেছিল হিন্দু নিধনের মাধ্যমে। পশ্চিমবঙ্গে আবার সেই সংগ্রাম শুরু হবে পশ্চিমবঙ্গকে বৃহত্তর বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত করার দাবীতে। তারই প্রস্তুতি চলছে, মাঝে মাঝে আইসমালি, ঘোকসাডাঙ্গার মত ছোটখাট ঘটনা ঘটিয়ে পরীক্ষা করছে 'হিন্দু জনমানসে কি প্রতিক্রিয়া হয়। পেট্রো ডলার পুষ্ট রাজনীতিক আর বুদ্ধিজীবিরাই বা কতটা সক্ষম ঘটনাগুলি লঘু করে দেখাতে, সত্য ঘটনা চাপা দিতে, যেমন হয়েছে গোধরা কাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে। বুদ্ধিজীবিরা গুজরাটের দাঙ্গায় নিহত সংখ্যালঘুদের জন্য শোকাহত, বেদনার্ত হয়ে হায় হায় করেছেন। শুধুমাত্র এই নয়। ২০০২ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী গোধরা স্টেশনের আউটার 'সিগনালে' সবরমতি এক্সপ্রেসের ৫৭ জন যাত্রীকে ট্রেনের কামরায় বন্ধ করে জীবন্ত দগ্ধ করেছিল যে দুষ্কৃতীরা তাদের প্রোটেক্শান দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠে এই সব রাজনীতিক আর বুদ্ধিজীবিরা গোধরা কাণ্ডের বিকৃতি ঘটাতে শুরু করলেন।

প্রচার করতে লাগলেন— করসেবকরা চা খেয়ে চায়ের দাম দিচ্ছিল না। একটি ১৬ বছরের মুসলমান মেয়েকে করসেবকরা জোর করে ট্রেনের কামরায় তুলে নিয়েছিল, কয়েকজন মুসলমান হকারকে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিতে বাধ্য করেছিল, আরও কত কি! পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুনারী অপহরণ এবং ধর্ষণ এখন নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। এর অধিকাংশের পাণ্ডা মুসলিম দুষ্কৃতিরা। এই ঘটনাগুলিকে লঘু করে দেখানোর জন্য রাজনীতিকদের কি আপ্রাণ চেষ্টা। কখনও বলেন 'ও রকম তো কতই হয়' কেউ বা আবার বলেন মহিলাটির আচরণ ভাল নয়। আসল উদ্দেশ্য দুষ্কৃতীর যেন কোন সাজা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে। যদি দেখা যায় দুষ্কৃতীরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নয় তাহলে পুলিশ প্রশাসন অত্যন্ত তৎপর হয়ে ওঠে এবং দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে। সাজার ব্যবস্থা করে। তবে পুলিশ করবেই বা কি? কথায় আছে— লাঠি তুমি কার? না, যখন যার হাতে থাকি তার। ইংরেজ আমলে এই পুলিশ-ই বাংলার বীর বিপ্লবী, স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং সাধারণ কংগ্রেসীদের ওপর নির্মম অত্যাচার করেছিল। স্বাধীনতার পর কংগ্রেসী আমলে এই পুলিশ নকশাল, কমিউনিস্ট ও অন্যান্যদের ওপর অত্যাচার করেছিল। আর বামফ্রন্ট সরকার তথা সিপিএম-এর আমলে তাদের আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত হয়েছে। এখন সিপিএম-এর একজন সাধারণ নেতাও পুলিশের কর্তা-ব্যক্তিদের হুকুম দেয়, তাদের হুকুম মানতে বাধ্য করে। সীমান্ত অঞ্চলে চোরাকারবারী, গরু পাচারকারী ও দুষ্কৃতীদের পুলিশ গ্রেপ্তার করলেও ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় সিপিএম নেতাদের নির্দেশে। গত ২৪.৪.০৩ তারিখে উত্তর দিনাজপুর জেলার বিলাসপুর চেক্‌পোস্টে পুলিশ চার গরু পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে। ওই চারজনকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য স্থানীয় রায়গঞ্জ সিপিএম অফিস থেকে লিখিতভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়। গরু পাচারকারী এবং চোরাকারবারীরা (প্রায় সবাই মুসলমান) যখন দেখে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করলেও ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে, কোন সাজা দিতে পারছে না, তখন তাদের মনোবল বেড়ে যায়, তারা আরও দেশবিরোধী কাজে লিপ্ত হয় নানারকম অস্ত্রশস্ত্র এবং বিস্ফোরক আমদানি করে, পৌঁছে দেয় বিভিন্ন ডেরায়। আবার পুলিশও দেখছে চোরাকারবারীদের ধরলেও রাজনৈতিক নেতাদের নির্দেশে দুষ্কৃতিদের ছেড়ে দিতে হচ্ছে। তারাও নির্লিপ্ত হয়ে যায় আর নজরানার দিকে নজর দেয়। অক্সফোর্ডের বিতর্কিত নীরদ সি চৌধুরী লিখেছিলেন জাতীয় জীবনের উত্থান ও গৌরবের জন্য যোগ্য নেতৃত্বের যেমন দরকার হয় তেমন-ই দরকার হয় ধ্বংস ও পচনের জন্য। বর্তমান নেতৃত্ব দেশের পচন ও ধ্বংসের জন্যই কাজ করে চলেছেন। এই নেতৃত্বকে নির্মূল করতেই হবে দেশকে বাঁচাতে নিজেদের বাঁচতে। তা না হলে পশ্চিমবঙ্গ বৃহত্তর বাংলাদেশের গ্রাস থেকে রক্ষা পাবে না।

দ্বিতীয় পর্ব

পশ্চিমবঙ্গের নিয়ন্ত্রণ এখন আর বাঙ্গালীদের হাতে নেই। পশ্চিমবঙ্গের শাসনক্ষমতা কোন রাজনৈতিক দলের হাতে থাকবে, পশ্চিমবঙ্গে কাকে থাকতে দেওয়া হবে না, কোন বই নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে, কোথাও দাঙ্গা হাঙ্গামার ঘটনা ঘটলে কোথায় কখন পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকবে বা সক্রিয় হবে এ সমস্ত স্থির করবে পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী উর্দুভাষী উত্তরপ্রদেশ বা বিহারের বাসিন্দা কিছু অবাঙ্গালী মওলানা মাওলভী। কারণ পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সে সিপিএম, কংগ্রেস বা তৃণমূল কংগ্রেস সে দলেরই হোন না কেন এবং তথাকথিত কিছু বুদ্ধিজীবী এই মাওলানা মওলভীদের 'দোয়া' পেতে বড়ই উদগ্রীব। তাই এদেরই কথায় এই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং বুদ্ধিজীবীরা চালিত হন। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাচ্যুত। শাসন ক্ষমতায় এসেছেন কলকাতার টিপু সুলতান মসজিদের ইমান সৈয়দ মহম্মদ নুরুর বরকতি রহমান সাহেবের স্নেহধন্যা তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রীমো মমতা ব্যানার্জী। তিনি অবশ্য তার ব্যানার্জী পদবি ইতিমধ্যে পরিত্যাগ করেছেন। কি কারণে? না সঠিক জানা নেই। তবে ধারণা করা অসঙ্গত নয় তিনি অন্য কোনও পদবি পরিগ্রহ করবেন। লক্ষণীয়, তাঁর সংখ্যালঘু প্রীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু কেন? ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি সিঙ্গুরে জমি আন্দোলনে সিঙ্গুর ধর্নামঞ্চে বসে মুসলিম মহিলাদের অনুকরণে সর্বাঙ্গ আবৃত করে শুধুমাত্র মুখ খোলা রেখে প্রকাশ্যে নামাজ আদায় করছেন। ঘটনাটি ২০০৮ সালের রমজান মাসে। এরপর সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদে এবং ছবিতে দেখা গেছে তিনি সুব্রত মুখার্জী, শোভন চ্যাটার্জী, পার্থ চ্যাটার্জী প্রভৃতি চ্যালাচামুণ্ডাদের মাথায় টুপি পড়িয়ে ইফতার পর্টিতে অংশগ্রহণ করেছেন, নামাজের অভিনয় করছেন, খানাপিনা করছেন। কলকাতায় পার্কসার্কাসের তিলজলা লেনের বাসিন্দা রিজওয়ানুর রহমানের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে সব নাটক অভিনীত হল আমাদের তা অজানা নয়। গ্রাফিক ডিজাইনার শিক্ষক রিজওয়ানুর রহমানের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয় ছাত্রী প্রিয়ঙ্কা টোডির। আলাপ পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠতা, প্রেম, ভালবাসা। ২০০৭-এর ১৮ আগস্ট রিজওয়ানুর রহমানের সাথে প্রিয়ঙ্কা টোডির বিবাহ হয়। এরপর ৩১ আগস্ট ২০০৭-এ প্রিয়ঙ্কা তাদের প্রাসাদোপম অট্টালিকা ছেড়ে রিজওয়ানুর রহমানের তিলজলা লেনের বস্তিতে এসে বাস করতে থাকে। প্রিয়ঙ্কার পিতা কোটিপতি অশোক টোডি স্বভাতই এটা মেনে নিতে পারে নি। শুধু অশোক টোডি কেন? কোন স্নেহপ্রবণ পিতাই এটা মেনে নিতে পারে না। পিতা-মাতা তাদের পুত্রকন্যাদের জন্মের পর থেকেই পরম স্নেহে যত্নে, বুকে আগলে রেখে বড় করে তোলেন, তাদের নিয়ে নানা স্বপ্ন দেখেন। কোটিপতি ব্যবসায়ী অশোক টোডিও আর দশজন পিতার মত একজন স্নেহপ্রবণ পিতা। কন্যা প্রিয়ঙ্কা

টোডিকে ঘিরে হয়ত তার রঙ্গীন স্বপ্ন ছিল। একটি মুসলিম ছেলের সঙ্গে কন্যার বিবাহ স্নেহময় পিতার পক্ষে মেনে না নিতে পারাটাই স্বাভাবিক। ২০-২৫ বছর ধরে যে মেয়ে পিতার কোমল হৃদয়ের যে স্থান অধিকার করে আছে যাকে ঘিরে পিতামাতা নানা রঙ্গীন স্বপ্ন দেখছে, সেই মেয়ে যদি পিতামাতার সব স্বপ্ন, আশা আকাঙ্খা ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কারও সঙ্গে চলে যায় যার সঙ্গে সমাজ, সম্প্রদায়, রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি কোনকিছুরই মিল নেই, তাহলে স্নেহপ্রবণ পিতা অবশ্যই সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে কন্যাকে নিজের পরিবারে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে, এবং অশোক টোডি ঠিক তাই করেছেন। অশোক টোডি কোটিপতি ব্যবসায়ী। অর্থের অভাব তার নেই। তাই অর্থ দিয়ে পুলিশ প্রশাসন সবাইকে কাজে লাগিয়ে মেয়েকে নিজের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন। এতে কি অপরাধ হয়েছে? চারদিকে হই হই পড়ে গেল কেন? অশোক টোডির মুণ্ডপাত করা কেন? অবশ্য প্রিয়ঙ্কা টোডিকে প্রিয়ঙ্কা রহমান করা গেল না এই মানসিক অবসাদে বা অন্য কারণে রিজওয়ানুর রহমান আত্মহত্যা করে। আসরে নেমে পড়লেন পশ্চিমবঙ্গের অগ্নিকন্যা। চ্যালাচামুণ্ডা এবং সমমানসিকতা সম্পন্ন বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি শোক মিছিল, মৌন মিছিল করলেন, তিলজলা লেনে গিয়ে রিজওয়ানুর রহমানের মা কয়সর জাহানকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে আকুল হলেন। এক বছর পর ২১ সেপ্টেম্বর শোক দিবস পালিত হল। এততেও শান্তি নেই। রিজওয়ানুর রহমানের দাদা রুকবানুকে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার বিধায়ক বানালেন। অথচ সমকালীন ঘটনা শৈলেন্দ্র প্রসাদকে মুর্শিদাবাদের লক্ষণপুরে গলার নলির কেটে হত্যা করে মুণ্ডুহীন দেহ পাটক্ষেতে পুঁতে রাখলে বা বারাসাতের অর্ক বন্দ্যোপাধ্যাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার চেষ্টা হলে অগ্নিকন্যা নির্বাক হয়ে যান, মৌনীবাবা বনে যান। কেন এই মানসিকতা? রহস্যটা কি? অবশ্যই মুসলমানদের প্রিয়ভাজন হওয়ার প্রচেষ্টা।

কিন্তু কি অপরাধ করেছিল শৈলেন্দ্র বা বারাসাতের অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়? করেছিল দণ্ডনীয় অপরাধ। হিন্দু হয়ে ধর্ম পরিবর্তন না করেই মুসলিম কন্যাকে বিবাহ করেছিল। মুর্শিদাবাদের প্রত্যন্ত গ্রাম লক্ষণপুরের বাসিন্দা মনেরা খাতুন মুম্বইতে পরিচারিকার কাজ করতো। বিহারের শৈলেন্দ্র প্রসাদ পেশায় ছিল রাজমিস্ত্রী, সেও থাকত মুম্বইতে। আলাপ পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠতা। পরে পরিণয়। রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হয় তাদের। একটি পুত্র সন্তানও হয় তাদের। ইতিমধ্যে শৈলেন্দ্র কয়েকবার লক্ষণপুরে এসেছিল তবে নিজের ধর্ম গোপন রেখে মুন্না শেখ নাম নিয়ে। ২০০৮-এর জুলাইতে সে আবার লক্ষণপুরে আসে। কিন্তু কোন কারণে শ্বশুর আনসারিয়া শেখের সন্দেহ হয়। সে গ্রামের কয়েকজনকে এনে শৈলেন্দ্রর, ছুন্নৎ করা হয়েছে কিনা পরীক্ষা করে এবং নিশ্চিত হয় জামাই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী। বসে সালিশি সভা, মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়। সেই মোতাবেক শৈলেন্দ্রর গলার নলি কেটে শৈলেন্দ্রকে কতল্ করে তার মুণ্ডুহীন দেহ পাটক্ষেতে পুঁতে রাখা হয়। বারাসাতের অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও একই ব্যাপার। নিজে হিন্দু হয় ধর্ম পরিবর্তন না করে মুসলিম কন্যা রেহেনা সুলতানাকে বিবাহ করার অপরাধে তার শ্যালক মনিরুল ইসলাম অর্কর শ্বশুর বাড়ীতেই অর্কর গায়ে এক জেরিকন কেরাসিন তেল ঢেলে তাকে পুড়িয়ে মারতে চেষ্টা করে। অর্ক যখন আগুনের গোলার মত রাস্তায় ছোটাছুটি করছিল, সাহায্যর জন্য আর্তনাদ করছিল, তখন ওই শ্যালক এবং স্থানীয় মুসলমানরা লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে ছিল যাতে তাকে কেউ সাহায্য করতে না পারে। শেষকালে এক ভ্যান চালকের সাহায্যে সে বারাসাত হাসপাতালে পৌঁছতে পারে। এ ধরনের

ঘটনা আকছার ঘটে চলেছে। কোন মুসলিম যদি কোন হিন্দুমেয়েকে শাদী করে তাহলে মুসলিম সমাজে সে বীরের সম্বর্ধনা পায়। অথচ কোন হিন্দু যদি কোন মুসলিম কন্যাকে বিবাহ করে তা হলে সেই হিন্দু এবং তার পরিবারকে সমাজচ্যুত হতে হয় তো বটেই উপরন্তু মুসলিম সমাজ সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে সেই হিন্দুকে কোতল্ করতে যদি না সে ইসলাম গ্রহণ করে। কয়েকটি উদাহরণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলেই মনে হয়।

(১) মুসলিম পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করার অপরাধে সামাজিক বয়কটের শিকার, জারি ফতোয়া (দৈনিক স্টেটসম্যান ২৯.১০.২০১০) : "মুর্শিদাবাদের বহরমপুর এবং কান্দী থানার সংযোগস্থল উদয়চাঁদপুর গ্রামের ঘটনা। গ্রামের নতুন বউ মুসলিম পরিবারের। স্রেফ এ কারণে দীর্ঘ ২০ দিন সামাজিক বয়কট করে রাখা হয়েছে ওদের অর্থাৎ প্রদ্যুৎ মণ্ডল এবং কাশ্মীরা খাতুনদের। দুই গ্রামের দুই সম্প্রদায়ের মোড়লদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে তারা সিদ্ধান্ত নেয় বিয়ে করার। বাধা আসে দুপক্ষ থেকেই। দুই গ্রামের মোড়লরাই তৈরি হয় এ নিয়ে সংঘর্ষে নামার। পরে কাশ্মীরার বাবা আবদুল বশীর, মা খাতেজা বিবি এবং প্রদ্যুতের বাবা নিতাই মণ্ডল এ বিয়েতে রাজী হন। দুই পরিবারের সম্মতি মোতাবেক এ বছরের ২৫ জুলাই ১৯৫৪-এর বিশেষ বিবাহ আইন মোতাবেক রেজিস্ট্রি করে প্রদ্যুৎ এবং কাশ্মীরার বিয়ে হয়।" গ্রামের হিন্দু মোড়লরা জানিয়ে দেন পাড়ার কোন হিন্দু পরিবারের কেউ নিতাইবাবুদের সঙ্গে যেন কথা না বলেন। তাদের মুদিখানার দোকান থেকে কেউ যেন জিনিষ না কেনেন। এমন কি পাড়ার নলকূপ থেকে নিতাইবাবুদের পরিবারের কেউ জল নিতে পারবে না। এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। মুসলমানের মেয়ে তুলসী তলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ দেবে, শঙ্খধ্বনি দেবে এটা বরদাস্ত করা সম্ভব নয়।

(২) বিয়ে করে গ্রামছাড়া বিকাশ পিঙ্কি, সমাজচ্যুত গনতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সক্রিয় সদস্যা (দৈনিক স্টেটসম্যান ২৮.১১.২০০৬) সংবাদটিতে প্রকাশিত হয়েছিল বিকাশ জানিয়েছে "যে সমাজে জাতের দোহাই দিয়ে গ্রামছাড়া করা হয় সেই সমাজকে আমি ঘৃণা করি।" সংবাদে প্রকাশ কালনার বিকাশ মুসলিম কন্যা পিঙ্কি খাতুনকে বিয়ে করার অপরাধে সমাজ থেকে, গ্রাম থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। গ্রামের বাইরে তারা অন্যত্র বাস করতে বাধ্য হয়েছিল। ধারণা করা অসঙ্গত নয় এমন চলতে থাকলে বিকাশ বাধ্য হবে ইসলাম কবুল করতে অর্থাৎ হিন্দু সংখ্যা আর একটি কমবে।

(৩) জাতপাতের বাধা টপকে নতুন পথে শ্যামাপদ-সমি (দৈনিক স্টেটসম্যান ১১.০৬.২০০৮) মহেশপুর গ্রামের বাসিন্দা আফতাবুল ইসলাম খানের মেয়ে ১৯ বছরের সমি আখতাব এবং করমপুর গ্রামের গঙ্গাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে ২৭ বছর বয়সী শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেমের পণিতি আর পাঁচটা বিয়ের মত নয়। শ্যামাপদ এবং সমি পরস্পরকে ভালবাসত বলে গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন। কিন্তু বিয়ের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সেই জাতপাত। সেই বাধা টপকে কলা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী সমি ও একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত শ্যামাপদ গত ৫ জুন পালিয়ে গিয়ে বালিচকের একটি কালীমন্দিরে গিয়ে হিন্দুমতে বিয়ে করে। কিন্তু এই বিয়েতে হিন্দু ও মুসলমান দুই পরিবারই ঘোরতর আপত্তি করে। দু পক্ষই থানায় মিসিং ডায়েরি করে। অন্যদিকে দুই গ্রামের মানুষজন জানতে পারেন শ্যামাপদ এবং সমি দুজনে বিয়ে করেছে। এরা দুজন রবিবার গ্রামে ফিরে এলেও কেউ কারো বাড়ীতে যেতে পারে নি। দুটি পরিবারই এই বিয়ে মেনে না নেওয়ায় নিরাপত্তার অভাব বোধ করে নব দম্পতি। এর পরই তারা থানায় গিয়ে

পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করে। পুলিশের সাহায্যে থানায় মুচলেকা দিয়ে শ্যামাপদ ও সমি থানা সংলগ্ন একটি বাড়ীভাড়া করে সেখানে বসবাস শুরু করে। শ্যামাপদ জানায় আমরা ভালবাসতাম তাই বিয়ে করেছি। এ নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার কিছু নেই। সমি জানায় সে তার ভালবাসার মানুষকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, কিন্তু বাড়ীর লোক মেনে না নেওয়ায় পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছে।

শ্যামাপদর বাবা গঙ্গাপদ বলেন ছেলের বিয়েকে মেনে না নিলেও ওর ভালোমন্দর কথা চিন্তা করে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি। এই বিয়ে নিয়ে হিন্দু ও মুসলিম সমঝোতা নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে ভিন্ন জাতের মেয়ে আসবে তা কোন মতেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। অন্যদিকে অভিযোগ করে বলেন মেয়ের বাবা ছেলেকে মেরে ফেলবে বলে হুমকি দিচ্ছে। তাছাড়া গ্রামের সালিশি সভায় তাদের জানিয়ে দেওয়া হয় ছেলে যদি বাড়ীতে ফিরে আসে তাহলে সমাজ থেকে বিতাড়িত করা হবে। ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে বাড়িতে। হিন্দু সমাজ থেকে এই ধরনের ভয় দেখানোয় ছেলে-বৌমাকে ঘরে তুলতে পারছেন না গঙ্গাপ্রসাদ। অন্যদিকে মেয়ের বাবা আফতাবুল ইসলাম খান তার মেয়ের এই রকমভাবে বিয়ে মেনে নিতে পারছেন না। তাঁরাও বাড়ীতে মেয়ে জামাইকে তুলবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের বিয়ে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

৪) বিষ খেয়ে আত্মহত্যা হিন্দু প্রেমিক ও মুসলিম প্রেমিকার (দৈনিক স্টেটসম্যান ২৭.৯.২০১০) ভালোবাসাকে পরিণয় করতে ধর্মের প্রবল বাধার মুখে পড়ে আত্মহননের পথ নিলো এক প্রেমিক যুগল। বাড়ী থেকে পালিয়ে ভূপতিনগর থানার মাগলাতি গ্রামের কাছে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করল প্রেমিক রিন্টু সিং ও প্রেমিকা রশিদা খাতুন। রবিবার সকালে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভূপতিনগর থানার বাতাকুলের কাছে মাগলাতি গ্রামের কাছে দুই যুবক-যুবতীর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনার বিবরণ, হেঁড়িয়া থানার খাড়োল গ্রামের রিন্টু সিং-এর সাথে প্রতিবেশী শেখ সিরাজুলের মেয়ে রশিদা খাতুনের দীর্ঘদিন ধরে প্রণয়ের সম্পর্ক। এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে রিন্টু ও রশিদার সম্পর্ক মেনে নিতে পারে নি দুই পরিবার। দুই যুগলের প্রেম সারা জীবনের পরিণয় হয়ে ওঠার মুখে বাধা হয় ধর্ম। গত কয়েকদিন আগে রিন্টু বিয়ে করে রশিদাকে। এরপর থেকে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পারিবারিক অশান্তি থেকে বাঁচতে এই প্রেমিক আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে বলে স্থানীয় মানুষের ধারণা। শনিবার রাত থেকেই রিন্টু ও রশিদা খাতুন বাড়ী থেকে নিখোঁজ ছিল। রবিবার সকালে যুবক-যুবতীর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে মাগলাতি এলাকার অধিবাসীরা ভূপতিনগর থানায় খবর দেয়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। থানায় কোন অভিযোগ হয় নি। (সংক্ষেপিত)

(৫) বাড়ীর অমতে বিয়ে করা প্রাপ্তবয়স্ক দম্পতিকে গ্রেপ্তার করতে দিলেন না ঝাড়গ্রামের ওসি (বর্তমান ৫.১০.২০০৭) : পুলিশ সূত্রে জানা গেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনাখালি থানার পশ্চিম পোয়ালী গ্রামের ব্যবসায়ী শেখ মহম্মদের ছোট মেয়ে রেজিনা খাতুন বাড়ীর অমতে ঝাড়গ্রামের যুবক দোদন পাত্রকে বিয়ে করেন। দোদনের বাড়ী ঝাড়গ্রামের বাছুরডোবার চৌধুরি কলোনিতে। দোদন বলেন জাতিগত সমস্যার কারণে কোনও পরিবার আমাদের বিয়ে মেনে নেয় নি। আমাদের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। রেজিনা ডায়মন্ডহারবারের শহিদ অনুরূপচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। আমরা দুজনেই

প্রাপ্তবয়স্ক। সোমবার রেজিনা বাড়ী ছেড়ে খড়গপুর চলে আসে। এরপর আমি ওকে ঝাড়গ্রামে আনি। বুধবার আমরা চিলকিগড় মন্দিরে বিয়ে করি। মুসলিম সম্প্রদায়ের মেয়েকে বিয়ে করার জন্য আমার বাড়ীতে এই সম্পর্ক কেউই মেনে নেয় নি। বাধ্য হয়ে আমি বাড়ী ছেড়েছি। মেয়ের বিয়ের খবর পেয়েই রেজিনার বাবা শেখ মহম্মদ নোদাখালি থানায় বুধবার অপহরণের ডায়েরি করেন। অপহরণের অভিযোগ পাওয়ার পর নোদাখালি থানার পুলিশবাহিনী বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রামে পৌঁছায়। ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশের সাহায্য নিয়ে তারা দোদন এবং রেজিনার সঙ্গে দেখা করে। দুজনকেই দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এরপর ঝাড়গ্রাম থানার ওসি দেবাশিস চক্রবর্তী বলেন প্রাপ্তবয়স্ক ওই যুবক-যুবতীর সম্মতির বিয়েতে হস্তক্ষেপ করে জলঘোলা করা উচিৎ নয়। অপহরণের অভিযোগও ভিত্তিহীন। নোদাখালির পশ্চিম পোয়ালী গ্রামের শেখ মহম্মদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন আমার মেয়েকে ফুসলিয়ে ওই যুবক নিয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া আমার মেয়ে ওই যুবককে নিয়ে সংসার করলে প্রতিবেশীরা আমাকে একঘরে করে দেবে বলে হুমকি দিচ্ছে। তাই আমি মেয়েকে ফিরে পেতে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করি। (সংক্ষেপিত)

(৬) সুফিয়াকে বিয়ে করে ঘর বাঁধতে চাওয়ায় খুনের হুমকি দেবব্রতকে (বর্তমান ৩০.১০.২০০৭) : রিজওয়ানুরের মত মর্মান্তিক মৃত্যু আমরা চাই না। সুফিয়াকে বিয়ে করে শান্তিতে সংসার করতে চাই। সোমবার বারাসাত থানায় এসে এই কথা বললেন দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ সুফিয়ার বাবা হায়দার আলি হালদার, দাদা টিপু সুলতান এই বিয়ের পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। সুফিয়াকে ত্যাগ না করলে বা বিয়ে করলে তাঁকে খুন করা হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়। এদিন বারাসাত থানায় এসে নিরাপত্তার দাবি জানান দেবব্রত বাবু। তার প্রেমিকা বি.এ. দ্বিতীয়বর্ষের ছাত্রী সুফিয়াও নিরাপত্তা চেয়ে বারাসাত থানায় হাজির। তারপরই সুফিয়ার বাবা হায়দার আলি এবং দাদা টিপু স্থানীয় জনপ্রতিনিধিকে নিয়ে থানায় হাজির হন সোমবার সন্ধ্যায়। দেবব্রত বলেন আমার মোবাইলে ফোন করে আমাদের বিয়ে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে উভয়ের পরিবার আশ্বাস দিয়ে আমাদের ডাকে। সরল মনে আমরা ধরা দিতেই সুফিয়ার বাবা এবং দাদা রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন। তিনি বলেন হিন্দু মুসলমানে বিয়ে হয় না। বিয়ে করলে আমাকে খুন করা হবে বলেও সুফিয়ার দাদা হুমকি দেন। সুফিয়া বলেন এরপরই বেগতিক দেখে দেবব্রতকে নিয়ে আমি বারাসাত থানায় চলে আসি। তিনি বলেন আমরা প্রাপ্তবয়স্ক। আমরা বিয়ে করব। ধর্ম সেখানে বাধা হবে কেন? থানায় ঢুকেও সুফিয়ার দাদা দেবব্রতকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেন। সুফিয়ার বাবা হাইকোর্টে যাওয়ারও হুমকি দেন। সুফিয়ার অভিযোগ পুলিশের সামনে দেবব্রতকে আমার বাবা-দাদা হুমকি দিচ্ছে অথচ পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে কোন অভিযোগ ছাড়াই দেবব্রতর মোবাইল কেড়ে নিয়ে তাকে থানার আসামীদের রাখার ঘরে ঢুকিয়ে আটকে রাখে। সুফিয়ার বাবা হায়দার আলি বলেন মোহের বশে ওরা এই জঘন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হিন্দু মুসলমানে বিয়ে হয় না। ছেলের পরিবারও এ বিয়ে মেনে নিচ্ছে না। (সংক্ষেপিত)

এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা ঘটে চলেছে সারা পশ্চিমবঙ্গে। কটা ঘটনাই বা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়? তাছাড়া প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমর্থন বা সাহায্য সংশ্লিষ্ট মুসলিম পরিবারগুলির দিকেই যাচ্ছে। কারণটা দুর্বোধ্য। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে এরা ধর্মান্ধদের প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে, দেশের অখণ্ডতার দোহাই দিয়ে এরা দেশবিরোধী

নাগরিকদের মদত দিয়ে চলেছে। ফলে এইসব দেশবিরোধী, ধর্মান্ধ নাগরিকেরা দিনকে দিন বেপরোয়া, দুঃসাহসি হয়ে উঠছে। ফলে এরা নিজেদের মহল্লাগুলিতে তো বটেই অন্যত্রও ছোট ছোট কারণেও দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধাতে বা চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, অপহরণ, মহিলাদের শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ প্রভৃতি করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। কারণ তারা জানে তাদের মওলানা মওলভীদের কাছে এইসব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নতজানু হয়ে থাকেন। অপরাধমূলক কাণ্ডকর্ম করেও এরা প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আরও দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। কয়েকটি ঘটনা সংক্ষিপ্তাকারে বিবৃত হল।

(১) তিনজন নাবালিকা হিন্দু স্কুলছাত্রী প্রকাশ্যে ধর্ষিতা এবং নিগৃহীতা হল। গত ১২ জুলাই ২০১০ নদীয়া জেলার শান্তিপুর থানার অধীন মিদ্যাপাড়া লিচুতলায় তিন স্কুল ছাত্রী (ক) চৈতালী ঘোষ (১৩) (খ) সুমিতা ঘোষ (১৩) এবং (গ) সুস্মিতা ঘোষ (১৪) কয়েকজন সহপাঠিনী মুসলিম ছাত্রীর সঙ্গে স্কুল থেকে ফিরছিল। তখন বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ মুসলিম অধ্যুষিত মিদ্যেপাড়ায় 'গাজীর মেলা' চলাকালীন প্রায় ৪০০ মুসলমান, মেয়েগুলিকে ঘিরে ধরে। মুসলমান ছাত্রীদের পালিয়ে যেতে দেওয়া হলেও হিন্দু মেয়ে তিনটিকে যেতে দেওয়া হয় না। এরপর দুষ্কৃতীরা মেয়েদের ওড়নাগুলি কেড়ে নিয়ে শরীরে মদ ঢেলে দেয়। তারপর প্রকাশ্য দিবালোকে চলে চরম অত্যাচার, ধর্ষণ। মেয়েগুলি বাধা দেওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং সংজ্ঞাহীন হয়ে যায়। এদিকে বাড়ীর লোকজন তাদের ফিরতে না দেখে স্কুলের দিকে যায় এবং পথের ধারে তাদের সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে। অবিলম্বে তারা মেয়েদের শান্তিপুর সরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। স্থানীয় হিন্দুরা এই বিভৎস ঘটনা সহ্য করতে রাজী ছিল না। স্থানীয় মুসলিম ছাত্রীদের এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও তারা কেউই মুখ খোলে না। এরপর হাজারখানেক বিক্ষুব্ধ হিন্দু থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করে এবং দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার দাবী করে। এ বিষয়ে পুলিশের নেতিবাচক ভূমিকায় তারা অশান্ত হয়ে ওঠে এবং ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। এবার প্রশাসন সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং অবরোধ ওঠানোর জন্য র‍্যাফ নামায়। বলাবাহুল্য দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। তাদের কোন শাস্তি হয় নি।

(২) মুসলিম যুবকদের দ্বারা হিন্দু মেয়ে খেলোয়াররা আক্রান্ত : গত ১৬ এপ্রিল ২০১০ ব্যারাকপুর স্পোর্টস কমপ্লেক্স মাঠে কিছু পুরুষ ও মহিলা খেলোয়াররা প্র্যাকটিস করছিল। সে সময় মাঠের ধারে বসে থাকা ১৫ থেকে ১৬ বছর বয়সী কিছু মুসলিম যুবক খেলোয়ারদের উদ্দেশ্যে কটুক্তি করছিল আর শিস দিচ্ছিল। এরপর এরা ডোনা নামে এক মেয়ে খেলোয়ারকে তাদের কাছে ডাকে আর ডোনার এবং অন্যান্য মেয়েদের মোবাইল ফোন নম্বর চায়। এতে ডোনা ভীত হয়ে ওঠে আর সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এতে মুসলিম যুবকরা অশ্রাব্য ভাষায় মন্তব্য করতে থাকে। সব শুনে পুরুষ খেলোয়াররা প্রতিবাদ করতে এগিয়ে এলে তাদের চড় মারা হয় এবং ধাক্কা দেওয়া হয়। এরপর সবাই ক্লাব ঘরে আশ্রয় নেয়। ৬-১৫ মিনিট নাগাদ ৫০-৬০ জন মুসলমান সকলেরই বয়স ১৬ থেকে ২২-এর মধ্যে ক্লাব ঘরে ঢোকে বিশেষ করে মেয়েদের পোষাক বদলাবার ঘরে আর সবাইকে পেটাতে শুরু করে। ৫-৬ জন মহিলা খেলোয়াড় প্রচণ্ডভাবে আহত হয়। এদের মধ্যে ডলি বিশ্বাস (১৪) এবং পূজা সিংহ (১৭) নামে দুজনকে নির্দয়ভাবে পেটানো হয়। পূজা সিংহকে স্থানীয় সারদা নার্সিং হোমে ভর্ত্তি করা হয়েছিল। সে বলে তাকে বিশেষ করে

বুকে মারা হয়। তার বুকের ওপর দাঁড়ায় আর লাথি মারে। সে বলে আক্রমণকারীরা সকলেই মোহনপুর মসজিদ পাড়ার বাসিন্দা আর সবাই মুসলমান। সে বলে আগেও এরা এ ধরনের নোংরামি, অসভ্যতা করত, মেয়েদের শিস দিত, আরও নানা নোংরামি করত। ক্লাব কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তাদের অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত দেখায়। এ বিষয়ে তাদের বক্তব্য ছিল নেতিবাচক। ক্লাব কর্তৃপক্ষ টিটাগড় থানায় একটি সাধারণ অভিযোগ দায়ের করে, কিন্তু দুষ্কৃতী বা গুণ্ডাদের কারও নাম উল্লেখ করা হয়নি। মোহনপুর পঞ্চায়েত এবং স্পোর্টস কমপ্লেক্স নিয়ন্ত্রণ করে সিপিআইএম। তারা হিন্দুদের ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রাখতে পারে কিন্তু হিন্দু মেয়েরা মুসলমান দুষ্কৃতীদের দ্বারা অত্যাচারিত হলে, নিগৃহীতা হলে নপুংসক বনে যায়। প্রশাসনকেও তারা নপুংসক বানিয়ে রেখেছে। ফলে প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা নিতে অপারগ।

(৩) কলকাতায় হিন্দু শিক্ষিকাকেও বোরখা পড়তে বাধ্য করা হচ্ছে। গত ০২.০৬.১০ কলকাতায় হাজী মহম্মদ মহসীন স্কোয়ারে অবস্থিত আলিয়া ইউনিভার্সিটির ছাত্র ইউনিয়ন থেকে এক ফতোয়া জারি করা হয়। জানানো হয় প্রত্যেক ছাত্রীকে বোরখা পড়তে হবে। এমনকি ভিজিটিং লেকচারারদেরও রেহাই দেওয়া হয় না। শ্রীমতি শিরিন মিদ্যা বোরখা পড়তে অস্বীকার করলে তাকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়। শ্রীমতি মিদ্যা উপাচার্য সামসুল আলম এবং রেজিস্ট্রারার ড. আনোয়ার হোসেনের সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু তারা কোন ব্যবস্থা না নিয়ে শ্রীমতি মিদ্যাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে না যেতে পরামর্শ দেন। এরপর শ্রীমতি মিদ্যা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৎকালীন সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী আবদুস সাত্তারের সঙ্গে দেখা করলে তিনি তাকে ইউনিভারসিটির সল্টলেক ক্যাম্পাসের লাইব্রেরীতে বদলি করে দেন। কিন্তু ফতোয়ার বিষয়ে কোন সুরাহা হল না। একজনকে না হয় বদলি করা সম্ভব হল কিন্তু অন্যান্য লেকচারার এমনকি হিন্দু লেকচারাররাও যারা ভয়ে প্রতিবাদ করেন নি, তারাও বোরখা পড়তে বাধ্য হবেন। আর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নিজেই যখন বোরখা পড়েন তখন আর অন্য কথা কি থাকতে পারে?

(৪) হিন্দু কন্যা মুসলমানদের গণধর্ষণের শিকার হল। চুঁচুড়া ১০.১০.২০০৯ বাঁশবেড়িয়া কালবাজারের ২২ বছরের তরুণী যখন বাজার থেকে ফিরছিল তখন ‘গ্যাঞ্জেস্ জুট মিলের’ কাছে সোনা আলম, সাদ্দাম হোসেন এবং ফিরোজ আলি নামে তিন যুবক মেয়েটিকে জোর করে একটি গাড়ীতে তুলে নিয়ে ব্যাণ্ডেলের দিকে যায়। এরপর তাকে জোর করে মাদক মিশ্রিত পানীয় পান করায়। এরপর মেয়েটি বেহুঁশ হয়ে পড়লে ওই তিন যুবক তাকে ধর্ষণ করে। পরে তাকে আদি সপ্তগ্রাম স্টেশনের কাছে ফেলে রেখে চলে যায়। এরপর জ্ঞান ফিরলে মেয়েটি মোবাইলে ফোন করে বাড়ীতে জানায়। অভিভাবকরা এসে তাকে নিয়ে যায়। পরদিন সকালে মেয়েটি মগরা থানায় অভিযোগ দায়ের করে। তার দেওয়া তথ্যসূত্রে পুলিশ ওই গাড়ী এবং ড্রাইভারকে তিন ঘণ্টার মধ্যে পাকড়াও করে। পরে অন্য দুই দুষ্কৃতীও ধরা পড়ে। তিনজনকেই চুঁচুড়া সদর কোর্টে তোলা হয়। পরে তিনজনকেই জেল হাজতে পাঠানো হয়।

(৫) পশ্চিমবঙ্গে বজরংবলীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা নিষিদ্ধ। প্রশান্ত দাস একজন হিন্দু ব্যবসায়ী। তাঁর বাসস্থান বজবজের কাছে চিংড়ি পোতায়। তার নিজের জমিতে নিজস্ব বাড়ীর সামনের গেটে পবন পুত্র বজরংবলীর একটি মুর্ত্তি রয়েছে। ২০১০-এর ১৪ আগস্ট বজবজ থানার অফিসার ইন চার্জ কোন রকম জানান না দিয়েই হঠাৎ একদিন

প্রশান্ত দাসের বাড়ীতে হাজির হলেন। এসেই তিনি প্রশান্ত দাসকে শাসাতে থাকলেন ওই বজরংবলীর মূর্ত্তি তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে বাড়ীর গেটে স্থাপন করে স্থানীয় ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত করছেন। কারণ আজান শুনে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা নামাজে অংশগ্রহণ করতে মসজিদে যাওয়ার সময় ওই বজরংবলী মূর্ত্তির দিকে চোখ পড়লে তাদের দেহ মন কলুষিত হয়ে যায়। অতএব ওই বজরংবলী ওখান থেকে সরাতে হবে। কারণ নামাজের অগে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি দর্শন ইসলাম বিরোধী। প্রশান্ত দাস পুলিশ অফিসার রাজীব শর্মাকে জানান "পবনপুত্র হনুমানজী মুসলমানদের চক্ষুশুল হলেও হিন্দুদের চোখে শ্রদ্ধেয় দেবতা। আমি আমার নিজের বাড়ীতে ওই মূর্ত্তি বসিয়েছি। ওই মূর্ত্তি আমরা ভক্তি করি, পুজো করি। কাজেই আমি ওই মূর্ত্তি সরাবো না। ভারতের নাগরিক হিসেবে সে অধিকার আমার আছে।" পুলিশ প্রশাসনের এই ধরনের অবৈধ কাজকর্ম মুসলমানদের মদত জোগাচ্ছে না কি?

(৬) হাইকোর্টের নির্দেশ উপেক্ষা করে পুলিশ প্রহড়ায় গরু জবাই। কলকাতা : মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট গত ১২ নভেম্বর ২০১০-এ এক গুরুত্বপূর্ণ রায়ে ইদুজ্জোহা উপলক্ষে গো কোরবানি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। প্রকৃতপক্ষে রায়টি কলকাতা হাইকোর্টের ১৯৯৫ সালের একটি রায়-এরই পুনরুল্লেখ বলা যেতে পারে। অথচ ওই রায়কে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার উস্থি থানার ১৪-১৫ জন পুলিশ ওই থানার ওসি ডি. কে রায়-এর নেতৃত্বে ১৭ নভেম্বর ২০১০ ইদুজ্জোহার দিন সকালে দোগাছায় যায় গরু জবাই করার সময় আইন শৃংঙ্খলা বজায় রাখতে। ওই গ্রামের ২০০-৩০০ হিন্দু গ্রামবাসী এই গরু জবাই-এর প্রতিবাদ করলে পুলিশ ছুটে যায় আর নির্দয়ভাবে লাঠিচার্জ করে। পুলিশ প্রহড়ায় সকাল ১০-২০ মিনিটের মধ্যে একটি স্বাস্থ্যবান গরু জবাই করা হয়। ঐদিনই পীরতলায় হিন্দুস্থান বেকারীর কাছে সকাল ৯-৪৫ মিনিট-এ দুটো গরু জবাই করা হয়। ওই হিন্দুস্থান বেকারীর মালিক ফারুক শেখ এবং ফিরোজ শেখের নেতৃত্বে গরু জবাই হয়েছিল। স্থানীয় সুমন দাস বিষ্ণুপুর থানায় বারবার অভিযোগ করা সত্ত্বেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয় নি।

(৭) ৬ন আফতার আনসারির ফাঁসীর হুকুম, সমর্থক বিচারককে হুঁসিয়ারি। কলকাতা ৬.৩.২০১০ : কলকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি কালিদাস মুখার্জী যিনি ২০০২ সালে কলকাতা আমেরিকান সেন্টারে হামলার অন্যতম আসামী ডন আফতার আনসারির ফাঁসীর আদেশ বহাল রেখেছিলেন তাকে একটা চিঠিতে হুমকি দেওয়া হয় তিনি ঠিক কাজ করেন নি। লক্ষণীয় হাইকোর্টের বিচারপতিকে চিঠিতে এ ধরনের হুমকি দেওয়া এটাই প্রথম। ২০১০ এ ফেব্রুয়ারীতে কলকাতা হাইকোর্ট আফতার আনসারির মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখে। উল্লেখ করা যেতে পারে ২০০২ সালে কলকাতায় আমেরিকান সেন্টারের ওপর হামলার কারণে ৬ জন পুলিশ কর্মী নিহত হয়েছিলেন।

এ ধরনের ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে প্রায়ই ঘটে চলেছে। ঘটনাগুলিতেই প্রমাণিত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানরা ক্রমশ উদ্ধত, বেপরোয়া এবং দুঃসাহসী হয়ে উঠছে। এর কারণ অবশ্যই রাজনৈতিক নেতাদের প্রশ্রয় এবং প্রশাসনের নপুংসকতা। হিন্দু পুলিশ হিন্দু বাড়ীতে এসে বলছে হনুমানজীর মূর্ত্তি হঠাতে হবে কারণ মুসলমানরা সেটা হঠাতে বলছে। হাইকোর্টের নির্দেশ উপেক্ষা করে পুলিশ পাহারায় গো-কোরবানি হচ্ছে, হিন্দু কিশোরী-মুসলমানদের দ্বারা অপহৃতা এবং ধর্ষিতা হলেও পুলিশ নিষ্ক্রয় থাকছে। এর থেকে জঘন্য ব্যাপার আর কি হতে পারে? অর্থাৎ গত ৫০-৬০ বছর ধরে পূর্ব পাকিস্তান এবং

বাংলাদেশে যা ঘটছিল এখন সেটা পশ্চিমবঙ্গে ঘটছে। মুসলমানরা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রশ্রয়ে এবং পুলিশ প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে এ রাজ্যে চুরি, ডাকাতি, খুন, অপহরণ, ধর্ষণ প্রভৃতি করছে, আর তাদের কোন সাজা হচ্ছে না দেখে আরও উদ্ধত, আরও স্বেচ্ছাচারী, বলদর্পী হয়ে উঠছে। তাই চলন্ত ট্রেনের লেডিজ কমপার্টমেন্ট থেকে কিশোরীকে টেনে নামায়, প্রকাশ্য দিবালোকে কলকাতার রাজপথে স্কুলবাস থেকে ছাত্রী নামিয়ে নিতে চেষ্টা করে। বাধাপ্রাপ্ত হলে ড্রাইভারকে গুলি করে হত্যা করতেও দ্বিধা করে না। মেট্রো রেলে তরুণীর শ্লীলতাহানি করে। হিন্দু কালী মন্দির ভেঙ্গে, মূর্ত্তি ভেঙ্গে মূর্ত্তিতে প্রস্রাব করে দেয়, ছোটখাট কারণে দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধায় আর সেই সুযোগে হিন্দুদের আসবাবপত্র লুঠ করে, অথচ এদের কোন সাজা হয় না। তারা বীরদর্পে ঘুরে বেড়ায়। এদের স্পর্ধা এখন গগণচুম্বী। তাই নিজেদের বাড়ীতেও হিন্দু মেয়েরা এখন আর নিরাপদ নয়, বিশেষ করে যদি বাড়ী ফাঁকা থাকে। প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হল।

(১) ২০১০-এর ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের শেষের দিকে চন্দনগরের অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্রী বয়স ১২ থেকে ১৪-র মধ্যে, স্কুলে পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী ফিরেছিল। তার মা এবং বাবা দুজনেই লক্ষীগঞ্জ বাজারে দোকানে কাজ করে। বিকেলের দিকে তার মা এবং বাবা দুজনেই বেরিয়ে যায়। মেয়েটি বাড়ীতে একাই থাকে, পড়াশোনা বা বাড়ীর কাজকর্ম করে। এলাকাটি মুসলিম অধ্যুষিত কাঁটাপুকুর। তবে অনেক হিন্দুও সেখানে বাস করে। বছর ৩০-এর এক মুসলমান যুবক, প্রতিবেশী ওই বাড়ীতে মাঝে মধ্যে আসার সুবাদে বিষয়টা জানত। ঘটনার দিন বাড়ীর সদর দরজা দিয়ে না ঢুকে সে বাড়ীর পেছনের দিকের পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে সেই বাড়ীতে ঢোকে যাতে অন্যদের নজর এড়ানো যায়। এরপর ফাঁকা বাড়ীতে জোর করে মেয়েটিকে ধর্ষণ করে আর কিছু ওষুধ খাইয়ে দেয়। মেয়েটি অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং অস্বাভাবিক আচরণ করতে থাকে। মেয়েটির মা বাড়ী ফিরে এসে প্রথম দিন কিছু বুঝতে না পারলেও পরের দিন মেয়েটির অস্বাভাবিক আচরণ তার নজর এড়ায় না। মেয়েটিকে জেরা করলে সব কিছু প্রকাশ হয়ে পড়ে। মেয়েটির বাবা এরপর পুলিশে অর্থাৎ চন্দননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশ মুসলমান যুবকটিকে গ্রেপ্তার করে। ইতিমধ্যে মুসলিম দুষ্কৃতিটির পিতা ৫০ হাজার টাকা নিয়ে মেয়েটির বাবার কাছে যায় আর অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিতে বলে। কিন্তু মেয়েটির বাবা এতে রাজী হয় না। ইতিমধ্যে গুরুতর রূপে অসুস্থ হয়ে পড়লে মেয়েটিকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হসপিটালে পাঠানো হয় চিকিৎসার জন্য। পরবর্তীকালে কোন ইমাম বা মওলানা মারফৎ ওই টাকা কোনও রাজনৈতিক নেতার পকেটে যাওয়াও অসম্ভব কিছু নয়। যে কারণেই হোক ওই মুসলিম দুষ্কৃতীটিকে ওই পাড়াতেই আরও উদ্ধত আরও স্পর্ধিতভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল। বোঝা গেল দুষ্কৃতীটির দুষ্কর্ম আদালতে প্রমাণ হয় নি। সে কারণে কোন শাস্তি ভোগ করতে হয় নি।

(২) দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং এর কাছে জীবনতলা থানা। ওই থানার দক্ষিণ পাতিখালি গ্রামের চড়পাড়ায় অতি দরিদ্র দিনমজুর রাধকান্ত মণ্ডলের বাস। বাড়ীতে থাকে তার মা মরা ১৭ বছরের মেয়ে সবিতা মণ্ডল। বাবা কাজে বেরিয়ে গেলে সবিতাকে একাই বাড়ীতে থাকতে হয়। দরমার বেড়া দেওয়া একটা কাঁচা ঘর। বাড়ীর সামনে একটা খোলা জায়গা রয়েছে। সেখানে কিছু যুবক আড্ডা দেয়, নেশা করে। গত ৮ এপ্রিল ২০১১ সবিতার বাবা কাজে বেরিয়ে গেলে সবিতা ঘরে একাই ছিল। দুপুর দুটো নাগাদ সইফুদ্দিন মিস্ত্রী এবং পাপ্পু শেখ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এসে সবিতার বাড়ীর বাইরে থেকে জল চায়।

সবিতা প্রথমে জল দিতে চায় না। কিন্তু ওই মাতাল দুজন জোর করায় সবিতা বাধ্য হয়ে জলের বোতল বেড়ায় বাইরে থেকে তাদের হাতে ধরিয়ে দেয়। কিন্তু জল খাওয়া তো তদের আসল উদ্দেশ্য নয়। তাই তারা লাথি মেরে দরমার দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢোকে এবং সবিতার জামাকাপড় ধরে টানাটানি করতে থাকে। সবিতা চিৎকার চেঁচামেচি করতে থাকলেও আশপাশের বাড়ী থেকে কেউ এগিয়ে আসে না, কারণ ওই গুণ্ডাদের সকলেই ভয় পায়। এরপর সইফুদ্দীন সবিতাকে প্রচণ্ড মারধর করে, ফলে ১৭ বছরের সবিতার প্রতিরোধ করার শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। সবিতা অজ্ঞান হয়ে যায়। এরপর সইফুদ্দীন সবিতার জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলে সর্বপ্রকারে সবিতার ইজ্জৎ লুঠ করে। দুষ্কর্ম করে গুণ্ডারা চলে গেলে প্রতিবেশী যুবক রাজকুমার রাম অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে ডাকাডাকি করে অন্য লোকজন ডেকে আনে। তারা চোখে মুখে জল দিয়ে সবিতার জ্ঞান ফিরিয়ে আনে। বিকেল ৪টায় রাধাকান্ত মণ্ডল বাড়ী ফিরে মেয়ের ওই অবস্থা দেখে আর সব শুনে ভেঙ্গে পড়ে। পরে প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করে। অপরাধী সইফুদ্দীন মিস্ত্রি, পিতা সাবির আলি মিস্ত্রীর বাড়ী ক্যানিং থানার উত্তর তালদির কৃষ্ণ কলোনিতে। ক্যানিং থানার পুলিশ সবিতাকে জিজ্ঞাসা করে সব কিছু জেনে নেয়। কিন্তু কোন লিখিত অভিযোগ না নিয়ে, কোন মেডিক্যাল টেস্টের ব্যবস্থা না করে, তাদের জীবনতলা থানায় যেতে বলে। পরদিন ৯ এপ্রিল বাবা ও মেয়ে সকালে জীবনতলা থানায় যায়। পুলিশ অফিসার তাদের অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করে। সবিতার ছেঁড়া জামাকাপড় দেখে পুলিশ অফিসার রাধাকান্তকে জিজ্ঞাসা করে যে তার বাড়ীতে গেলে সে সেই ভাঙ্গা দরজা দেখাতে পারবে কি না। রাধাকান্ত বলে 'নিশ্চয় পারব।' তখন থানার ওসি বলেন তিনি শিঘ্রই তদন্ত করতে যাবেন। তিনিও সবিতার মেডিক্যাল টেস্টের কোন ব্যবস্থা করেন না, থানায় ডায়েরি বা এফআইআর-এর কোন নম্বর দেন না। অপরাধী সইফুদ্দিন কয়েকদিন পালিয়েছিল। কিন্তু ১১ এপ্রিল পাড়ায় ফিরে এসে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে। জানা গেছে সিপিএম-এর বড় নেতা সওকৎ মোল্লার ঘনিষ্ঠ সামসুদ্দীন শেখ ওরফে গাড্ডা নামের এক সমাজ বিরোধীর আশ্বাসে সে এলাকায় ফিরে এসেছে।

(৩) উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সন্দেশখালি থানার কুখ্যাত সরবেড়িয়া অঞ্চলের ভাটিদহ গ্রামের অতি দরিদ্র রবীন্দ্র সরদারের কন্যা নয়না সরদার। বয়স ১৩ বছর ১০ মাস। ২০০৯-এর ফেব্রুয়ারী মাসে সন্ধ্যা ৭টায় সরস্বতী ঠাকুরের বিসর্জন দেখতে বাড়ীর বাইরে বের হয়েছিল। পাশের গ্রামের বাসিন্দা ২৩ বছরের রফিকুল শেখ আর কয়েকজন সঙ্গী মোটর বাইকে এসে নয়নাকে চেপে ধরে তার মুখ ওড়না চাপা দিয়ে জোর করে মোটর বাইকে তুলে নিয়ে যায়। স্থানীয় লোকজন কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘটনা ঘটে যায়। মেয়ের বাবা যথারীতি থানায় ডায়েরি করে এবং ওসির কাছে অনেক অনুনয় বিনয় করেও কোন লাভ হয় নি। থানা কোন ব্যবস্থাই নেয় নি। পরে মেয়ের বাবা খবর পায় যে নয়নাকে রফিকুলের ভগ্নীপতির বাড়ীতে আটকে রাখা হয়েছে। পুলিশে খবর দেওয়া হলে ১৯ ফেব্রুয়ারী পুলিশ নয়নাকে উদ্ধার করে। কিন্তু রফিকুল বা তার ভগ্নীপতিকে গ্রেপ্তার করে না। পুলিশ নয়নাকে বসিরহাট আদালতে হাজির করে। বিচারক নয়নাকে জিজ্ঞাসা করেন যে সে নিজের ইচ্ছায় গিয়েছিল, না তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। নয়না স্পষ্টভাবে বলে যে তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তখন বিচারক নয়নাকে তার বাবা মা'র সঙ্গে বাড়ী পাঠিয়ে দেন। বাড়ীতে ফিরে আসার পর থেকেই

রফিকুল ও তার সঙ্গীরা মোটর বাইক নিয়ে নয়নাদের বাড়ীর আশপাশে টহল দিতে শুরু করে আর হুমকি দিতে থাকে। তাই ভয় পেয়ে নয়নার মা-বাবা মেয়েকে তার মামার বাড়ী বাসন্তী থানার তালদা শিকারীপাড়া গ্রামে পাঠায়। গত ২৭ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় যখন বাড়ীতে পুরুষ মানুষ কেউ ছিল না তখন ওই রফিকুল শেখ আর তার এক সঙ্গী মোটর বাইক নিয়ে আসে। মামী আর বৃদ্ধা দিদিমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে নয়নাকে আবার জোর করে তুলে নিয়ে যায়। তারপর থেকে নয়না নিখোঁজ। তার বাবা আবার বসন্তী থানা আর সন্দেশখালি থানা দুই থানাতেই ডায়েরি করে। কিন্তু কোন ফল হয় নি। দুষ্কৃতীরা এলাকায় বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে আর নয়নার মা-বাবাকে হুমকি দিচ্ছে কেস্ করলে কেটে ফেলা হবে। নয়নার মা-বাবা কেঁদে কেঁদে সকলের দরজায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তাদের সাহায্য করার কেউ নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা থেকে প্রায়ই হিন্দু মেয়ে অপহৃতা হচ্ছে। কিন্তু পুলিশ নির্বিকার।

(৪) আর একটি ঘটনায় প্রকাশিত ২০১০-এর অক্টোবর মাসে বাসন্তী থানার অন্তর্গত ৭নং কুমরাখালি শ্মশানের পাশে একা ওঝার তালগাছের পাতা বিনা অনুমতিতে কাটতে থাকে এক মুসলমান দুষ্কৃতী। এতে একা ওঝার স্ত্রী নমিতা ওঝা প্রতিবাদ করতে গেলে ওই মুসলিম দুষ্কৃতী তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে ওই মুসলমান দুষ্কৃতি গছকাটা হাসুয়া দিয়ে নমিতা ওঝাকে ভয় দেখায় আর ওই মহিলাকে মারধর করে। তাতে ওই রুগ্ন মহিলা অসুস্থ হয়ে পড়ে আর জ্ঞান হারায়। এই সুযোগে ওই অজ্ঞান মহিলার ওপর শারীরিক অত্যাচার করা হয়। পরে তার জ্ঞান ফিরলে তার শারীরিক দুর্বলতার কারণে গ্রামাবাসীদের অনেকেই অনুমান করে তার ওপর কি ধরনের অত্যাচার হয়েছিল। এ ঘটনায় অঞ্চল প্রধান সবছেল্লার ভূমিকা আশ্চর্যজনক। তিনি কিছু মুসলিম যুবককে সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে জানতে চান কে তার ওপর অত্যাচার করেছিল। নমিতা সঠিকভাবে অপরাধীকে চিহ্নিত করলে সবদেল মোল্লা তা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলে— ও তোমাকে কেন মারতে যাবে? ও তো দোকানে ছিল। ওর কাছ থেকে আমি বিড়ি কিনে এনেছিলাম। তোমাকে তাহলে ভুতে মেরেছে। রাজনৈতিক চাপে বাসন্তী থানা এই ঘটনার কোন এফ আই আর নেয়নি। এর কোন সঠিক বিচার হয় নি। দোষীর কোন সাজাও হয় নি।

এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ভারত হিন্দুপ্রধান দেশ, তাই এর অপর নাম হিন্দুস্থান। অথচ হিন্দুস্থানে হিন্দু কন্যা মুসলমানদের দ্বারা অপহৃতা, অত্যাচারিতা, নিগৃহীতা, ধর্ষিতা হলেও হিন্দু পুলিশ নির্বিকার থাকে, নিষ্ক্রিয় থাকে। কিন্তু কেন? কারণ কি? কারণ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের স্বার্থ। মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক অটুট রাখতে হবে। মুসলিম সমাজকে অসন্তুষ্ট করা চলবে না। তাই মুসলিম দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। মুসলিম দুষ্কৃতী, সে যত দুষ্কর্মই করুক না কেন তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থানায় গৃহীত হবে না, বিশেষ করে অভিযোগকারী যদি দরিদ্র হয়, সহায় সম্বলহীন হয়। তাই ১৩ বছরের নয়না সরদার, ১৭ বছরের সবিতা মণ্ডল, স্কুল ছাত্রী ১৩-১৪ বছরের চৌতালী, সুস্মিতারা সুবিচার পায় না। "বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।" তাই রফিকুল শেখ পাপ্পু শেখ, সইফুদ্দীন মিস্ত্রীরা এলাকায় বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়, আরও উদ্ধত আরও বেপরোয়া আচরণ করতে থাকে। পুলিশ-এর কর্তা ব্যক্তিদের কাছে জানতে ইচ্ছে করে যেহেতু নয়না, সবিতা, নমিতারা দরিদ্র, সহায় সম্বলহীন তাই তাদের মান ইজ্জৎ নিয়ে যা খুশী তাই করে দুষ্কৃতীরা পার পেয়ে যাবে? "নগরে আগুন লাগিয়ে দেবালয়ও রক্ষা পায়

না" অপ্রবাকাটি কর্তাব্যক্তিরা ভুলে গেছেন? আজ নয়না, সবিতা, নমিতাদের ইজ্জৎ লুঠ হচ্ছে। কিন্তু আগামী দিনে যখন কর্তাব্যক্তিদের স্ত্রী, কন্যা, ভগিনীদের ইজ্জৎ লুঠ হতে থাকবে, রাস্তার ধারে তাদের নিথর নিস্পন্দ বিবস্ত্র দেহ পড়ে থাকতে দেখা যাবে তখনও কর্তাব্যক্তিরা কর্তব্যে অনাসক্ত থাকবেন তো? রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ইচ্ছেয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে অপারগ থাকবেন তো?

আশ্চর্য এই হিন্দু সমাজ আর হিন্দু মানসিকতা। সারা পশ্চিমবঙ্গে এবং অন্যান্য রাজ্যেও যে সমস্ত ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে তাতে হিন্দুর রক্ত গরম হয়ে যাওয়া উচিৎ। কিন্তু হিন্দুর রক্ত, বিশেষ করে বাঙ্গালী হিন্দুর রক্ত গরম হয় না। বাঙ্গালী হিন্দুর রক্ত সাপের রক্তের মতই ঠাণ্ডা। হিন্দু দেবদেবীর সংখ্যা ৩৩ কোটি। এদের হাতে অস্ত্র নেই এমন দেবদেবীর সংখ্যা খুবই কম। অথচ অধিকাংশ বাঙ্গালী হিন্দুর বাড়ীতে অস্ত্র তো দুরের কথা একগাছা লাঠিও থাকে না। তাই দুর্বৃত্তদের দ্বারা আক্রান্ত হলে বাঙ্গালী হিন্দুর পালানো ছাড়া গতি থাকে না। হিন্দু পালাতে পারে আর ঠাকুরের নাম জপ করতে পারে। আর সব কিছু ঘটে যাওয়ার পর 'সবই ঠাকুরের ইচ্ছা' বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারে। এর কারণ কি? ধারণা করা অসঙ্গত নয় যে সমস্ত পরিবারের মেয়েরা মুসলমান দুর্বৃত্তদের দ্বারা লাঞ্ছিতা হয় বা অন্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদের অধিকাংশই হত দরিদ্র, সহায়সম্বলহীন। এও ধারণা করা যেতে পারে তাদের অধিকাংশই পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশে মুসলমানদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এসে আশ্রয় নেওয়া উদ্বাস্তু পরিবার। এরা মুসলমানদের দ্বারা নিগৃহীত উৎপীড়িত হয়ে নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়ে এসে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে কিন্তু আক্রান্ত হলে যে প্রতি আক্রমণে যেতে হয় বা প্রতিরোধ করতে হয় সে সম্পর্কে কোন শিক্ষাই এরা নেয় নি। তাই দেগঙ্গা, বেলেডাঙ্গা, জয়নগর, সাগরদ্বীপসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় হিন্দুরা মুসলমানদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে, মার খাচ্ছে, কিন্তু পাল্টা মার দিতে পারছে না। কাঁদুনি গাইছে আর মুসলমানদের পায়ে পড়ছে। আর কিছুদিন পরে সব ভুলে গিয়ে 'হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই" করছে। আশ্চর্য এই মানসিকতা। কিন্তু কি ঘটেছিল দেগঙ্গা, জয়নগর, সাগরদ্বীপ, বেলডাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলে? এক এক করে আলোচনা করা যেতে পারে।

দেগঙ্গা : ২০১০-এর ৬, ৭ এবং ৮ সেপ্টেম্বর। উত্তর ২৪ পরগনার জেলা শহর বারাসাতের পূর্বদিকে দেগঙ্গা বাজার, কার্তিকপুর বাজার, বিশ্বনাথপুর, খেজুরিডাঙ্গা, বেলিয়াঘাটা বাজার প্রভৃতি উদ্বাস্তু অধ্যুষিত এলাকা। দেগঙ্গা থানার পাশে চট্টলপল্লী। ঘটনার সূত্রপাত একটি বিতর্কিত জমিকে কেন্দ্র করে। রাণী রাসমণির একটি জমি সরকারের খাস জমিতে পরিণত হয়েছিল, যার কিছুটা অংশ মুসলমানরা কবর স্থান হিসেবে ব্যবহার করছিল। পাশেই চট্টলপল্লীর যাওয়া আসার রাস্তা। পাশের জমিতে বহু বছর ধরে চলে আসা চট্টলসমিতির দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল বাঁধার কাজ চলছিল। চট্টলপল্লীর যাওয়া আসার রাস্তা এবং দুর্গাপূজো বন্ধ করে পুরো জায়গাটা কবরস্থান পরিণত করার উদ্দেশ্যে মুসলমানরা রাস্তায় একটি নালা কেটে দেয় আর একটি পাঁচিল তুলে দেয়। স্বভাবতঃই হিন্দুরা বাধা দেয় এবং ধাক্কাধাক্কি ধস্তাধস্তিও হয়। মুসলমানরা তখনকার মত চলে যায়। পরে ইফতারের প্রায় ২০০০ মুসলমান বোমা, পিস্তল, ভোজালি, পেট্রল প্রভৃতি নিয়ে বিভিন্ন হিন্দু এলাকায় আক্রমণ শুরু করে। বেলিয়াঘাটা বাজারের প্রায় ২০০ হিন্দুর দোকান লুঠ করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। দেগঙ্গা থানা থেকে কার্তিকপুর বাজারের দু পাশের

হিন্দুর দোকান লুঠ করা হল। কার্তিকপুর সবজিবাজার সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হল। দেগঙ্গা থানার সামনেই তিনটি দোকান ভাঙ্গা হল। বাজারের সাহা মোবাইল, শ্রীকৃষ্ণ মোবাইল কানাই গুপ্তর মুদির দোকানসহ তিনটি মুদির দোকান ভস্মীভূত করে এবং একাধিক কালীমন্দির ভেঙ্গে দেয়। কালিকাপুরের প্রধান মন্দিরের কালীমূর্তিটি ভেঙ্গে সকলের সামনে সেখানে প্রস্রাব করে মুসলমানরা। খেজুরিডাঙ্গায় ৬টি হিন্দু মন্দির দুষ্কৃতীরা সম্পূর্ণভাবে পুড়িয়ে দেয়। প্রতিটি পাকাবাড়ীর গেট্ বোম্ব চার্জ করে ভাঙ্গা হয়, তারপর লুটপাট করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। সব থেকে বেশী ক্ষতি হয়েছে বাচ্চু কর্মকারের। তিনি ওই অঞ্চলের সব থেকে বড় স্বর্ণ ব্যবসায়ী। কাশ্মীরী যুবকদের মত মুসলমানরা RAF (Rapid Action Force)-কে ঢিল ছুড়তে থাকলে RAF গুলি চালায়। ফলে RAF-এর গুলিতে সাহাবুদ্দীন নামে এক দুষ্কৃতী মারা পড়ে। এতে মুসলমানরা রটিয়ে দেয় বাচ্চু কর্মকার তার নিজের বন্দুক দিয়ে গুলি করে সাহাবুদ্দীনকে হত্যা করেছে। যদিও কোন দিনও কোন বন্দুক বাচ্চু কর্মকারের ছিল না। বারাসাত চাঁপাডালি থেকে বসিরহাট গামী বাসে উঠলে দেখা যায় বেলিয়াঘাটা বাজার থেকে দেগঙ্গা সম্পূর্ণটা টাকি মেইন রোডের দোকান, বাড়ী, মন্দির ভাঙ্গচুর করা এবং পোড়ানো; যেন শ্মশান। কত দোকান? কত বাড়ী? স্থানীয়দের বক্তব্য কমপক্ষে ৫০০ দোকান, বাড়ী আর কোটি টাকার দমের ৪টি গাড়ী। ক্ষতির পরিমাণ কয়েক কোটি টাকা। ওই অঞ্চলের এক পঞ্চায়েত সদস্যা শ্রীমতি কবিতা বৈদ্য টেলিফোনে জানান তাদের বাড়ীর সকলের গায়ে মুসলমান দুষ্কৃতীরা কেরোসিন ঢেলে তাদের পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে। তদের হাতে পায়ে ধরে কোনক্রমে তারা রক্ষা পায়।

দেগঙ্গা এবং সংলগ্ন এলাকায় এত বড় ঘটনা ঘটে গেল, কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি ধ্বংস হল, পুলিশকে পিটুনি খেতে হল RAF নামাতে হল অথচ দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে এর কিছুই প্রকাশিত হল না। টিভির সংবাদমাধ্যমগুলি তিন বাঁদরের ভূমিকা পালন করেছিল, "কিছু দেখি নি, কিছু শুনি নি, কিছু জানি না"। আর মুসলমানদের চরণামৃত পান করা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং বুদ্ধিজীবীরা মৌনীবাবা সেজে ছিলেন। সব কিছু ঘটে যাওয়ার পর প্রশাসনিক তৎপরতায় অবস্থা যখন কিছুটা শান্ত, তখন ওইসব রাজনীতিক আর বুদ্ধিজীবীরা শান্তি মিছিল করলেন। জনসাধারণের কাছে ওই সব অঞ্চলে শান্তি বজায় রাখার জন্য আবেদন করলেন (যাতে মুসলমানদের ওপর পাল্টা আক্রমণ না হয়) শান্তি বৈঠক করলেন। কিন্তু দুষ্কৃতী বা অপরাধীদের ধরবার এবং উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার কোন দাবী জানালেন না। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বললেন না। অথচ এরাই নন্দীগ্রাম, খেজুরি, জঙ্গলমহল, লালগড় প্রভৃতি অঞ্চলে সিপিএম-এর হার্মাদ বাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন। অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবীতে সোচ্চার হয়েছিলেন। অথচ দেগঙ্গা, কার্তিকপুর, বিশ্বনাথপুর, বেলিয়াঘাটা বাজার সংলগ্ন ৫০ বর্গ কিলোমিটর এলাকায় মুসলমান দুর্বৃত্তরা যে বর্বর আক্রমণ চালিয়ে গেল তিন দিন ধরে সে ব্যাপারে সবাই বোবা কানা বনে গেলেন। এরা কি বুদ্ধিজীবী না দুর্বুদ্ধিজীবী? রাজনৈতিক নেতাদের "জোটবদ্ধ মুসলিম ভোটের" লালসা থাকতে পারে। তাহলে এদের লালসা কিসের? সৌদি আরবের নোট? সন্দেহটা অস্বাভাবিক নয়। এরা রিজওয়ানুর-এর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় শোকাহত হন, মৌনমিছিল করেন অথচ দেগঙ্গার ঘটনায় এতটুকু বিচলিত হন না। এদের কি জানা নেই কনৌজ অধিপতি জয়চাঁদ যে মহম্মদ ঘোরীকে সাহায্য করেছিলেন পৃথ্বীরাজকে ধ্বংস করতে, সেই মহম্মদ

ঘোরীই প্রথম সুযোগে জয়চাঁদকে খতম করেছিল। দেগঙ্গার ঘটনাবলী গঙ্গারতীরে ঘটতে খুব বেশী সময় নেবে না। পশ্চিমবঙ্গে প্রশাসনিক ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটেছে ঠিকই তবে পরিস্থিতি আরও ভয়ংকর আরও বিভৎস হবে না তো?

জয়নগর : ২২ জুন ২০০৯ দক্ষিণ ২৪ পরগনায় জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাসাতের কাছে গোচরণ হাট। এখানে কতগুলি হিন্দুগ্রামের মাঝে রয়েছে গাববেড়িয়া হাইস্কুল। ওই স্কুলের চারজন মুসলিম শিক্ষক নিজামুদ্দিন আহমেদ, তানিমুল আলম মোল্লা, মুজিবর রহমান এবং জিয়ায়ুল হক হঠাৎ গ্রীষ্মের ছুটির আগে দাবী করে তাদের নামাজ আদায় করার জন্য প্রতিদিন দুপুরে ১ ঘণ্টা ছুটি দিতে হবে আর স্কুলের একটি ঘর নামাজ আদায় করার জন্য মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করতে দিতে হবে। তারা আরও দাবী করে যে বহুদিন ধরে চলে আসা স্কুলের সরস্বতী পুজো বন্ধ করে দিতে হবে। প্রধান শিক্ষক স্কুলের পরিচালন সমিতিকে এই দাবীর কথা জানান। স্কুলে সরস্বতী পুজো বন্ধ করে দিতে হবে এই দাবী হিন্দু ছাত্রদের কানে গেলে তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং কয়েকজন ছাত্র ওই শিক্ষকদের কিছু বলতে যায়। এতে তানিমুল আর নিজামুদ্দীন ছাত্রদের ক্ষোভ প্রশমিত করতে তাদের পেটাতে শুরু করে। এতে উত্তেজনা বেড়ে যায় এবং স্কুলের সমস্ত হিন্দু ছাত্র এর প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। এই ঘটনার সময় ওই দুজন মুসলিম শিক্ষক বিভিন্ন মুসলিম গ্রামের মসজিদে এবং মাতব্বরদের কাছে ক্রমাগত ফোন করতে থাকে। স্কুলের অন্যান্য হিন্দু শিক্ষকরা তাদের বারণ করলেও তারা শোনে নি। কিছুক্ষণের মধে ৫-৬ হাজার মুসলিম পাশাপাশি রামচন্দ্রপুর, নন্দনপুর, বেনাপুর, কামরিয়া, ময়দা, মগরাহাট তালতলা প্রভৃতি গ্রাম থেকে এসে বিদ্যালয়ে চড়াও হয়। ছাত্র শিক্ষক সবাইকে মারতে শুরু করে। দরজা জানলা সব কিছু ভাঙ্গতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা পশ্চিম গাববেড়িয়া গ্রামে ঢুকে পড়ে। কয়েক হাজার সশস্ত্র মুসলিম দুষ্কৃতিদের দেখে গ্রামের সকলে হতভম্ভ হয়ে যায়। তারপর তাদের উদ্দেশ্য বুঝে সবাই পালাতে শুরু করে দেয়। ওই দুষ্কৃতীরা যাদের সামনে পায় তাদেরই মারতে শুরু করে। মহিলাদের চরমভাবে শ্লীলতাহানি করে। কঙ্কনা নামে আসন্ন প্রসবা এক গৃহবধূকে ধাক্কা মেরে পুকুরে ফেলে দেয়। কালিদাস হালদার নামে একজনকে ক্ষুর মেরে ক্ষত বিক্ষত করে। স্বপন নস্কর নামে একজনকে ইঁট দিয়ে মেরে অর্ধমৃত অবস্থায় রেখে যায়। পরে এক নার্সিং হোমে তার চিকিৎসা হলে সে প্রাণে বেঁচে যায়। রবীন্দ্রনাথ মণ্ডলকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয়, স্থানীয় গোপীনাথ মণ্ডলের ঠাকুর বাড়ী ভেঙ্গে দেয়। মূল দুষ্কৃতীরা হল স্থানীয় বিভিন্ন কুকর্মের নায়ক হরিনারায়ণপুরের সাজাহান মল্লিক তার বড় ছেলে ছাদেক এবং সেই স্কুলের ওই চারজন শিক্ষক। সব ঘটনাই প্রশাসনের জানা। এস ডি পিও বিডিও এবং ওসির উপস্থিতিতে দুইপক্ষের মধ্যে শান্তি বৈঠক হয়। কিন্তু কোন সুরাহা হয় নি। দুষ্কৃতীদের কোন শাস্তিও হয় নি। স্থানীয় বহড়ু উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মুসা আলি মোল্লার ভূমিকা হিন্দু জনসাধারণকে বিস্মিত করে।

বেলডাঙ্গা, ১০ জুলাই ২০০৯ : মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা মহকুমার ঝাউবোনা ও ত্রিমোহনীতে ধর্মান্ধ সশস্ত্র মুসলিম গুণ্ডাবাহিনী একতরফাভাবে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়-এর ওপর যে আক্রমণ চালায় তার নজির সাম্প্রতিক কালে পশ্চিমবঙ্গে নেই। সরকারিভাবে বলা হয়েছে যে দাঙ্গায় মোট খুন হয়েছেন ৪ জন এবং ১৪ জন গুরুতর রূপে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বাস্তবে খুন হয়েছেন ১৪ জন হিন্দু নাগরিক এবং আহতের সংখ্যা ৫০ জনেরও বেশী। বহু হিন্দু নিখোঁজ। কার্ফু জারি থাকায় আত্মীয় স্বজনরা

নিখোঁজদের অনুসন্ধান করতে পারছেন না। দাঙ্গাদমনে স্থানীয় থানার পুলিশবাহিনী নিয়ে D.S.P. পদমর্যাদার একজন অফিসার ঘটনাস্থলে পৌঁছলে সশস্ত্র মুসলিম গুণ্ডাবাহিনী "আল্লা হু আকবর" ধ্বনি দিতে দিতে পুলিশকে আক্রমণ করে। গুণ্ডাদের হাতে অত্যাধুনিক অস্ত্র থাকায় পুলিশকে পিছু হঠতে হয়। D.S.P. সহ মোট ১২জন পুলিশকর্মী হাসপাতালে ভর্তি হন। শুক্রবার ১০ জুলাই সারারাত পুলিশের সঙ্গে দাঙ্গাবাজদের গুলির লড়াই চলে। পরিস্থিতি আয়ত্বে আনতে এলাকায় কার্ফু জারি করা হয়। কিন্তু কার্ফু অমান্য করেই মুসলমান গুণ্ডারা হিন্দুদের বাড়ী দোকান প্রভৃতি লুঠকরে আর পরে আগুন লাগিয়ে দেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে র‍্যাফ, সিআরপি, এবং বিএসএফ নামানো হয়। ঘটনার সূত্রপাত সেই একই, স্কুলে নামাজ পড়ার অধিকার নিয়ে।

এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে গেলেও কলকাতার সংবাদ পত্রগুলিতে কোন সংবাদই প্রকাশিত হল না। টিভি সংবাদ মাধ্যমগুলিও সব খবর চেপে রাখে। দু একটি সংবাদপত্রে ভেতরের পৃষ্ঠায় ছোট করে এমনভাবে সংবাদ পরিবেশিত হয় যাতে প্রকৃত ঘটনা কিছুই প্রকাশিত হয় না। অথচ এই সংবাদ মাধ্যমগুলি অযোধ্যায় '৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের কারণে ফলাও করে ছবি ছাপিয়ে সংবাদ প্রকাশ করছিল। আবার ২০০২ সালে গোধরায় সবরমতি এক্সপ্রেসের এস-৬ কামরায় ৫৭ জন হিন্দুকে পুড়িয়ে মারা হলেও সংবাদ মাধ্যমগুলি বিচলিত হয় নি। কিন্তু এরই প্রতিক্রিয়ায় গুজরাটের কিছু অংশে যখন হিন্দুরা উত্তেজিত হয়ে মুসলমানদের ওপর অত্যাচার শুরু করেছিল তখন হই হই করে আসরে অবতীর্ণ হল সংবাদ মাধ্যমগুলি। ছবি ছাপিয়ে ফলাও করে প্রচার শুরু করে দিল মুসলমানদের ওপর অত্যাচারের কাল্পনিক এবং আজগুবি সব কাহিনী। হিন্দুরা কি পৈশাচিকভাবে মুসলমানদের অত্যাচার করছে তার সব মনগড়া গপ্পো। নামী দামী বুদ্ধিজীবীরাও পিছিয়ে থাকতে রাজী ছিলেন না। এদের মধ্যে রয়েছে অরুন্ধতী রায়, মহাশ্বেতা দেবী, হর্ষ মন্দার, দেবেশ রায়, মইনুল হাসান, আবদুর রইফ, জ্যোতিপ্রকাশ চক্রবর্তী সহ কয়েকজন নামী দামী ব্যক্তি। মহাশ্বেতা দেবী প্রায় ৮০ বছর বয়সে স্বয়ং চলে গিয়েছিলেন গুজরাটে। সেখানে শরনার্থীদের ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরেছেন। তিনি দেখেছেন যত, শুনেছেন তার থেকে অনেক বেশী। তারপর কলকাতায় ফিরে জম্পেশ করে গপ্পো ফেঁদেছেন নানা পত্রিকায়। আসলে সারা দেশে একটা অশুভ শক্তি কাজ করে চলেছে। একটা চক্রান্ত চলছে, আর এই চক্রান্তের সামিল হয়েছে দেশের নামী দামী কিছু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম এবং উচ্চাভিলাষী বুদ্ধিজীবীগণ। তাই দেগঙ্গা, জয়নগর বা বেলডাঙ্গা অঞ্চলের ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না, কোথাও আলোচিত হয় না। কোথাও প্রতিবাদ মিছিল তো হয়ই না। ব্যারাকপুরে মহিলা খেলোয়াড়রা স্থানীয় মুসলমান যুবকদের দ্বারা লাঞ্ছিত হলে, নিগৃহীতা হলেও সেটা কোন সংবাদ হয় না, তাই সংবাদপত্রে তার 'ঠাই' হয় না। কিশোরীকে মুসলমান দুষ্কৃতীরা ট্রেন থেকে টেনে নামালেও সেটা কোন সাংবাদ হয় না। কি ঘটেছিল সেদিন? ২০০৯-এর ১০ নভেম্বর সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল 'একদিন' পত্রিকায়। শনিবার রাতে শিয়লদহগামী বজবজ লোকাল ট্রেনটি সিগনাল না পেয়ে পার্কসার্কাস স্টেশনে ঢোকার মুখে দাড়িয়ে পড়ে। ওই সময় ওই এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন সশস্ত্র মুসলিম দুষ্কৃতী লাফ দিয়ে ট্রেনের লেডিজ কম্পার্টমেন্টে উঠে পড়ে। কম্পার্টমেন্টের মহিলাদের অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে অশালীন আচরণ করতে থাকে এবং টেনে কামরা থেকে নামাতে চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে ট্রেন চলতে শুরু

করলে দুষ্কৃতীরা লাফিয়ে ট্রেন থেকে নেমে পড়ে। কিন্তু ইতিমধ্যে কামরা থেকে ১৫-১৬ বছরের এক কিশোরীকে কানে পিস্তল ঠেকিয়ে প্রায় চলন্ত ট্রেন থেকেই নামিয়ে নেয়। ট্রেন শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছলে কামরার অন্যান্য মহিলা যাত্রীরা জিআরপিতে অভিযোগ জানায়। পরে বালিগঞ্জ জিআরপিতে অভিযোগ জানানো হয়। মেয়েটি দমদম মধুঘর এলাকার বাসিন্দা। মেয়ে গান শিখতে বজবজ গিয়েছিল। অন্যান্য দিন সন্ধ্যের মধ্যে ফিরে আসে, তবে সেদিন রাত হয়েছিল। দুষ্কৃতীরা মেয়েটিকে তিলজলার একটি পরিত্যক্ত গোডাউনে আটকে রেখেছিল। মেয়েটিকে দুষ্কৃতীদের যৌন লালসার শিকার হতে হয়েছিল। পরে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে এবং চার দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে। পরবর্তী সংবাদ আর প্রকাশিত হয় নি। ধারণা করা অসঙ্গত নয় যে প্রমাণাভাবে অপারাধীরা বেকসুর ছাড়া পেয়ে গেছে।

শুধু লোকাল ট্রেন নয়, মেট্রো রেলেও হিন্দু তরুণীর শ্লীলতাহানি করছে মুসলিম যুবক। ২০১০-এর ৮ জুন-এ বর্তমান-এর এক সংবাদে প্রকাশ দমদমগামী মেট্রো ট্রেনটি সকাল ১০টা নাগাদ 'কবি নজরুল' থেকে ছাড়ে। ট্রেনটি টালিগঞ্জ স্টেশনে আসতেই একদল ছেলে ট্রেনে ওঠে। ট্রেনটিতে প্রচণ্ড ভিড় ছিল। কালীঘাট স্টেশনে ট্রেনটি আসতেই একটি কামরায় হইচই শুরু হয়ে যায়। সফিক নামে এক যুবক তার শ্লীলতাহানি করেছে বলে এক তরুণী চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে এবং সফিক নামক যুবকটিকে একটি চড়ও মারেন। এর পর ময়দান স্টেশনে অন্যান্য যাত্রীদের সহায়তায় যুবকটিকে পুলিশের হাতে দেওয়া হয়। এ ধরনের ঘটনা হামেশাই ঘটে চলেছে, শুধুমাত্র গ্রামে গঞ্জে নয় শহরাঞ্চলেও। আর একটি ঘটনা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ২০০৯-এর ১৮ আগস্ট তিনজন মুসলিম দুষ্কৃতী একটি মোটর বাইকে করে স্কুলের ছাত্রীদের একটি টাটাসুমো গাড়ী, রাস্তাতেই থামাতে চেষ্টা করে, টাটাসুমোর ড্রাইভার বিনোদ জয়সয়ালকে গাড়ী থামাবার নির্দেশ দেয়। বিনোদ গাড়ী চালাতে চালাতে এই নোংরামির প্রতিবাদ করছিল, গাড়ী না থামিয়েই। এই মুসলমান দুষ্কৃতীদের উদ্দেশ্য ছিল একটি স্কুল ছাত্রী অপহরণ করার। বিনোদ গাড়ী না থামানোতে তারা হুমকি দিয়েছিল, "চল মেটিয়াব্রুজে তোকে দেখে নেব।" মেটিয়াব্রুজে এসে তারা মোটরবাইকটি টাটাসুমোর সামনে দাঁড় করিয়ে টাটা সুমোটাকে থামতে বাধ্য করে। তারপর গাড়ীর ড্রাইভার বিনোদকে গুলি করে। বিনোদ রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে গেলে তারা চলে যায়, মোটর বাইক চালিয়েই। গাড়ীর মধ্যে বসে সাধনা, প্রিয়ঙ্কা, মনোরমারা কাঁদছিল। বিনোদকে তারা সুমো আঙ্কল বলে ডাকত। মোটরবাইক আরোহীরা চলে গেলে মেয়েগুলিও ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মিনিট দশেক হেঁটে স্কুলে পৌঁছয়।

এখন প্রশ্ন মুসলমানদের এত ঔদ্ধত্য,এত স্পর্ধা, এত দুঃসাহস হয় কি করে? শুধু হওয়া নয়, উত্তরোত্তর এটা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু কারণ কি? কারণ তারা বুঝে গ্যাছে হিন্দুরা ভীতু কাপুরুষ। তারা লড়াই করতে ভয় পায়। আক্রান্ত হলে তারা পালায়, আর ঠাকুর ঠাকুর করে। মুসলমানরা বিশ্বাস করে হিন্দুদের ঠাকুরের কোন ক্ষমতাই নেই। তাই তারা কালী প্রতিমা ভেঙ্গে দিয়ে নির্ভয়ে নিঃসংকোচে সেখানে প্রস্রাব করে দেয়। শুধুমাত্র কালীঠাকুর নয়, হিন্দুদের কোন দেবদেবীরই কোনই ক্ষমতা নেই। তাই হিন্দুর দেবদেবীর মন্দির ভেঙ্গে দেবদেবীর মূর্তি থেকে সোনার গয়না খুলে নিতে এতটুকুও ভয় পায় না। গজনীর সুলতান মামুদ ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেছিলেন, বহু হিন্দুমন্দির ধ্বংস করেছিলেন, গুজরাটের সোমনাথ-এর মন্দির ধ্বংস করে শিবমূর্তিটি চূর্ণ করে গজনীর

প্রাসাদ এবং মসজিদের সোপানশ্রেণীতে সেগুলি প্রোথিত করার ব্যবস্থা করেন যাতে সেগুলি নিয়মিতভাবে মুসলমানদের দ্বারা পদদলিত হতে পারে। সুলতান মামুদ শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি মথুরা এবং লীলাভূমি বৃন্দাবন তছনছ করেছিলেন। মথুরাকে বলা হত প্রাসাদ নগরী। এক সহস্র দেবতার মূর্তি এবং প্রাসাদ সম্বলিত মথুরা নগরী ভগ্নস্তপে পরিণত করেন। হিন্দু রক্তে বৃন্দাবন এবং মথুরার মাটি কদর্মে পরিণত হল। হিন্দু রমনীদের লাঞ্ছনার সীমা-পরিসীমা ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু অবির্ভূত হননি। ভক্তদের রক্ষা করতে। অথচ আমরা নিয়মিতভাবে গীতাপাঠ করে চলেছি। "পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম, ধর্ম সংস্থাপনার্থয় সম্ভবামি যুগে যুগে"। স্বয়ং মহাদেবও সোমনাথ মন্দিরে আশ্রয় নেওয়া সাধু সন্নাসী এবং স্ত্রী-পুরুষ ভক্তবৃন্দকে রক্ষা করতে পারেন নি, সুলতান মামুদের নিষ্ঠুর আক্রমণ থেকে। অথচ এখনও শতশহস্র স্ত্রীপুরুষ পূণ্যার্থী কাঁধে বাঁকে গঙ্গা জল নিয়ে দলে দলে চলেছে তারকেশ্বর, বর্ধমানেশ্বর প্রভৃতি জায়গায় শিবের মাথায় জল ঢালতে। কি প্রগাঢ় ধর্মবিশ্বাস। মুসলমানরা বিশ্বাস করে আল্লাহতালা সর্বশক্তিমান। আল্লাহতালার হুকুম ছাড়া গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ে না। কিন্তু হিন্দুদের দেবদেবী? কতগুলি মাটির বা পাথরের পুতুল মাত্র। তাদের কোন শক্তিই নি খোদার বান্দাদের ক্ষতি করবে। তারা পড়েছে, জেনেছে মুসলমান বাদশাহরা হাজার হাজার হিন্দু মন্দির ভেঙ্গেছে, দেব বিগ্রহগুলি কলুষিত করেছে, চূর্ণবিচূর্ণ করেছে, পদদলিত করেছে কিন্তু সুলতান, বাদশা বা মুসলমানদের কোন ক্ষতি হয়নি। তবুও হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসে এতটুকু ফাটল ধরে নি। ২০১০-এর সেপ্টেম্বরে দেগাঙ্গা কালিকাপুরে প্রধান কালীমন্দিরে কালীমূর্তি ভেঙ্গে মুসলমান দুষ্কৃতীরা সেখানে প্রস্রাব করে দিল। এতে হিন্দু কালীভক্তরা এতটুকু বিচলিত হল না। এর মাস খানেকের মধ্যে সারা রাজ্যে, সাড়ম্বরে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হলো। আলোকসজ্জা, নাচগান, কোনকিছুরই কার্পণ্য লক্ষ্য করা গেল না। কি অসাধারণ কালীভক্তি!

মুসলমানদের স্পর্ধা, ঔদ্ধত্য, দুঃসাহস প্রভৃতির কারণ শুধুমাত্র হিন্দুদের কাপুরুষতা এবং ঈশ্বরনির্ভরশীলতা নয়। ভারতে প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী রাজনৈতিক নেতাদের ক্রমগত মুসলমানদের তৈলমর্দন-এর অন্যতম প্রধান কারণ। মুসলীম দুষ্কৃতীরা যত অন্যায়ই করুক না কেন তাদের কোন সাজা দেওয়া চলবে না। তাই দিল্লী সংসদ ভবন আক্রমণকারী জঙ্গী আফজল গুরুর ফাঁসীর আদেশ কার্যকরী করা হয় না, আর এক ফাঁসীর আসামী আজমাল কাসভকে জেলখানায় বিরিয়ানী খাওয়ানো হয়; যেহেতু শ্রীনগরে লালচকে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন মুসলমানদের না পসন্দ, তাই সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের প্রচেষ্টা সরকার থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং পতাকা উত্তোলনকারীদের নির্দয়ভাবে পেটানো হয়। বিষয়টা অবশ্য খুব একটা আশ্চর্যের নয়। কারণ এই শ্রীনগরেই হজরত বাল মসজিদে আশ্রয় নেওয়া লড়াকু জঙ্গীদের সরকার থেকে বিরিয়ানী খাওয়ানো হয়েছিল। যথার্থই হয়েছিল। কারণ জঙ্গীরা জঙ্গীপনা করতে এসেছিল ঠিকই, তাই বলে তাদের তো না খেতে দিয়ে মেরে ফেলাটা কি উচিৎ হতো? অবশ্যই না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং বলেছেন "ভারতের সম্পদের উপর সংখ্যালঘুদের প্রথম অধিকার"। যথার্থই বলেছেন কিন্তু কেন, সেকথা বলেননি। যারা হিন্দুদের সঙ্গে পাশাপাশি বাস করলে নিজেদের ধর্মসংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে না এই অজুহাতে ভারত ভাগ করে নিজেদের হোমল্যান্ড সাধের পাকিস্তান আদায় করে নিয়েছিল তাদের তো ভারতে থাকার কোন অধিকারই নেই। অথচ প্রধানমন্ত্রী বললেন দেশের সম্পদের ওপর সংখ্যালঘুদের

প্রথম অধিকার। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন। অতএব যথার্থই বলেছেন। অবশ্য সংখ্যালঘুদের তুষ্টি করণের চেষ্টা এটা প্রথম নয়। কারণ স্বাধীনতার পর ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন "পাকিস্তান রাষ্ট্রগঠিত হয়েছে। ওদের উন্নতির দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে।" কেন? কিসের দায়? উত্তরটা সহজ, মুসলিম তুষ্টিকরণ। কিন্তু মুসলিম তুষ্টিকরণ অত সহজ নয়। কুকুরের বাঁকানো লেজ যেমন কখনই সোজা করা যায় না। তেমনই মুসলমানদেরও কখনই তুষ্ট করা সম্ভব নয়। অথচ সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করার চেষ্টায় ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। হ্যাঁ স্বাধীনতার সময় থেকেই। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু প্রথম থেকেই নজর দিয়েছিলেন মুসলমানদের সুবিধে অসুবিধের দিকে। প্রধানমন্ত্রী হয়েই তাঁর প্রধান কাজ হলো ভারতের মুসলমান যারা পাকিস্তানে যেতে আগ্রহী, তারা যাতে নিরাপদে এবং নির্ভয়ে পাকিস্তানে চলে যেতে পারে তার ব্যবস্থা করা, কিন্তু হিন্দু ও শিখ যারা পাকিস্তান থেকে ভারতে আসতে ইচ্ছুক তারা কিভাবে নিরাপদে ভারতে আসবেন সে বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা ছিল না। এরপর সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীর নিয়ে এমন এক জটিলতা সৃষ্টি করলেন যে স্বাধীনতার ৬৪ বছর পরেও কাশ্মীর ভারতের Head and headache হয়ে রয়েছে এবং থাকবেও। চরম জাতীয়তাবিরোধী শেখ আবদুল্লাকে জম্মু ও কাশ্মীরের 'উজিরে আজম' করলেন এবং সংবিধানের ৩৭০ নম্বর ধারা অনুযায়ী বিশেষ মর্যাদা দিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরকে প্রায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করলেন। কাশ্মীরের সংবিধান আলাদা, পতাকা আলাদা এবং রাষ্ট্রপতিও আলাদা; অন্য একজন। ফলে সেখানকার অর্থাৎ কাশ্মীরের হিন্দুঅধিবাসীরা মুসলমানদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কাশ্মীর থেকে পালাতে শুরু করলো। এখন হিন্দুপ্রধান জম্মুও কাশ্মীরী মুসলমানদের অত্যাচারে দিশাহারা। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু কন্যা এক মদ বিক্রেতার ছেলে ফিরোজখানকে সাদী করে হয়েছিলেন ফরজানা বেগম। এই ফরজানা বেগম ওরফে ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৬ সালে ভারতের সংবিধান সংশোধন করে ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণা করলেন। উদ্দেশ্য দেশের মুসলমান নাগরিকবৃন্দ যাতে স্বাধীনভাবে ধর্মাচারণ এবং ধর্ম প্রচার করতে পারেন। কোন বাধা সৃষ্টি যাতে না হয়। ভারতকে ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করার এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। দেশের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে কিছু নাগরিককে ঐস্লামিক চরিত্র বজায় রাখার সুড়সুড়ি দিয়ে দেশের ৪১টি জেলাকে ১৯৭১ সালে জনগণনা অনুযায়ী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা হিসাবে চিহ্নিত করলেন এবং সেই সমস্ত জেলার মুসলমানরা যাতে অর্থনৈতিকভাবে বিশেষ সুবিধা পান তার ব্যবস্থা করলেন। ২০১১ সালে জনগণনায় সারা দেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলার সংখ্যা দাঁড়াবে সম্ভবত ৪৫০-এর কাছাকাছি। তখন এই সমস্ত জেলাগুলির জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। ইন্দিরা গান্ধী তথা ফরজানা বেগমের মৃত্যুর পর তার পুত্র রাজীব রবার্তো গান্ধীও মাতা এবং মাতামহের প্রদর্শিত পথেই পদচালনা শুরু করলেন। অর্থাৎ মুসলিম তাস খেলতে শুরু করলেন। শাহাবানু মামলার কথা আমরা বিস্মৃত হইনি নিশ্চয়ই। বিগত যৌবনা তালাকপ্রাপ্তা শাহাবানুকে খোরপোষ দেওয়ার স্বপক্ষে সুপ্রীম কোর্ট রায় দিয়েছিল। বিষয়টা ১৯৮৫ সালের। দেশের আইন অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের এই রায় ছিল যথাযথ। কিন্তু হইচই শুরু করে দিল মুসলিম সমাজ। মুসলমানরা তাদের ব্যক্তিগত আইনের রক্ষা কবচে কোনো বিচারালয়ের রায় মানতে বাধ্য নয়। তাই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব

রবার্তো গান্ধী দেশের সংবিধান সংশোধন করে দেশের প্রচলিত আইনের পরিবর্তন ঘটালেন। দেশের কিছু ধর্মান্ধ মোল্লাদের সন্তুষ্ট করতে গিয়ে তালাকপ্রাপ্তা শাহাবানু সহ অন্যান্য মুসলিম মহিলাদের প্রতি বর্বরোচিত আচরণ করা হল। তা হোক কিন্তু কিছু ভারত বিরোধী উগ্র ধর্মান্ধ মওলানা মওলভীকে তো ঠাণ্ডা করা গেল।

"সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে"। মুসলমানদের জন্য "আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তারি লাগি তাড়াতাড়ি" শুরু হয়েছে। সংবাদে প্রকাশ ইউপিএ সরকারের 'অন্তরাত্মা' সনিয়া গান্ধীর নির্দেশ হল সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার নামে মুসলিম সম্প্রদায়কে বেছে বেছে ভীত সন্ত্রস্ত করা চলবে না। এ ব্যাপারে কংগ্রেস দলকে সজাগ ও সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন সনিয়া গান্ধী। কংগ্রেসের সব দলীয় মুখ্যমন্ত্রীদের সুনির্দিষ্টভাবে এই নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি সনিয়া একথা প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এবং তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাতিলকেও জানিয়ে দিয়েছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে ২০০৬-এর জুলাইতে মুম্বই বিস্ফোরণের পর মহারাষ্ট্রে পুলিশ ও গোয়েন্দবাহিনী যেভাবে মুসলিম যুবকদের ধরপাকড় চালাচ্ছিল তাতে মোটেও খুশী ছিলেন না সনিয়া গান্ধী। সনিয়া গান্ধী আরও বলেছেন "দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তারক্ষায় আমরা কোনও আপস যেমন করব না, তেমনই একতরফা মুসলিম সম্প্রদায়কেও টার্গেট করব না। বরং মুসলিমদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কেন্দ্র ও দলীয় রাজ্য সরকারকে আরও বেশী মনযোগী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন কংগ্রেস সভানেত্রী। এততেও সন্তুষ্ট না হয়ে কংগ্রেস দলের মাসিক মুখপত্র 'সন্দেশ' পত্রিকায় কংগ্রেস কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি লিখলেন "সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় যেন কোন একটি সম্প্রদায়কে ভীত ও সন্ত্রস্ত করায় পর্যবসিত না হয় তা সুনিশ্চিত করতে হবে।"

মুসলিম তুষ্টিকরণে আত্মতুষ্টির কোন স্থান নেই। তাই প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর নির্দেশ রাজ্য পুলিশে বাড়াতে হবে মুসলমানদের সংখ্যা। রাজ্যে রাজ্যে পুলিশে নিয়োগের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। শুধুমাত্র পুলিশ নয়। রেল, রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে চাকরির ব্যাপারে বাড়তি নজর দিতে হবে। সংখ্যালঘুদের সরকারি প্রতিষ্ঠানে এবং নামী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেও প্রশিক্ষণের বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনীতেও বিশেষ নজর দিতে হবে সংখ্যালঘুদের নিয়োগ করার ব্যাপারে। দাঙ্গাপ্রবণ এলাকায় দক্ষ, পক্ষপাতহীন ও ধর্মনিরপেক্ষ অফিসারদের নিয়োগ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে যে পনেরো দফা নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন তাতে সংখ্যালঘুদের উন্নতিতে বিভিন্ন কর্মসূচির উল্লেখ রয়েছে। চাকরির ক্ষেত্র ছাড়াও আরও নানা পদক্ষেপের কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। যেমন ইন্দিরা আবাসন যোজনায় আলাদা করে গ্রামীণ দরিদ্র সংখ্যালঘুদের জন্য লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করতে বলা হয়েছে। নেহেরু বস্তি উন্নয়ন মিশন প্রকল্পের ক্ষেত্রেও সমানুপাতিক হারে সংখ্যালঘুদের জন্য লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করতে বলা হয়েছে। যথেষ্ট সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা বলতে বোঝানো হয়েছে যেখানে সেখানকার অধিবাসীদের অন্তত ২৫ শতাংশ সংখ্যালঘু। জোর দেওয়া হয়েছে সংখ্যালঘুদের শিক্ষার প্রসারের দিকেও। বিভিন্ন রাজ্যে উর্দুভাষার শিক্ষক যাতে যথেষ্ট সংখ্যায় থাকেন তা দেখতে হবে। শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘুদের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণের কাজ আরও জোরদার করতে হবে। মেধাবী সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। সংখ্যালঘুদের আর্থিক উন্নতির জন্য

স্বনিযুক্তির ওপরেও জোর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ইন্দিরা আবাস যোজনা, সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনা এবং স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা— এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ভবিষ্যতে ১৫ শতাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষণ থাকবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এবং তাদের সামাজিক কল্যাণের জন্য ইউপিএ সরকার যে ১৫ দফা কর্মসূচী রূপায়ণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার রূপরেখা তৈরির কাজ সমস্ত মন্ত্রকে জোরকদমে শুরু হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক সর্বপ্রথম সেইসব প্রকল্প চিহ্নিত করে ফেলেছে, যেগুলিতে সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। কারিগরি প্রশিক্ষণের সুযোগ সমন্বিত কেন্দ্রগুলিকে উন্নত করতে হবে। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে এই তিন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের জন্য জাতীয়ভাবে কেন্দ্র যা বরাদ্দ করবে তার ১৫ শতাংশ অর্থ এবং কাজের যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হবে তারও একটি অংশ সংখ্যালঘুদের জন্য বরাদ্দ থাকবে। উল্লেখ্য সংখ্যালঘুদের সামাজিক উন্নতির জন্য ঘোষিত ১৫ দফা কর্মসূচী কিভাবে রূপায়ন করা সম্ভব তা চিহ্নিত করতে কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রককে এই কর্মসূচির নোডাল এজেন্সির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলি পর্যালোচনা করে দেখলে কি ধারণা করা অসঙ্গত হবে যে আমাদের দেশের ইউ পি এ সরকার সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের বিষয়ে নিবেদিত প্রাণ। এদেশের সংখ্যালঘু তথা মুসলমান নাগরিকরা নাকি দরিদ্র, অবহেলিত, অনগ্রসর, বঞ্চনার শিকার, শিক্ষার আলোক বর্জিত এবং আরও অনেক কিছু। যদি সত্যিই তাই হয়, তাহলে সেজন্যে দায়ী কে বা কারা সেটা নির্ণয় এবং তার প্রতিবিধান না করে শুধুমাত্র গুচ্ছ গুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা করে সেগুলি কার্যকরী করার ব্যবস্থা করলে কোন উপকারই হবে না। শুধুমাত্র অর্থ ব্যয়ই হবে। মনে রাখা দরকার ভারতে অতি দরিদ্র মুসলমানের সংখ্যা ৫ কোটি আর অতি দরিদ্র হিন্দুর সংখ্যা ২৩ কোটি। এই ২৩ কোটি আতি দরিদ্র হিন্দুর উন্নয়নের জন্য সরকারের কোন মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। সরকারের যত চিন্তাভাবনা ওই ৫ কোটি অতি দরিদ্র মুসলমানের জন্য।

মুসলমানদের তোয়াজ করতে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার যে বিভিন্ন রকম প্রকল্প গ্রহণ করেছে, ব্যবস্থা নিচ্ছে, আইন প্রণয়ন করছে তা নয়। সরকারি ক্ষমতায় থাকা রাজনীতিক এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দও ক্রমাগত মুসলিম তোষণ করে চলেছেন। লক্ষ্য অবশ্যই জোটবদ্ধ মুসলিম ভোট কব্জা করা। তাই প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন দেশভাগের জন্য দায়ী হিন্দু মহাসভা, আর.এস.এস (মহম্মদ আলি জিন্নাহ বা মুসলিম লীগ নয়?)। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন সিং এবং এ আর আন্তুলে দাবী করেন ২০০৬ সালের ১১ জুলাই মুম্বাইতে ৭টি রেল স্টেশনে যে পরপর বিস্ফোরণ ঘটেছিল তাতে মুসলমানরা আদপেই জড়িত ছিলনা, ওটা নাকি হিন্দু সন্ত্রাসবাদীদেরই কাজ। তাঁরা আরও বলেন নাগপুরে আরএসএস সদর দপ্তর-এ বিস্ফোরণ ঘটিয়ে যে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল সেটাও নাকি আরএসএস প্ল্যান অনুযায়ীই হয়েছিল। উত্তর প্রদেশ-এর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমাজবাদী পার্টির নেতা মুলায়েম সিং যাদব বলেন SIMI কোন সন্ত্রাসবাদী সংগঠন নয়, SIMI একটি সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান। অথচ তদন্তে প্রকাশ পেল সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির সঙ্গে SIMI প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। দেশের হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টকে যারা অগ্রাহ্য করে, দেশের সংবিধানকে যারা তুচ্ছ জ্ঞান করে তাদের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য

রাজনৈতিক দলগুলির এই ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকে নির্লজ্জ স্তাবকতা ছাড়া আর কি আখ্যা দেওয়া যেতে পারে? সারমেয়সুলভ এই মনোবৃত্তিকে জঘন্য চাটুকারিতা বললেও কিছুই বলা হয় না।

যারা দেশের হাইকোর্টের আদেশ তুচ্ছজ্ঞান করে, সুপ্রিম কোর্টের রায় অগ্রাহ্য করে, দেশের সংবিধানকে গুরুত্ব দেয় না, যারা স্লোগান দেয় "ওসামা তুম আগে বাঢ়ো, হম তুমহারা সাথ হ্যায়" তাদের প্রতি আমাদের দেশের সরকার এবং রাজনৈতিক নেতাদের এত পক্ষপাতিত্বের কারণ রহস্যজনক মনে হয় না কি? মমতা ব্যানার্জী পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় নেত্রী। তিনি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মুখমন্ত্রী। সরকারি ক্ষমতাসীন হয়েই তিনি ১০,০০০ বেআইনি মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দিলেন, যাতে অদূর ভবিষ্যতে এগুলিকে সরকারি অনুদানের আওতায় আনা যায়। কিন্তু কেন? মাদ্রাসা শিক্ষা মুসলিম সমাজের কি উন্নতি ঘটাবে? দরিদ্র মুসলিম সমাজ পরিচালিত হয় মোল্লা মৌলভীদের নির্দেশে। তাদের নির্দেশেই দরিদ্র মুসলমানরা সন্তানসন্ততিদের মাদ্রাসা মক্তবে পাঠায় শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে। কিন্তু কি শেখে তারা সেখানে? কুরআন শারিফের কিছু আয়াৎ, ইসলামিক ধর্মচর্চা এবং হজরত মহম্মদ-এর জীবনী। এতে আর যাইহোক আধুনিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। ফলে দরিদ্র মুসলিম সমাজ অনুন্নত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, শিক্ষার আলোকবর্জিত থেকে যায়। ফলে দারিদ্র তাদের চিরসঙ্গী, কুসংস্কার তাদের মজ্জাগত হয়ে যায়। এদেশকে তারা স্বদেশ ভাবতে শেখে না। তারা শেখে, বোঝে আরবের সংস্কৃতিই তাদের সংস্কৃতি, আরবের রীতিনীতি, আচার আচরণ, পোশাক পরিচ্ছদ, খাদ্যাভাস তাদের নিজস্ব। তাই এদেশকেই তারা আরব রাষ্ট্র অর্থাৎ ইসলামিক রাষ্ট্র বানাতে সক্রিয় হয়। তারা জানে এদেশের প্রশাসন তাদের রক্ষক, এদেশের রাজনীতিকরা তাদের পালিত সারমেয়। তাই তারা ইচ্ছেমত জমি দখল করে পাঁচিল দেয় মসজিদ বানাতে, রাস্তায় ইচ্ছেমত মাজার তৈরি করে, আধুনিক অস্ত্র নিয়ে, দাঙ্গাদমন করতে আসা পুলিশকে পর্যন্ত আক্রমণ করতে দ্বিধা করে না, এরা দিনকে দিন এতই বেপরোয়া হয়ে উঠছে। উচ্চ আদালতের নির্দেশ অমান্য করে প্রশাসনের মদতে এরা প্রকাশ্যে গো-কোরবানি করে। বিভিন্ন মসজিদ থেকে লাউড স্পিকারের সাহায্যে উচ্চগ্রামে জনবহুল এলাকায় দিনে পাঁচবার করে আজান দেয়। উচ্চ আদালত 'আদালত অবমাননার' কারণে শমন জারি করলে ইমামরা গ্রাহ্য করে না, প্রশাসনও কোন ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন মনে করে না। এদের স্পর্ধা, এদের ঔদ্ধত্য গগনচুম্বী। কোন বেআইনি কাজকে এরা গ্রাহ্য করে না। তাই ফাঁকা বাড়ীতে ঢুকে হিন্দু কিশোরীকে একা পেয়ে ধর্ষণ করতে দ্বিধা করে না। চলন্ত ট্রেনের মহিলা কামরা থেকে কিশোরীকে টেনে নামিয়ে নেয়, স্কুল ফেরৎ কিশোরী ছাত্রীদের মধ্যে থেকে মুসলিম ছাত্রীদের ছেড়ে দিয়ে বেছে বেছে হিন্দু ছাত্রীদের ধর্ষণ করে; এরা এতই বলদর্পী। দুষ্কৃতীদের শাস্তির দাবীতে হিন্দুরা থানায় বিক্ষোভ দেখালে বা পথ অবরোধ করলে পুলিশ বীর বিক্রমে হিন্দুদের ওপর লাঠি চার্জ করে শক্তি প্রদর্শন করে। আর মুসলমান দুষ্কৃতীরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। পুলিশ তাদের ধারে কাছেও ঘেঁষে না।

আর এইসব দুষ্কৃতীদের উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জান কবুল করেছেন। তিনি সংখ্যালঘুদের উন্নয়ন এবং নানা কিসিমের সাহায্যের জন্য "পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্তনিগম" নামে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা গঠন করেছেন যার কাজ শুধুমাত্র সংখ্যালঘুদের লোন এবং স্কলারশিপ বিতরণ করা। যে রাজেন্দ্র সাচারকে উনি কলকাতায়

আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ৮৭ বছর বয়স্ক সেই রাজেন্দ্র সাচার পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে টাউন হলে বৈঠকে রাজ্যে মুসলিমদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দিয়েও বলেছেন শুধু সংখ্যালঘু মানুষ নয় সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের সমহারে বিকাশের জন্য রাজ্য সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। অথচ মুখ্যমন্ত্রী কি ঘোষণা করে চলেছেন এবং করছেন একটু আলোচনা করা যেতে পারে।

গত ৩০ জুলাই ২০১১ নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী একতরফাভাবে শুধুমাত্র মুসলমানদের উন্নয়নের কথা ঘোষণা করে গেলেন। তিনি ঘোষণা করেন প্রতিটি জেলায় সংখ্যালঘুদের জন্য হাউজিং তৈরি করা হবে। প্রতি বছর ৫০ হাজার হাউজিং তৈরি হবে সংখ্যালঘুদের জন্য। চাকরি, শিক্ষাসহ বিভিন্নক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণের জন্য বিধানসভায় নতুন করে বিল আনবে মা-মাটি-মানুষের সরকার। এদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের স্কুল-কলেজ পড়ুয়া স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগীদের ঋণ ও বৃত্তি বাবদ ৫৪ হাজার ১৬৬ জনের মধ্যে ২১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা বণ্টন করা হয়। মোট ৫২ হাজার ৩৪৪ জন সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীকে ১৭ কোটি ৬৮ লক্ষ ১২ হাজারেরও কিছু বেশী টাকা বৃত্তি বাবদ দেওয়া হয়। স্বনিযুক্তি প্রকল্পে ১৮২২ জনকে মোট ৩ কোটি ৬৬ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা নিগমের পক্ষ থেকে ঋণ বাবদ দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী ওইদিন ঘোষণা করেন ইন্দিরা আবাস যোজনায় সংখ্যালঘুদের জন্য ৩৭ হাজার ৩০০টি বাড়ি, ৭০০২টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং ৩৯টি নতুন উর্দু স্কুল তৈরি করা হচ্ছে। স্বনিযুক্তি প্রকল্পের মহিলাদের কয়েকটি গোষ্ঠীকে গ্যাসের ওভেন দেওয়া হয়।

উল্লেখিত কর্মসূচীগুলি বাস্তবায়িত হলে পরিণাম কি হতে পারে? আবাসন প্রকল্পগুলির জন্য প্রতি জেলায় একাধিক মিনি পাকিস্তান গড়ে উঠবে। সেই সব এলাকায় প্রতি ১৫ আগস্টে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন হবে। সংরক্ষণের সুযোগে যোগ্যতা না থাকা আযোগ্য প্রার্থীরা চাকরি পাবে, ডাক্তারী, ইঞ্জিনীয়ারিং ম্যানেজমেন্ট প্রভৃতি উচ্চশিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতামান নির্ণয়ের পরীক্ষায় অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীরাও সংরক্ষণের সুযোগে যোগ্য প্রার্থীদের বঞ্চিত করে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবে। তৈরি হবে নিম্নমানের কিছু ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, ব্যবস্থাপক, পরিচালক। ফলে দুর্নীতি ও কালো টাকা রাজ্যকে গ্রাস করবে, নির্মাণ শিল্প ত্রুটিপূর্ণ হবে, স্বাস্থ্য পরিষেবা হবে নিম্নমানের।

পশ্চিমবঙ্গে অতি দ্রুত মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটছে। এর প্রধান কারণ অনুপ্রবেশ, জন্মহার বৃদ্ধি এবং ধর্মান্তরকরণ। পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ সংলগ্ন হওয়ার কারণে অনুপ্রবেশ ঘটে চলেছে অবাধে। মুসলমান যারা বাংলাদেশ থেকে এদেশে আসছে তারা দেখছে এদেশে তাদের সাহায্য করার লোকের অভাব নেই। এদেশের রাজনৈতিক দলগুলির কেউ তাদের রেশন কার্ডের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে তো অন্য কেউ ভোটার লিস্টে নাম তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে। ফলে এরা অতি সহজেই ভারতের নাগরিক বনে যাচ্ছে। স্বাধীনতার সময় পশ্চিমবঙ্গের একটি মাত্র জেলা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, সেটা মুর্শিদাবাদ। কিন্তু বর্তমানে মুর্শিদাবাদ ছাড়াও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, নদীয়া, মালদহ, উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর ইতিমধ্যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে বা অতি শিঘ্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল হতে চলেছে। কলকাতা শহরের মেটিয়াব্রুজ, গার্ডেন রিচ, খিদিরপুর, পার্কসার্কাস, তিলজলা, বেনিয়াপুকুর, রাজাবাজার, কলাবাগান প্রভৃতি এলাকায়

গেলে মনে হয় কলকাতা নয় পাকিস্তানের কোন শহরে এসেছি। এরপরেও সরকারি মদতে বিধাননগর, গড়িয়া প্রভৃতি এলাকায় মুসলমানদের জন্য আবাসন প্রকল্প তৈরি হতে চলেছে। আর মুসলমানরা যেখানে থাকবে সেখানে মসজিদ মাজার তৈরি হবেই, প্রয়োজন থাকুক আর না থাকুক। মক্কা মদিনায় কেউ চিন্তা করতে পারে একটা গির্জা, সিন্যাগগ্ মন্দির বা গুরুদ্বার? না কখনই না। হিন্দুদের তীর্থক্ষেত্র নবদ্বীপ, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন সর্বত্রই কিন্তু মসজিদ রয়েছে এক বা একাধিক। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে রয়েছে সাগরদ্বীপ। সেখানে রয়েছে কপিলমুনির আশ্রম। "সব তীর্থ বার বার, গঙ্গাসাগর একবার"। প্রতি বছর পৌষসংক্রান্তিতে সেখানে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম ঘটে, পুণ্যস্নানের উদ্দেশ্যে। কিন্তু সেই গঙ্গাসাগরও মুসলমানদের অবাধ অনুপ্রবেশ ও বসতি স্থাপনের কারণে মুসলিম কবলিত হতে চলেছে। প্রত্যেক বছরই মহরমের সময় মুসলমানরা তাজিয়া নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তার ধারের গাছ গাছালি নির্বিচারে কেটে ফেলত। ২০১০-এর ১৭ ডিসেম্বর মহরমের মিছিলের সময় রাস্তার ধারের গাছের ডালপালা কাটার সময় কিছু গাছের শিকড়ও কেটে দেয়। এবার মুসলমানরা বাংলাবাজারের কয়েকটি দোকানে লুঠপাট করে। হিন্দুরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে এর প্রতিরোধে এগিয়ে এলে মুসলমানরা পালাতে বাধ্য হয়। তবে মনে হয় খুব শিঘ্রই মুসলমানরা অঞ্চলটিতে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করবে। তখন হিন্দুরাই পালাতে বাধ্য হবে।

মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদীঘি থানার ঠাকুরপাড়া একরক্ষী গ্রাম হিন্দুশূন্য। ওই গ্রামে মাত্র ৪০ ঘর আদিবাসী বাস করত। ২০০৯-এর আগস্ট মাসে কয়েকজন মুসলিম দুটি আদিবাসী মেয়েকে ধর্ষণ করে। গ্রামবাসীরা দুজন দুষ্কৃতীকে ধরে ফেলে এবং গণপিটুনি দেয়। তাতে মতি শেখ নামে এক ধর্ষণকারীর মৃত্যু হয়। এরপর শুরু হয় ওই গ্রামে পুলিশী অত্যাচার। পুলিশী অত্যাচারের কারণে আদিবাসীরা গ্রাম ছাড়া। ফলে গ্রামটি সম্পূর্ণভাবে হিন্দুশূন্য হয়ে গেছে। অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে ব্যারাকপুরের বিধানপল্লীতে। বিধানপল্লীতো বটেই ব্যারাকপুর পৌরসভার ৩নং ওয়ার্ড ১০০ শতাংশ হিন্দু অধ্যুষিত। কোন মুসলমান সেখানে বসবাস করে না, তবে সম্ভবত দেশভাগের আগে মুসলমানরা সেখানে বাস করত কারণ সেখানে বহু পুরনো ভাঙ্গাচোরা একটি ইটের কাঠামো রয়েছে 'ভাঙা মসজিদ' নামে। বিগত ৬৩ বছরে কোনদিন সেখানে নামাজ পাঠ হয় নি। গত ৬০ বছর ধরে সেখানে নবারুন বিদ্যামন্দির নামে একটি সরকারি প্রাথমিক স্কুল চলছিল। তবে ছাত্রাভাবে ২০০৭ সালে স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়। এলাকার বয়স্ক ব্যক্তিদের অনেকেই ওই স্কুলে ছোটবেলায় পড়াশোনা করেছেন। ভগ্নস্তুপের অন্য পাশের ২৫ গজের মধ্যে রয়েছে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। ২০০৯ লোকসভা নির্বাচনের আগে ওই অঞ্চলের তৎকালীন সাংসদ তড়িৎবরণ তোপদার কিছু বহিরাগত মুসলমান সঙ্গে নিয়ে এসে মসজিদে তাদের নামাজ পড়া এবং আসা যওয়ার ব্যবস্থা করলেন। স্থানীয়রা সবাই বুঝতে পারল মসজিদ তৈরি হলে ওই এলাকায় সব পুজো বন্ধ হয়ে যাবে, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ উঠে যাবে, গরুর মাংসের দোকান গজিয়ে উঠবে, মসজিদের সামনের রাস্তা দিয়ে হিন্দু মেয়েরা নিরাপদে যাতায়াত করতে পারবে না। ফলে ধীরে ধীরে হিন্দুরা অন্যত্র উঠে যাবে এবং এলাকাটি একটি মিনি পাকিস্তানে পরিণত হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে তড়িৎবরণ তোপদার নিজেই একজন উদ্বাস্তু। পূর্ব পাকিস্তানের ময়মনসিং জেলার নেত্রকোণা থেকে পালিয়ে এসেছিলেন মুসলমানদের অত্যচারের ভয়ে। এখন আবার হিন্দু এলাকায় মুসলমানদের এনে বসতি

স্থাপনের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন যাতে এখান থেকেও হিন্দুদের পালাতে হয়।

তিনটি ঘটনা উল্লেখিত হল। এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা সারা পশ্চিমবঙ্গে ঘটে চলেছে। সম্পূর্ণভাবে হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে হিন্দু রাজনৈতিক নেতারা বহিরাগত মুসলমানদের এনে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন আর পরবর্তীকালে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং দুষ্কর্মের কারণে হিন্দুরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে আর সুযোগসুবিধেমত সেখানকার বাস উঠিয়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক নেতাদের দায়ী করা উচিত নয়। শহরাঞ্চলে হিন্দু এলাকায় হিন্দুরা বেশী ভাড়া, বেশী দামের লোভে মুসলমানদের বাড়ী ভাড়া দিচ্ছে, জমি বা বাড়ী বিক্রি করছে। মুসলমানরা হিন্দুপাড়ায় মাংসের দোকান দিচ্ছে, মোটর সাইকেল মেরামতির দোকান খুলছে, দর্জির দোকান চালাচ্ছে। হিন্দুরাই ওদের প্রধান ক্রেতা বা খরিদ্দার। তারা যে বিষবৃক্ষের চারা রোপন করল সেই চারা বিশাল মহিরুহে পরিণত হয়ে যে বিষবাষ্প ছড়াবে আর সেই বিষবাষ্পের হাত থেকে রেহাই পেতে তাদেরই অর্থাৎ হিন্দুদেরই বসতবাড়ী ছাড়তে হবে সেটা মাথায় থাকছে না। যখন ঢুকছে তখন হাত কামড়ানো ছাড়া আর কিছু করার থাকছে না। অর্থাৎ হিন্দুদের নির্বুদ্ধিতাই হিন্দুদের দুর্গতির মূল কারণ। হিন্দুরা এটা কবে বুঝবে? হয়ত কোনদিনই না। তাই পশ্চিমবঙ্গ সম্পূর্ণভাবে মুসলমানরা দখল করে নেবে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানরা ৩০ শতাংশ। এটা ১০ বছরে ৪০ শতাংশ হয়ে যাবে বলা যেতেই পারে। তখন পশ্চিমবঙ্গের শাসন ক্ষমতা দখল করবে মুসলমানরাই সে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস বা সিপিআইএম যে দলেরই হোক না কেন। মুসলিম রাজনৈতিক নেতারা তখন নিজেদের মতাদর্শ ভুলে ইসলামের জন্য জান লড়িয়ে দেবে। সকলেই চাঁদ তারা সমন্বিত সবুজ পতাকাতলে দাঁড়িয়ে ইসলামের জয়ধ্বনি দেবে। আর হিন্দুরা বলির পাঁঠার মত থরথর করে কাঁপবে।

দেশভাগের পর সারা ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৩.৫ কোটি আর বর্তমানে ২০১১ সালে আনুমানিক ১৮ কোটি। দেশে মুসলিম জনসংখ্যা যত বাড়ছে মুসলমানদের স্পর্ধাও তত বাড়ছে। তারা আরও বেপরোয়া আরও উদ্ধত, দুঃসাহসী হয়ে উঠছে। এতই এদের দুঃসাহস যে হিন্দু গৃহস্থ বাড়ীতে ঢুকে একা পেয়ে হিন্দু মেয়েকে ধর্ষণ করতেও দ্বিধা করছে না। এরা জেনে গেছে, বুঝে গেছে রাজনৈতিক দলগুলি এদের সহায়, পুলিশ প্রশাসন এদের মদতদাতা। এরা যতই দুঃসাহসী উদ্ধত হয়ে উঠছে দেশের সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলি ততই এদের তৈলমর্দন করছে। তাই দেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশের সম্পদের উপর সংখ্যালঘুদের প্রথম অধিকার। কিন্তু কেন; জবাব পাওয়া যাবে না। অতি সম্প্রতি পার্লামেন্টে একটি বিল আনার ব্যবস্থা হচ্ছে। এটির নাম প্রিভেনসন অফ কম্যুনাল এ্যান্ড টার্গেটেড ভায়োলেন্স বিল ২০১১ (Prevention of Communal and Targeted Violence Bill-2011)। এই আইনের মূল কথা হল দেশের কোথাও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগলে তার জন্য শুধু হিন্দুদেরই দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দেওয়া হবে কারণ হিন্দুরা এদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই আইন অনুসারে ধরেই নেওয়া হয়েছে যে কোন সংখ্যালঘু গোষ্ঠী অর্থাৎ মুসলমান বা খৃষ্টানরা হিন্দুদের ওপর আক্রমণ করতেই পারে না। এই প্রস্তাবিত আইনে আরও বলা হয়েছে দেশের কোথাও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধলে রাজ্য সরকারের তোয়াক্কা না করেই কেন্দ্রীয় সরকার দাঙ্গা কবলিত স্থানে কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠিয়ে দিতে পারবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে ভারতের সংবিধান অনুযায়ী আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের; কেন্দ্রীয় সরকারের নয়। রাজ্য সরকার না ডাকলে কেন্দ্র কোথাও

তার বাহিনী পাঠাতে পারে না। কোন রাজ্যে আইনের শাসন সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়লে অথবা সংবিধান পালিত না হলে রাজ্যপালের পরামর্শে কেন্দ্র সংবিধানের ৩৫৬নং ধারা প্রয়োগ করে সেই রাজ্য সরকার ভেঙ্গে দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন জারী করতে পারে, আর তারপরে কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠাতে পারে। এই নতুন আইনটি পাশ হলে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারী না করেই এবং রাজ্য সরকারের অনুমতি না নিয়েই কেন্দ্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমনের অজুহাতে রাজ্যে CRPF, CISF, Para Military Force প্রভৃতি মোতায়েন করতে পারে। এই প্রস্তাবিত আইনের ৭নং ধারায় বলা হয়েছে যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোন মহিলার ওপর যৌন অত্যাচার হলে তা হবে অপরাধ। কিন্তু সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মহিলার ওপর যৌন অত্যাচার হলে তা এই অপরাধের আওতায় পড়বে না। ৮নং ধারায় বলা হয়েছে বক্তব্য লেখা অথবা ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে সংখ্যালঘু গোষ্ঠী বা সেই গোষ্ঠীর কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রচার করলে তা হবে অপরাধ। কিন্তু হিন্দুর বিরুদ্ধে কেউ ঘৃণা প্রচার করলে তা অপরাধের তালিকায় পড়বে না। ১০নং ধারায় আছে— সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে কোন কাজে কেউ অর্থ সাহায্য করলে তা অপরাধ, কিন্তু হিন্দুর বিরুদ্ধে কেউ অর্থ সাহায্য করলে তা অপরাধ নয়। সংখ্যালঘুর উপর কোনও সরকারি কর্মচারী অত্যাচার করলে ১২নং ধারায় তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সংখ্যালঘুকে রক্ষার কাজে গাফিলতি করলে সরকারি কর্মচারী ও পুলিশ অফিসারের শাস্তি হবে ১৩ ও ১৪নং ধারায়। এই আইনের ১৫নং ধারা আরও সাংঘাতিক। সংখ্যালঘুর ওপর অত্যাচারী কোন ব্যক্তি যদি কোন সংস্থার সদস্য হয় তাহলে সেই সংস্থার যে কোন পদাধিকারী ও বরিষ্ঠ সদস্যকেও এই ১৫নং ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দেওয়া যাবে।

এই আইন পাশ হলে কাশ্মীরেও এমন কি কাশ্মীরের যে ৬টি জেলায় মুসলমানরা ৯৮ শতাংশ এবং হিন্দুরা সংখ্যালঘু, মাত্র ১ শতাংশ সেখানেও এই আইনের সংজ্ঞা অনুযায়ী ১ শতাংশ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ আর ৯৮ শতাংশ মুসলমান সংখ্যালঘু। সোনিয়া গান্ধীর বাছাই করা একটি কমিটি যার নাম জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি এই বিলের খসড়াটি তৈরি করেছেন। এই বিল বাস্তবায়িত হলে অর্থাৎ আইনে পরিণত হলে পরিনামে কি হতে পারে একটু আলোচনা করা যেতে পারে। সারা দেশে যেখানেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা হোক না কেন যেহেতু মুসলমানরা এদেশে মাত্র ২০ কোটি অর্থাৎ সংখ্যালঘু সুতরাং কোনভাবেই তাদের দায়ী করা যাবে না, গোধরা কাণ্ডের মত নৃশংস ঘটনা ঘটলেও। দায়ী করা হবে হিন্দুদেরই, মৃত বা জীবিত যাইহোক। পশ্চিমবঙ্গে কি ঘটতে পারে? কলকাতায় মেটিয়াব্রুজ, গার্ডেন রিচ, খিদিরপুর, পার্কসার্কাস, তিলজলা, বেনিয়াপুকুর, এন্টালী, রাজাবাজার, নারকেলডাঙ্গা, কলাবাগান, চিৎপুর প্রভৃতি এলাকাগুলি শুধুমাত্র মুসলিম অধ্যুষিত নয়, ঐ সব অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যা কম বেশী ৮০ শতাংশ। ওই সব এলাকায় গেলে মনে হয় কলকাতা নয় করাচী বা লাহোরে রয়েছি। ওই সব এলাকাতেই দাঙ্গা হাঙ্গামা হয় বেশী। ওই আইন Prevention of Communal and Targeted Violence Bill 2011 কার্যে পরিণত হলে ওই সব অঞ্চলে দাঙ্গা হাঙ্গামা হলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। ধরপাকড় করা হবে হিন্দুদেরই। যে অঞ্চলে মুসলমান বসবাসকারীর সংখ্যা ৮০ শতাংশ সেখান হিন্দুরা মুর্খের মত, গণ্ডগোল শুরু করবে না নিশ্চয়ই। তা না করুক পুলিশ এসে হিন্দুদেরই ধরবে। এরপর শান্তিপুর, বাঁশবেড়িয়া, চন্দননগর, বা ব্যারাকপুরের মত ঘটনা ঘটলে সেগুলি অপরাধ মনে করা হবে না, কারণ ওইসব ঘটনার দুষ্কৃতীরা সকলেই

মুসলমান। প্রকাশ্যে গরু জবাই হবে এবং সর্বত্র গো-মাংস বিক্রী হতে থাকবে। সোজা কথায় সারা ভারতে বাদশাহ্ সুলতানদের আমলের 'তানাশাহি' শুরু হয়ে যাবে। হিন্দুদের অবস্থা হবে গরু ছাগলের মত। হিন্দুরা এটা কবে উপলব্ধি করবে?

পশ্চিমবঙ্গে ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠন করেছে কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস জোট। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের অগ্নিকন্যা মমতা বানার্জী। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্য অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে মুসলিম তুষ্টিকরণ বিষয়টিকেও তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি তড়িঘড়ি পশ্চিমবঙ্গের ১০ হাজার বেআইনি মাদ্রাসাকে সরকারি স্বীকৃতি দানের ব্যবস্থা করলেন। হাজার দেড়েক ছাত্রছাত্রীর বিরোধিতা সত্ত্বেও শ'দেড়েক গোঁড়া ধর্মান্ধ মুসলিম ছাত্রছাত্রীর দাবীকে সম্মান জানাতে বামফ্রন্ট আমলে গঠিত আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মাদ্রাসা কথাটি যুক্ত করার ব্যবস্থা করলেন এবং যে সমস্ত এলাকায় মুসলমানদের সংখ্যা ১০ শতাংশ বা তার বেশী সে সমস্ত অঞ্চলে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে উর্দু পঠন পাঠন এবং সরকারি ভাষার কথা ঘোষণা করলেন। পূর্বের বামফ্রন্ট সরকার চাকরীতে মুসলমানদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণের কথা ঘোষণা করেছিল। বর্তমান কংগ্রেস তৃণমূল জোট সরকার মুসলমানদের জন্য সরকারি চাকরীতে কত শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবে বা মুসলমানদের উন্নয়নের জন্য কি কি ব্যবস্থা নেবে তা এখনও পরিষ্কার নয়। তবে পূর্বোল্লিখিত যে সমস্ত ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যে গ্রহণ করেছেন তাতে ধর্মান্ধ, প্রাচীনপন্থী মওলানা মওলভী ইমাম সাহেবরা হয়তো তুষ্ট হবেন, কিন্তু মুসলিম সমাজের বিশেষ করে দরিদ্র, আধুনিক শিক্ষার আলোক বর্জিত মুসলিম সমাজের কোন উন্নতি হবে কি? আদৌ না। বলা হয়ে থাকে মুসলিম সমাজ এদেশে অনগ্রসর, অবহেলিত, দরিদ্র শিক্ষার আলোক বর্জিত এবং আরও অনেক কিছু। কিন্তু মুসলমান সমাজের অনুন্নয়নের প্রকৃত কারণ নির্ধারণ না করেই তাদের জন্য নানা প্রকল্প গ্রহণ করলে দরিদ্র অনুন্নত নিরক্ষর মুসলিম সমাজের কোন উন্নতিই হবে না, শুধুমাত্র তেলা মাথায় তেল ঢালা ছাড়া। আসলে মুসলিম সমাজের এলিট সোসাইটিও চায় না অনুন্নত, বঞ্চিত দরিদ্র মুসলিম সমাজের প্রকৃত উন্নতি। দুরারোগ্য রোগগ্রস্ত ব্যক্তি তার শরীরের দূষিত অঙ্গটি অন্যদের দেখিয়ে যেমন অন্যের সহানুভূতি আকর্ষণ করে সাহায্য চায়, মুসলিম সমাজের এলিট সোসাইটিও তেমনই অনুন্নত দরিদ্র মুসলিম সমাজকে দেখিয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সরকার থেকে সাহায্য নেয় তারপর সরকার প্রদত্ত সেই সাহায্য নিজেরা ভোগ করে। দরিদ্র বঞ্চিত অনুন্নত মুসলিম সমাজ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থেকে যায়। কয়েকটি উদাহরণ বিষয়টি পরিষ্কার করবে।

(১) হজযাত্রা মুসলমানদের পবিত্র তীর্থযাত্রা। সরকার প্রতি বছর কয়েক শো কোটি টাকা হজযাত্রীদের জন্য ব্যয় করে থাকেন। ১৯৯১ সাল থেকে এই হজভুর্তকি চালু হয়েছে এবং গত ৫ বছরে সরকার প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা হজযাত্রীদের জন্য ব্যয় করেছেন। কিন্তু এই হজ ভর্তুকি দরিদ্র এবং অতি দরিদ্র মুসলমানদের কি কাজে লাগে? কোন কাজেই না। কারণ সরকারি ভুর্তকি থাকলেও প্রতি হজযাত্রীকে যাত্রার পূর্বেই এককালীন ১৬ হাজার টাকা বিমানভাড়া বাবদ জমা দিতে হয়। দরিদ্র এবং অতি দরিদ্র মুসলমানদের কতজনের পক্ষে সম্ভব এককালীন ১৬ হাজার টাকা জমা দেওয়া? একজনের পক্ষেও নয়। ফলে হজযাত্রার ভর্তুকি পুরোটাই উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত মুসলমানদের 'ভোগে' লেগে

যায়। দরিদ্র এবং অতিদরিদ্র মুসলিম সমাজ এতে এতটুকু উপকৃত হয় না। আরও আছে। কলকাতাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যয়ে এবং পরিচালনায় দুটি হজ হাউস আছে। একটি পার্কসার্কাসে অপরটি ভিআইপি রোডের ওপর কৈখালিতে। লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হজযাত্রীরা হজ যাওয়ার আগে এবং হজ থেকে ফিরে এখানে থাকেন ২-১ দিনের জন্য। লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হজযাত্রীরা ২-১ দিন হোটেলে থাকতে পারবেন না কেন? এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে না।

(২) মুসলিম ইউনিভার্সিটি : সংবাদে প্রকাশ পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির ধাঁচে একটি মুসলিম ইউনিভার্সিটি তৈরি হবে। কিন্তু কেন? কারণ মুসলমানরা অনগ্রসর এবং শিক্ষার আলোক বর্জিত তাই তাদের শিক্ষা এবং উন্নয়নের জন্য। ভাল কথা, কিন্তু যাদবপুর বা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাঁচে নয় কেন? সেখানে কি ঠিকমত শিক্ষাদান হয় না? আমরা জানি আলিগড়ের খ্যাতি রয়েছে মজবুত তালা এবং জেহাদী তৈরির জন্য। মুর্শিদাবাদের মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে মজবুত তালা তৈরি হবে কি না জানা নেই তবে উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জেহাদী তৈরি হতে থাকবে নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু তথাকথিত অবহেলিত, অনগ্রসর, শিক্ষার আলোক বর্জিত, দরিদ্র মুসলমানরা কিভাবে উপকৃত হবে? কিছুমাত্র না। সেখানে শিক্ষালাভ করবে উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা যারা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষালাভের সুযোগ পায় নি তারা। দরিদ্র, অনুন্নত, অনগ্রসর মুসলিম সম্প্রদায় যে তিমিরে রয়েছে সেই তিমিরেই থেকে যাবে; তা হোক তবে মওলানা, মওলভী, ইমাম সাহেবদের তো খুশী করা যাবে।

(৩) সংরক্ষণ ঃ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা হচ্ছে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার উভয়েরই পক্ষ থেকে। চাকরী এবং উচ্চশিক্ষাতে। সেনাবাহিনী, পুলিশসহ বিভিন্ন সরকারি চাকরীতে ১০ শতাংশ, কোন কোন ক্ষেত্রে আরও বেশী, মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। কিন্তু এতে দরিদ্র এবং মাদ্রাসায় কিছুটা লেখাপড়া করা মুসলমানদের কি উপকারে লাগবে? কোন উপকারেই লাগবে না। এতে লাভবান হবে উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজের তরুণ সম্প্রদায়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যারা সফল হতে পারে নি সংরক্ষণের সুযোগে তারা সরকারি চাকরীতে সুযোগ পাবে। ডাক্তারী, ইঞ্জিনীয়ারিং, ম্যানেজমেন্ট প্রভৃতি উচ্চশিক্ষার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যারা ব্যর্থ হয়েছে তারা সংরক্ষণের সুযোগে ওই সমস্ত উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সংস্থাতে ভর্তি হতে পারবে। হ্যাঁ কৃতী প্রতিযোগীদের বঞ্চিত করেই। ফলে নিম্নমানের ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি তৈরি হবে।

বেশ কয়েক বছর আগে কেন্দ্রীয় সরকার মুসলমানদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সাচার কমিটি এবং পরে রঙ্গনাথন মিশ্র কমিশন গঠন করে। ওই কমিটি এবং কমিশন মুসলমানদের উন্নয়নের জন্য অনেক কিছু সুপারিশ করেছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে সাচার কমিটির সুপারিশগুলি তদানিন্তন বামফ্রন্ট সরকারের গ্রহণযোগ্য না হওয়াতে তা বাস্তবায়িত করা যায় নি। উপরন্তু সাচার কমিটির রিপোর্ট-এর কঠোর সমালোচনা করেছিল বামফ্রন্ট সরকার। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে নতুন প্রকল্প তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি জানিয়েছেন সাচার কমিটির প্রধান আর সাচারকে কলকাতায় আসার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তিনি এলে তার সঙ্গে বসে মুসলিমদের নানাবিধ সমস্যা এবং কিভাবে সেই সব সমস্যার সমাধান করে তাদের

উন্নত জীবনযাপনে সরকারের তরফে সাহায্য করা যায় তা আলোচনা করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী চান যে সব ক্ষেত্রে মুসলমানরা এখনও পিছিয়ে আছে, সেখানে সরকারের তরফে নতুন কল্যাণকর পরিকল্পনা গ্রহণ করা, যাতে তারা আর পিছিয়ে না থাকে। অনুন্নত, দরিদ্র, শিক্ষার আলোক বর্জিত, বঞ্চিত মুসলিম সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন মুসলিম সমাজকে ধর্মান্ধ, প্রাচীনপন্থী, গোঁড়া, মাওলানা, মওলভীদের কবজা থেকে বের করে এনে তাদের অবৈজ্ঞানিক, ধর্মীয়, কুসংস্কার থেকে মুক্ত করা। একসাথে চার বিবি রাখার ধর্মীয় অধিকার এবং অনিয়ন্ত্রিত সন্তান উৎপাদনের ধর্মীয় অধিকার অবশ্যই খর্ব করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষা নয়, আধুনিক শিক্ষায় তাদের শিক্ষিত করতে হবে। উচ্চ মেধাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পোলিও টিকাকরণ এবং বন্ধ্যাত্বকরণে তাদের অনীহা দমনে অবশ্যই কঠোর হতে হবে; যদি প্রয়োজন হয়। শুধুমাত্র ভুর্তকি দিয়ে, চাকরী এবং উচ্চশিক্ষায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে, বা সহজে ব্যাঙ্কঋণের ব্যবস্থা করলে তেলা মাথায় তেল ঢালাই হবে। ইমাম সাহেবরাও হয়ত খুশী হবেন, কিন্তু দরিদ্র, অনুন্নত মুসলিম সমাজের বিন্দুমাত্র উন্নতি হবে না। একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। মুসলিম সমাজে চারবিবি বৈধ। সে কারণে একটি দরিদ্র মুসলিম পরিবারে ২ বা ৩ বিবি অস্বাভাবিক কিছু নয়। দশ বারোটি সন্তান সাধারণ ব্যাপার। মোটামুটি আয়সম্পন্ন একজন হিন্দু যখন এক স্ত্রী এবং একটি বা দুটি সন্তান নিয়ে মোটামুটিভাবে সংসার প্রতিপালন করে, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, চিকিৎসা, খাদ্য এবং পোষাকাদির বিষয়ে স্বাবলম্বী থাকে, তখন একই আয়সম্পন্ন একজন মুসলিম তার দুই বা তিন বিবি নিয়ে এবং ১০-১২টি সন্তান নিয়ে সংসার প্রতিপালন করতে হিম্‌শিম খেয়ে যাবে, এতে আর আশ্চর্য কি? তাই দরিদ্র বা অতি দরিদ্র মুসলিম মহল্লাগুলিতে গেলে দেখা যায় রক্তাল্পতা আর অপুষ্টির শিকার শিশুগুলি মুরগীর বাচ্চার মত পিল্‌পিল্‌ করছে। গা ঘিন্‌ ঘিন্‌ করা নোংরা পরিবেশে কোলে কাঁখে বাচ্চা নিয়ে রুগ্ন, ফ্যাকাসে মুসলিম রমনীদের ছেঁড়া, শাড়ী বা তালিমারা এবং নোংরা বোরখা পড়ে গৃহস্থালি কাজকর্ম বা চলাফেরা করতে দেখা যায়। মওলানা মওলভী এবং ইমাম সাহেবরা তাদের জানিয়েছেন পরিবার পরিকল্পনা বা বন্ধ্যাত্বকরণ ইসলাম বিরোধী। পোলিও টিকাকরণও প্রকারান্তরে তাই। ছোটবেলায় পোলিও টিকা খাওয়ালে বড় হলে তাদের প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হবে। তা হলে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে কি ভাবে? তাই ইমাম সাহেবদের নির্দেশ পরিবার পরিকল্পনা তো বটেই, পোলিও টিকাকরণ কর্মসূচী থেকেও দূরে থাকো। ১৯৯০ সালের ৩০ মে কলকাতার সন্নিকটে বানতলায় রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তরের পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের অফিসার অনিতা দেওয়ান এবং রেণু ঘোষ ও উমা ঘোষকে কি নৃশংসভাবে অত্যাচার করা হয়েছিল এবং পরিণামে অনিতা দেওয়ান, এবং গাড়ীর ড্রাইভার অবনী নাইয়ার-এর মৃত্যু ঘটেছিল আমরা নিশ্চয়ই তা বিস্মৃত হই নি। কি অপরাধ করেছিলেন স্বাস্থ্যদপ্তরের কর্মীরা? গুরুতর অপরাধ করেছিলেন। তাঁরা গিয়েছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামে সেখানকার মুসলিম রমণীদের পরিবার পরিকল্পনার উপকারিতা বোঝাতে। মহিলারা বুঝলেও এবং এতে উৎসাহিত হলেও মিঞা সাহেবরা ক্রুদ্ধ হলেন। কিন্তু বিবিদের বার বার বুঝিয়েও বাগে আনতে ব্যর্থ হচ্ছিলেন। অতএব শেষ অস্ত্র হিসাবে স্বাস্থ্য বিভাগের ওই কর্মীদের শেষ করে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হল। কি ঘটেছিল সেদিন? সেদিন ছিল হাটবার। বিকেল বেলা হাট যখন জমজমাট সে সময় স্বাস্থ্যদপ্তরের ওইসব কর্মীরা দপ্তরের

কাজ সেড়ে গাড়ীতে করে ফিরছিলেন। হাটের কাছাকাছি আসতেই পূর্ব পরিকল্পনামত 'ছেলে ধরা, ছেলে ধরা' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে গাড়ীটিকে তাড়া করে কিছু লোক। তাড়াতাড়ি পালাতে গেলে গাড়ীটি উল্টে যায়। তখন উন্মত্ত জনতা গাড়ীটিকে ঘিরে ধরে। তিন মহিলাকে গাড়ী থেকে টেনে বের করে। তারপর তাদের সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে চলে অমানুষিক অত্যাচার। স্বাস্থ্য দপ্তরের গাড়ী দেখেও তাদের বিন্দুমাত্র হুঁস হয়নি। বাধা দিতে এলে গাড়ীর ড্রাইভার অবনী নাইয়ারকেও হত্যা করা হয়। অমানুষিক অত্যাচারের পর সংজ্ঞাহীন ওই তিন মহিলার নগ্ন নিথর দেহ রাস্তায় ফেলে রাখা হয়। কাছেই পুলিশ ফাঁড়ি থাকা সত্ত্বেও পুলিশ এসেছিল সব কিছু ঘটে যাওয়ার ঘণ্টা খানেক পরে। উমা ঘোষ এবং রেণু ঘোষ দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর সুস্থ হন। অনিতা দেওয়ান এবং ড্রাইভার অবনী নাইয়ারের মৃত্যু হয়। আক্রান্ত মহিলাদের যখন হাসপাতালে আনা হয়েছিল তখন তারা ছিলেন সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। মহিলাদের সারা দেহ থেকে রক্ত ঝরছিল এবং বক্ষদেশ ছিল ক্ষতবিক্ষত। সবকিছু শুনে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু মহাশয় বলেছিলেন "এ রকম তো কতোই হয়"। এখন প্রশ্ন এত বড়ো একটা কাণ্ড কেন ঘটানো হয়েছিল? কারণ মুসলমান মহিলাদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা বিস্তার ঘটানোর চেষ্টা হচ্ছিল তাই। জন্ম নিয়ন্ত্রণ ইসলাম বিরোধী। কিন্তু দরিদ্র এবং অতি দরিদ্র মুসলমানদের যদি জন্মনিয়ন্ত্রণে বাধ্য না করা হয় তারা যদি ইচ্ছা মতো সন্তানের জন্ম দিতে থাকে তাহলে তাদের দুঃখদুর্দশা দূর করা স্বয়ং আল্লাহতালার পক্ষেও সম্ভব নয়। পোলিও টিকাকরণের বিষয়েও একই বক্তব্য। মুসলিম সমাজের বিশ্বাস সন্তানদের পোলিও টিকা খাওয়ালে তারা বড় হয়ে প্রজনন ক্ষমতাহীন হয়ে যাবে। তাদের মওলানা মওলভীরাই এটা তাদের বুঝিয়েছে। অতএব পোলিও টিকাকরণ বর্জন করলো মুসলিম সমাজ। এতে ভারত থেকে সম্পূর্ণভাবে পোলিও রোগ দূর করা সম্ভব হবে কি? সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের নতুন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে নতুন প্রকল্প গড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। বিভিন্ন জেলায় মুসলমানদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ও তাদের মধ্যে শিক্ষা প্রসার ঘটাতে নতুন নতুন প্রকল্প তৈরি করার জন্য সংখ্যালঘু দপ্তরকে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি চান চাকরী-বাকরীর সুযোগ সুবিধে থেকে তারা যেন বঞ্চিত না হয়। মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যালঘু দপ্তর অবশ্যই নিজের হাতেই রেখেছেন। সংখ্যালঘু দপ্তরের সচিব এস এন হকের সঙ্গে মুসলিম সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নতুন নতুন প্রকল্প কী কী নেওয়া যায় তা নিয়ে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি চান যে সব ক্ষেত্রে মুসলমানরা এখনো পিছিয়ে আছে, সেখানে সরকারের পক্ষ থেকে নতুন কল্যাণকর পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাতে তারা পিছিয়ে না থাকে। সংখ্যালঘু দপ্তর এব্যাপারে মুসলিম অধ্যুষিত জেলাগুলিতে একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখবে কোন দিক থেকে মুসলমানরা পিছিয়ে রয়েছে। শিক্ষার অগ্রগতি, সরকারি অফিসে চাকরির সুযোগ-সুবিধে, জীবনধারণ প্রণালীর উন্নতি— সবই এই সমীক্ষায় দেখা হবে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গের ১২টি মুসলিম অধ্যুষিত জেলায় মাল্টিসেকটরাল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প যেটি চালু হয়েছিল, ২০১২ সালের মার্চে শেষ হওয়ার কথা। এই প্রকল্পের কাজের সময়সীমা আরও বৃদ্ধি করা হবে কিনা এখনও জানা যায় নি। এই প্রকল্পের ৬৮৬ কোটি টাকার মোটা অংশই ইতিমধ্যে খরচ হয়ে গেছে। এই টাকা মুসলিম অধ্যুষিত ১২টি জেলার মুসলমানদের নানা ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য ব্যয় করা

হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী চান মুসলমানরা যাতে শিক্ষার দিক থেকে এগিয়ে যেতে পারে তার জন্য নতুন সরকার সবরকমভাবে সহায়তা করবে। সম্ভবত সেই কারণেই রাজ্য সরকার ১০ হাজার মাদ্রাসাকে অনুমোদন বা স্বীকৃতি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। মাদ্রাসাগুলিতে কি ধরনের শিক্ষাদান হয় আর তাতে মুসলিম সমাজ আদৌ উপকৃত হবে কি না সেটা অবশ্য হিসেবের বাইরে থাকছে। ধরে নেওয়া হয়েছে ওই ১২টি মুসলিম অধ্যুষিত জেলায় অমুসলমান অর্থাৎ হিন্দুরা সবাই উন্নতমানের জীবন যাত্রা নির্বাহ করে। সুতরাং তাদের জন্য সরকারের কোন মাথাব্যথা নেই। সরকারের যত দায়দায়িত্ব মাথাব্যথা রাজ্যের সংখ্যালঘু তথা মুসলমানদের জন্য। তাই মুসলমানদের উন্নয়নের জন্য তিনি জান লড়িয়ে দিচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা বর্তমানে আনুমানিক ৯ কোটি। এর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ২.৫ কোটি বা তার কিছু বেশী। তাহলে বাকী ৬.৫ কোটি পশ্চিমবঙ্গবাসী সকলেই উন্নতমানের জীবনযাত্রা নির্বাহ করে? সকলেরই জীবিকা রয়েছে? আশ্রয় রয়েছে? সন্তানদের মুখে দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোগাতে সক্ষম হচ্ছে? অবশ্যই না। মমতা ব্যানার্জী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। তাই পশ্চিমবঙ্গবাসী, বিশেষ করে দারিদ্রসীমার নিচে বাস করা প্রতিটি পশ্চিমবঙ্গবাসীর জীবনধারণের মান উন্নয়নের দিকে তাঁর লক্ষ্য থাকা উচিৎ। দারিদ্রসীমার নিচে বাস করা প্রতিটি পশ্চিমবঙ্গবাসীর শিক্ষা, স্বাস্থ্যপরিষেবা, বাসস্থান, পানীয়জল প্রভৃতির দিকে তাঁর নজর থাকা উচিৎ। শুধুমাত্র মুসলমানদের উন্নয়ন নিয়ে চিন্তাভাবনা তাঁর সাজে না। একথা অনস্বীকার্য পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম ভোটাররা সঙ্ঘবদ্ধভাবে বামফ্রন্ট থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করেছিল। পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছর ক্ষমতাসীন বামফ্রন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করার অন্যতম প্রধান কারণ এটাই। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সব কিছু বিস্মৃত হয়ে মুক্ত কচ্ছ হয়ে "বাবা সংখ্যালঘু চরণে সেবা লাগি" বলে আত্মনিয়োগ করতে হবে। মনে রাখা দরকার উত্তরবঙ্গের বন্ধ চা কারখানার বেকার শ্রমিকদের অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ বা আমলাশোলে অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ। দক্ষিণবঙ্গের আয়লা বিধ্বস্ত মানুষদের কথা ভুললেও চলবে না। আয়লা বিধ্বস্ত মানুষদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই রয়েছে। তাহলে ওই আয়লা বিধ্বস্ত মানুষদের মধ্যে বেছে বেছে মুসলমানদেরই সাহায্য করা হবে? আয়লা বিধ্বস্ত হিন্দুরা কোন সাহায্যই পাবে না? তাদের দুর্গতি কোন দুর্গতি নয়?

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুর সংখ্যা ছিল মোটামুটিভাবে ২ কোটির মতো। কিন্তু বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তান, অধুনা বাংলাদেশে হিন্দুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি কিছু বেশী। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ থেকে ১ কোটির কিছু কম হিন্দু নিজেদের সাত পুরুষের ভিটে মাটি, জমিজমা সব কিছু ফেলে রেখে বা নামমাত্র মূল্যে বিক্রী করে পালিয়ে এলেন ভারতে। আশ্রয় নিলেন পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং অসমে। পিতৃপুরুষের জমি জমা, পুকুর, সুপারী বাগান প্রভৃতি কি ভাবে মুসলমানরা দখল করে নিয়েছিল, কি নৃশংসভাবে তাদের মা, মাসী, কাকীমা, ঠাকুমা, দিদিমাদের মান সম্ভ্রম হরণ করেছিল, তাদেরই বাড়ীর আশ্রিত, অনুগৃহীত মুসলমান চাষী এবং কর্মচারীবৃন্দ বা অন্যান্য মুসলমান সম্প্রদায় তার বিস্তারিত বিবরণ সম্ভবত আর কখনই পাওয়া যাবে না যেমন পাওয়া যাবে না ৭১২ খৃষ্টাব্দে মহঃ বিন কাশিমের সিন্ধু বিজয়ের সময়, বা পরবর্তীকালে সুলতান মামুদ, মহঃ ঘোরী, তৈমুর লঙ্ প্রভৃতি ভারত আক্রমণকারীদের সময় যে অবর্ণনীয় অত্যাচার, নির্যাতন হিন্দু নরনারীদের ওপর হয়েছিল তার বিস্তারিত বিবরণ।

তবে কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা, কিছু কিছু পুস্তকে বিবৃত হয়েছে। তবে পাকিস্তানের আইন ও শ্রমমন্ত্রী দলিত নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর কাছে তার পদত্যাগ পত্রে পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের যে ঘটনাগুলি উল্লেখ করেছিলেন সেগুলির সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে না। সে সমস্ত ঘটনার কয়েকটি বিবৃত হল :

মিলিটারীর জন্য মেয়েমানুষ : সিলেট জেলার হবিগঞ্জের নিরপরাধ হিন্দুদের, বিশেষত তপশীলী জাতির হিন্দুদের ওপর পুলিশ ও মিলিটারীর সম্মিলিত বর্বর অত্যাচারের কাহিনী এখানে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। অসহায় নারীপুরুষের ওপর পাশবিক অত্যাচার চালাবার পর বেশ কিছু নারীর সতীত্ব হরণ করা হয়। তারপর তাদের ঘরদুয়ার ভেঙ্গে দিয়ে পুলিশ ও স্থানীয় মুসলমানরা তাদের সম্পত্তি লুঠ করে। এরপর এলাকায় মিলিটারী চৌকি বসান হয়। সৈন্যরা কেবল হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করে এবং তাদের ঘরবাড়ী থেকে খাদ্য জোর করে কেড়ে নিয়ে গিয়েই ক্ষান্ত থাকল না, রাতের বেলায় তাদের লালসা চরিতার্থ করার জন্য হিন্দুবাড়ীর মেয়েদেরকে মিলিটারী ক্যাম্পে পাঠাতে বাধ্য করল। এই ঘটনাটিও আমি আপনার দৃষ্টিগোচর করেছি। এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন চাইবেন এ আশ্বাস আপনি আমাকে দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এর ওপর কোন প্রতিবেদনই তৈরি হল না।

বিচিত্র তথ্য— প্রায় ১০,০০০ মৃত : ঢাকায় নয়দিন অবস্থান কালে আমি ঢাকা ও তার সন্নিহিত এলাকার প্রায় সব দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করি। ঢাকা— নারায়নগঞ্জ ও ঢাকা, চট্টগ্রাম রেলপথে শত শত নিরপরাধ হিন্দু হত্যালীলার সংবাদ আমাকে যৎপরোনাস্তি ব্যথিত করল। ঢাকা দাঙ্গার দ্বিতীয় দিনে আমি পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। জেলা শহরগুলিতে, মফঃস্বলে এবং গ্রামাঞ্চলে যাতে দাঙ্গা হাঙ্গামা ছড়িয়ে না পড়তে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখে জেলা কর্তৃপক্ষগুলোর কাছে তৎক্ষণাৎ জরুরী নির্দেশ পাঠাতে অনুরোধ জানালাম তাঁকে। ইং ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫০ আমি বরিশাল পৌঁছালাম এবং সেখানকার দাঙ্গার ঘটনাবলী জেনে স্তম্ভিত হলাম। সেই জেলা শহরে প্রচুর হিন্দুবাড়ী জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং অনেক হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছে। এই জেলার প্রায় প্রত্যেকটি দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকা আমি পরিদর্শন করি। আমি সত্যিই বুঝতে পারি না কি করে শহর থেকে মাত্র ৬ মাইল পরিধির মধ্যে মোটর রাস্তা দ্বারা যুক্ত কাশীপুর, মাধবপাশা এবং লাকুটিয়ার মত স্থানেও মুসলিম দাঙ্গাবাজরা বীভৎস তাণ্ডব সৃষ্টি করতে পারে। মাধব পাশার জমিদার বাড়ীতে প্রায় ২০০ জনকে হত্যা ও ৪০ জনকে আহত করা হয়। মুলাদি নামক একটি স্থানে নরকের বিভীষিকা নামিয়ে আনা হয়। স্থানীয় মুসলমান এবং অফিসারদের বক্তব্য অনুযায়ী একমাত্র মুলাদি বন্দরেই ৩০০ জনের বেশী লোককে হত্যা করা হয়। মুলাদি গ্রাম পরিদর্শনকালে আমি স্থানে স্থানে মৃত ব্যক্তিদের পড়ে থাকতে দেখেছি। দেখলাম নদীর ধারে ধারে কুকুর শকুনেরা মৃতদেহ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। আমি জানতে পারলাম সব প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে পাইকারীভাবে হত্যা করার পর সব যুবতী নারীকে দুষ্কৃতকারীগণের সর্দারদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। রাজাপুর থানার অন্তর্গত কৈবর্তখালি গ্রামে ৬৩ জনকে হত্যা করা হয়। ওই থানা অফিসের অনতিদূরে অবস্থিত হিন্দুর বাড়ীগুলি লুঠ করে জ্বালিয়ে দিয়ে গৃহবাসীগণকে হত্যা করা হয়। বাবুগঞ্জ বাজারের সমস্ত হিন্দুর দোকান প্রথমে লুঠ করে পরে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। বিস্তৃত বিবরণ যা হাতে এসেছে তা থেকে খুব কম করে ধরলেও একমাত্র বরিশাল জেলাতেই হত্যা করা হয়েছে

২৫০০ জনকে। ঢাকা তথা পুর্ববঙ্গের বলির সংখ্যা মোট ১০ হাজারের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল। এক সত্যিকারের গভীর দুঃখে আমি কাতর হয়ে পড়লাম। প্রিয়-পরিজন স্বজন হারানো নারী-পুরুষ ও শিশুদের সব হারানোর কান্না-বেদনা-বিলাপপত্র আমার ভগ্ন হৃদয় হাহাকার করে উঠল। আমি নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম "পাকিস্তানে ইসলামের নামে এ সব কি চলছে!"

কিছু ঘটনা : প্রথম যে ঘটনা আমাকে মর্মাহত করল তা ঘটেছিল গোপালগঞ্জের নিকটবর্তী দিঘরকুল গ্রামে। জনৈক মুসলমানের মিথ্যা অভিযোগে কান দিয়ে স্থানীয় নমঃশুদ্রদের ওপর পৈশাচিক অত্যাচার সংঘটিত করা হল। সত্য ঘটনা এইরূপ— নদীর বুকে নৌকো বেয়ে যেতে যেতে এক মুসলমান, জনৈক নমঃশুদ্র যেখানে মাছ ধরছিল সেখানে তার সামনেই জাল ফেলতে উদ্যত হল। নমঃশুদ্র তাতে বাধা দিল। ফলে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট কথা কাটাকাটি হল। নিজের জেদ বজায় রাখতে না পেরে মুসলমানটি নিকটবর্তী মুসলমান গ্রামে গিয়ে রটনা করল যে, সে এবং তার নৌকোর আরোহী এক মহিলাকে নমঃশুদ্ররা আক্রমণ করেছে। সেই সময় গোপালগঞ্জের এস.ডি.ও. সাহেব নৌকাযোগে ঐখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। কোনরূপ তদন্ত ছাড়াই মিথ্যা অভিযোগকে তিনি সত্য ঘটনা বলে গ্রহণ করলেন এবং নমঃশুদ্রদের শায়েস্তা করার জন্য সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী প্রেরণ করলেন। সশস্ত্র পুলিশবাহিনী এলে স্থানীয় মুসলমানরাও তাদের সঙ্গে যুক্ত হল। তারা কেবল নমঃশুদ্রদের বাড়ীঘরের ওপর চড়াও হয়ে ক্ষান্ত হল না, নির্মমভাবে প্রহার করল নারী ও পুরুষদের। তাদের সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করল এবং মূল্যবান দ্রব্যাদি লুঠ করল। নির্মম প্রহারের ফলে ঘটনাস্থলেই এক গর্ভবতী রমণীর গর্ভপাত ঘটল। স্থানীয় প্রশাসনকৃত এই পৈশাচিক অত্যাচারে এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মানুষের মনে ত্রাস ও ভীতির সঞ্চার হল।

যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের পদত্যাগ পত্রে উল্লেখিত বহু ঘটনার মধ্যে মাত্র ২-৩টি উল্লেখ করা হল। অধিক ঘটনার বর্ণনা পাঠককূলকে ব্যথিত এবং বিষাদক্লিষ্ট করে তুলবে। তবে অন্য যে দুটি ঘটনা উল্লেখ না করা হলে ঘটনাবলীর পৈশাচিকতা নির্মমতা এবং হৃদয়হীনতা উপলব্ধি করা যাবে না সে দুটিমাত্র উদ্ধৃত হল।

ঘটনা ১ : দুলাল কর্মকার বাগেরহাটের একজন। দুলালের মেয়ে অপর্ণা। অন্য দশটি মেয়ের মতোই অবাক করা চোখে শৈশবের সব কিছু দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠেছিল সে। মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংসারে দুলাল কর্মকার মেয়েকে নিয়ে নানারকম স্বপ্নের জাল বুনেছিল। কিন্তু তার সেই স্বপ্ন কাঁচের দেয়ালের মত ভেঙ্গে দেয় অষ্টম সংসদ নির্বাচন। ভোলার চরফ্যাশন থানার চর তোফাজ্জল গ্রামে ছিল দুলালের বাড়ী। ১৩ অক্টোবর রাতে অপর্ণা জাতীয়তাবাদী ফূর্তির শিকার হয়। ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায় দুলাল কর্মকারের স্বপ্ন। নিজের মেয়ের সম্ভ্রম রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় সে। দুলাল পুরোপুরিভাবে মানসিক সুস্থ আছে বলে রাহুলের মনে হয় না। কথা বলতে গিয়ে মাঝপথে দুলাল থেমে যায়। চুপ করে থাকে। তার স্ত্রী রাহুলকে আর কিছু জিজ্ঞেস না করার জন্য অনুরোধ করলে সে আর কিছু জিজ্ঞেস করে না। একটা সিগারেট এগিয়ে দেয় দুলালের দিকে। নিজেও একটা ধরায়। সিগারেটে দ্বিতীয় টান দিতে গিয়ে দুলাল ডুকরে কেঁদে ওঠে। এই সিগারেটের আগুন অর্পণার গোপন অঙ্গে চেপে ধরেছিল ওরা। বলেই সিগারেট ছুড়ে ফেলে দেয়। রাহুল জিজ্ঞেস করে অপর্ণা এখন কোথায়? ওখানে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করে দেখিয়ে

দেয় দুলাল। রাহুল (প্রশ্ন করে) ১৩ তারিখেই কি সে মারা গিয়েছিল?

না, ওর ওপর নির্যাতনের পর মেয়ে আমার অসুস্থ হয়ে পড়ে। চরফ্যাশন হাসপাতালে ভর্তিও করেছিলাম। কিন্তু ডাক্তার বলেছিল ঢাকায় নিয়ে যেতে। তার ব্যবস্থা করে ওকে চরফ্যাশন থেকে বাড়ী নিয়ে আসি। একদিন পরে ওকে নিয়ে ঢাকায় যাবার কথা।

ঢাকায় নেবার পরেই কি মারা গেল? রাহুল প্রশ্ন করে।

না। তা আর নিতে হয় নি। ঢাকায় নেবার আগের রাতেই সে আমাদের ছেড়ে চলে যায়।

অপর্ণা বাড়ীর উঠানে ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়ে বসে ছিল। গ্রামের মসজিদের ইমাম এক তালবেলামকে নিয়ে দুলালের বাড়ীর পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার পথ অতিক্রম করেছিল। অপর্ণার দিকে চোখ পড়তেই "নষ্ট মেয়েমানুষ" বলে মাথার ছাতাটি নামিয়ে অপর্ণাকে আড়াল করে। ইমাম অপর্ণার মুখ দেখলে তার অজু চলে যাবে, পাপ হবে। অথচ ধর্ষনকারীদের মধ্যে ইমামের বড় ছেলে আবু বকরও ছিল। ওদের পাশবিক নির্যাতন, সিগারেটের আগুনের ছেঁকা পনেরো বছরের অপর্ণার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব ছিল না। সে জ্ঞান হারিয়েছিল। কিন্তু ইমামের 'নষ্ট মেয়েমানুষ' সম্বোধন তার চেয়েও বেশী কষ্টের মনে হল অপর্ণার কাছে। সে যে লাঠিতে ভর করে অসুস্থ শরীর টেনে বেড়াচ্ছিল তারই ওপর ভর করে ঘরে ফিরে গেল। মা স্নান করতে পুকুর ঘাটে গিয়েছিল। বাবা ব্যস্ত আগামী কালের ঢাকা যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে। পুরো বাড়ীতে তখন কেউ নেই। দরজায় খিল এটে সে একটা দড়ি গলায় বেঁধে ঝুলে পড়ল। আর কোনদিন তাকে "নষ্ট মেয়েমানুষ" কথাটি শুনতে হবে না।

সেদিন রাতেই অপর্ণার সৎকার করা হয়। দাউ দাউ করে আগুন যখন অপর্ণার শরীর পুড়ে নিচ্ছিল এ সময় পুলিশ উপস্থিত। মেয়ের ময়না তদন্ত না করানোর জন্য দুলালকে মেয়ের খুনী সম্বোধন করে থানায় বেঁধে নিয়ে যায়। দুলাল পেছন ফিরে মেয়ের চিতা দেখে আর চোখ মোছে। তিনদিন তাকে থানায় আটকে রাখা হয়। কোর্টে না পাঠিয়ে থানায় আটকে রেখে দুলালের সঙ্গে কথা বলে 'দেন দরবার' করে থানার পুলিশ, ইমামপুত্র আবুবকর। দুলালের স্ত্রী মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে যা কিছু সঞ্চয় করে রেখেছিল তার পুরোটা নিয়ে থানায় গেলে তা গ্রহণ করে আবুবকর একটা স্ট্যাম্প এগিয়ে দেয় দুলালের দিকে। তাতে সই করে দুলাল কর্মকার থানা থেকে বেরিয়ে আসে। থানা থেকে বের হওয়ার আগে আবুবকর জানিয়ে দেন স্ট্যাম্পে সই করার পর দুলাল কর্মকারের বাড়ী, জমি, বাজারের দোকান সব কিছুরই মালিক আবুবকর নিজে। দুলাল যেন আর বাড়ীর দিকে না যায়। শেষ পর্যন্ত দুলালের আশ্রয় জুটেছিল বালিগঞ্জ-মাঝের হাট রেললাইনের পাশে। (এথনিক ক্লিনসিং সালাম আজাদ)

ঘটনা ২ : লক্ষীবাজারের নির্দিষ্ট বাড়ীটি খুঁজে পেতে খুব একটা বেগ পেতে হলো না রাহুলের। দোতলা পুরনো বাড়ীটি সুনসান। গেটের কাছে এসে সে কি করবে, কি করা উচিৎ ভেবে স্থির করতে পারছে না। গেট্ খোলা, কিন্তু গেটের ভেতরে কোন লোকজন নেই। একটা বিড়াল নিঃশব্দে তার পায়ের কাছ দিয়ে বেরিয়ে গেল। রাহুল একটু নড়ে চড়ে দাঁড়িয়ে একটা কাশি দিল, কাশি অবশ্য শব্দ করেই দিল। দোতালার ব্যালকনীতে এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন। সেটা কি রাহুলের কাশির শব্দ পেয়ে নাকি এমনি তা অবশ্য রাহুল জানে না। যেভাবেই তিনি এসে থাকুন না কেন, সেটা ভাবার বিষয় নয়। তিনি যে

এসেছেন রাহুলের জন্য এই মুহূর্তে তা পরম পাওয়া। ভদ্রলোক বারান্দায় এসেই একটি সিগারেট ধরালেন। এজন্যই যে তিনি বারান্দায় এসেছেন তা রাহুলের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। একটু ভেবে নিয়ে ওপরে চোখ তুলে রাহুল জানতে চাইলেন সে কি ভেতরে আসতে পারে। ভদ্রলোক জানতে চাইলে কার কাছে যাবেন। ঠিক কারো কাছে নয় আবার কারো কাছেও। আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

গেটে কোন লোক নেই আপনি একটু নিচে আসবেন?

ঠিক আছে অপেক্ষা করুন।

রাহুলের খুব একটা অপেক্ষা করতে হল না। ভদ্রলোক গেটের কাছে নেমে এলেন। রাহুল নিজের একটা কার্ড বাড়িয়ে দিয়ে বললো আপনার কাছেই জানতে চাইছি, কিছু মনে করবেন না। এ বাড়ীতে কি কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে?

ভদ্রলোক কোন উত্তর না দিয়ে রাহুলকে ভেতরে নিয়ে গেলেন, বসার ঘরে বসিয়ে বললেন, আপনি যে ভিক্টিমের খোঁজে এসেছেন সে তো এখন হাসপাতালে।

ঘটনাটি ঠিক কি ঘটেছিল আপনার পক্ষে বলা কি সম্ভব?

কেন সম্ভব নয়। তবে আমরা চাই না আমাদের মেয়ের ব্যাপারটি পত্র পত্রিকায় ছাপা হোক। আপনি দিল্লী থেকে এসেছেন। বিদেশী সাংবাদিক গেটে দাঁড় করিয়ে রেখে তো কথা বলতে পারি না। এর আগে যারাই এসেছেন তাদের কাছে আমরা ঘটনাটি অস্বীকার করেছি।

কেন? রাহুলের কৌতুহলী প্রশ্ন।

যা ঘটেছে, যা চলে গেছে তা তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না। পৃথিবীর সব সম্পদ এক সঙ্গে করে দিলেও আমার মেয়ের সম্ভ্রম ফিরে পাব না।

তা ঠিক। কিন্তু ঘটনাটা কি ভাবে ঘটেছিল?

দেখুন, আপনি লিখবেন না কথা দিলে সংক্ষেপে বলতে পারি। কোথাও লিখলে আমার মেয়ের ভবিষ্যত শেষ হয়ে যাবে। আর এ জন্যই আমরা অন্যান্য সাংবাদিকদের কাছে অস্বীকার করেছি।

ঠিক আছে। তবে এখানে ভবিষ্যত নষ্ট হওয়ার কিছু আছে বলে মনে হয় না।

সেটা আপনার পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব নয়।

আচ্ছা ঠিক আছে। রাহুল আর কথা বাড়ালো না।

দেখুন, এ বাড়ীতে আমার স্ত্রী, কন্যা আমি ছাড়া আর একজন কাজের মহিলা বসবাস করি। পূজা বলে মেয়েটি ছুটি নিয়ে গ্রামের বাড়ীতে গেছে। আমি প্রায় সারাদিন বাইরে থাকি। যে বাড়ীতে আপনি বসে আছেন সেটা দখল করার জন্য এর আগে অনেক বার চেষ্টা করেছে ওরা। তবে আওয়ামী লীগের পাঁচ বছর কোন উৎপাত করে নি। ভালই ছিলাম।

'আচ্ছা'। রাহুল বলল।

এবার নির্বাচনের তিনদিন পর আমি কোর্টে চলে গেছি। আমার মেয়েও আমার সঙ্গে কলেজে গেছে। ওকে কলেজে নামিয়ে দিয়ে আমি কোর্টে আসি। ফেরার সময় সে একাই বাসায় ফিরে আসে। আমার ফিরতে বেশ দেরী হয়। কখনো কখনো সন্ধ্যা হয়ে যায়। তবে আজ শরীরটা ভাল বোধ হচ্ছিল না। আমি তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরেছি। বাসার গেট সব সময় খোলা থাকে। কিন্তু আজ সদর দরজাও খোলা। ঘরে কোন শব্দ নেই। আমি কিছুটা

বিস্মিত হয়ে মেয়ের নাম ধরে ডাক দিলাম। কিন্তু কোন উত্তর নেই। রাগতস্বরে আমার স্ত্রীর নাম ধরেও ডাকলাম। কোন শব্দ নেই। এতক্ষণ আমি দোতলার সদর দরজায় দাঁড়িয়ে ওদের ডাকছিলাম। এবার ভেতরে ঢুকতেই যেখানে আপনি বসে আছেন তার থেকে একটু উত্তরে টেলিভিশনের বক্সের কাছে আমার স্ত্রী অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। হাতের ব্রিফকেসটি ছুড়ে ফেলে মাটিতে বসে ওর মাথাটি তুলে নিলাম কোলে। অনেক চেষ্টা করেও তার জ্ঞান ফেরানো গেল না। কোলে তুলে আমাদের শোবার ঘরে নিয়ে গেলাম। বিছানায় শুইয়ে দিয়ে এ্যাম্বুলেন্সের জন্য ফোন করব। কিন্তু আমাদের শোবার ঘরে ঢুকতে গিয়ে আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল। বুক ভেঙ্গে যাচ্ছিল। আমার মেয়ে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় আমাদের খাটে শুয়ে আছে। শুধু বিছানা নয়, পুরো ঘরটি তছনছ্ অবস্থা। আমি কি করব তা স্থির করতে পারছিলাম না। অজ্ঞান স্ত্রীকে, যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখানেই শুইয়ে রেখে একটা শাড়ী নিয়ে মেয়ের শরীর ঢাকতে গিয়ে দেখি বিছানা রক্তাক্ত। ওর বামদিকের নিপল্ দিয়ে রক্ত ঝড়ছে। এ দৃশ্য দেখার আগে আমার মৃত্যু হওয়া ভাল ছিল। বলেই ভদ্রলোক রাহুলের হাত চেপে ধরে বুক ভাঙ্গা কান্না কাঁদতে লাগলেন।

রাহুল কি বলে ভদ্রলোককে সান্ত্বনা দেবে তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না। মানুষের এই অবস্থায় কি বলতে হয়, কি বলা সঙ্গত রাহুল তা জানে না। দুর্বৃত্তরা কন্যার নিপল্ পর্যন্ত ছিড়ে নিয়ে গেছে সেই কন্যার পিতাকে কি বলে সান্ত্বনা দিতে হয় রাহুল তা জানে না। এ রকম ঘটনার মুখোমুখি সে এর আগে কখনও হয় নি। তবুও ভদ্রলোকের কান্না থামানোর জন্য সে জিজ্ঞেস করল আপনি মামলা করেছেন? মামলা করে কি হবে? আমার মেয়ে যা হারিয়েছে তা কি ফিরে পাবে। আর মামলা? পুলিশ, আইন, আদালত সব দুর্বৃত্তদের পক্ষে। আর মামলা করলে আমার জীবনটা চলে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। তার চেয়ে মেয়ে সুস্থ হলে এই চারপুরুষের বাড়ীটি বিক্রি করে দিয়ে চলে যাব। বিক্রি করতে পারব কিনা তাও নিশ্চিত করে জানি না। যারা আমার মেয়ের সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে তা শুধু কেড়ে নেওয়ার জন্য নেয় নি। খুব পরিকল্পিতভাবে কাজটি করেছে। তাদের টার্গেট আমার মেয়ে কিংবা স্ত্রী নয়। এমন কি আমিও নই। তাদের একমাত্র টার্গেট এ বাড়িটি।

বিক্রি করতে না পারলে কি করবেন;

ফেলে রেখে চলে যাব।

কোথায় যাবেন?

যেখানে যাব সেখানে বাড়ীর জন্য অন্তত আমার মেয়ের সর্বস্ব হারাতে হবে না। (এথনিক ক্লিনসিং : সালাম আজাদ)

এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি! পাকিস্তানে এবং বাংলাদেশে হিন্দুরা অবর্ণনীয় অত্যাচার, নির্যাতন, উৎপীড়ন, নিপীড়নের শিকার হচ্ছে, হিন্দু কিশোরী এবং তরুণীদের ইচ্ছেমত অপহরণ, ধর্ষণ এবং ধর্মান্তরিতা অথবা হত্যা করা হচ্ছে আর পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জোটবদ্ধ মুসলিম ভোটের লালসায় এদেশের মাওলানা মওলভী এবং ইমাম সাহেবদের চরণামৃত সেবন করছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নির্দেশে থানায় হিন্দুর কোন অভিযোগ গৃহীত হয় না যদি দুষ্কৃতী মুসলমান হয়। তাই হিন্দু কিশোরী বা তরুণীকে ধর্ষণ করেও মুসলমান ধর্ষক মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। শুধু তাই নয় হিন্দু অভিযোগকারীকে পুলিশ লাঠিপেটা করে, নয়ত হাজতে ভরে দেয়। তাই শান্তিপুরের স্কুলছাত্রী চৌতালী ঘোষ, সুমিতা ঘোষ, সুস্মিতা ঘোষ বা দক্ষিণ ২৪ পরগনার দক্ষিণ

পাতিখালি গ্রামের ১৭ বছরের সবিতা মণ্ডল বা উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সরবেড়িয়া অঞ্চলের ১৩ বছরের নয়না সরদার মুসলমান দুর্বৃত্তদের দ্বারা ধর্ষিতা হওয়ার কারণে সুবিচার পেল না। "বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে"। আরও আশ্চর্যের বাংলাদেশে হিন্দুরা যখন সর্বস্ব হারিয়ে স্বজন বিয়োগে কাতর হয়ে শুধুমাত্র প্রাণটুকু বাঁচানোর তাগিদে ভারতে প্রবেশ করতে চায় তখন তাদের ভারতে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। কি কারণ? NDA সরকারের আমলে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী বলেছিলেন "ভারত যেহেতু একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র তাই ধর্মীয় কারণে যারা বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে তাদেরকে শরনার্থী হিসেবে গণ্য করবে না।" অথচ দেশভাগের সময় নৈতিকভাবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যেহেতু ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হয়েছিল তাই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যালঘু অমুসলমানরা যদি ধর্মীয় কারণে নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন এবং সেজন্য যদি ভারতে চলে আসতে বাধ্য হন তবে তাঁরা শরণার্থী হিসেবে গণ্য হবেন (বর্তমান ১৩.৭.১১৯৬)। এ প্রতিশ্রুতির মূল্য কোথায় রইল যখন ১২ বছরের দয়ারাণী ক্ষেত্রীকে গুলি করে হত্যা করল এবং শান্ত ক্ষেত্রীকে গুরুতররূপে আহত করল ভারতের মহাশক্তিশালী সীমান্তরক্ষী বাহিনী? কি অপরাধ করেছিল ১২ বছরের দয়ারাম ক্ষেত্রী? অপরাধ গুরুতর। বাংলাদেশে মুসলমান দুর্বৃত্তদের দ্বারা ধর্ষিতা হতে না চেয়ে পিতামাতার সঙ্গে দয়ারাম ক্ষেত্রী ২০০১ সালে ভারতে পালিয়ে আসছিল। সীমান্ত অতিক্রম করার সময় পরাক্রমী সীমান্ত রক্ষী বাহিনী তপ্ত বুলেট দিয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। সে ধর্ষিতা হতে চায় নি, তাই তাকে চরম মূল্য দিতে হল। অথচ গত কয়েক বছর ধরে আনুমানিক ৩ কোটি বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারী ভারতে প্রবেশ করল। তাদের রেশনকার্ডের ব্যবস্থা হল, ভোটার লিস্টে নাম উঠল, ভারতের নাগরিক বনে গেল। এখন তাদের অনেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, অঞ্চল প্রধান হচ্ছে, স্থানীয় পুলিশকে নিয়ন্ত্রণ করছে। যারা প্রকৃত শরনার্থী, যারা বাংলাদেশে মুসলমানদের অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে ভারতে পালিয়ে আসতে চেষ্টা করছে তারা শরনার্থী নয়, তারা হল অনুপ্রবেশকারী। তাই তাদের কুকুর বেড়ালের মত গুলি করে মারা হচ্ছে। আর সত্যিকারের অনুপ্রবেশকারীরা "জামাই আদর" পাচ্ছে। সব কিছু দেখে শুনে মনে হয় আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার দায়িত্ব নিয়েছে ইসলামের সম্প্রসারণ আর রক্ষণাবেক্ষণের। তাই কলকাতার কোন এক ইমাম সাহেবকে সন্তুষ্ট করতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে কলকাতা থেকে বহিষ্কার করা হয়। হ্যাঁ পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারই তসলিমা নাসরিনকে কলকাতা থেকে জয়পুরগামী একটি বিমানে তুলে দিয়েছিল এক মিথ্যে ভাঁওতা দিয়ে। তারপর আর কখনই তসলিমা নাসরিনকে কলকাতায় আসতে দেওয়া হয় নি, আর হবে বলেও মনে হয় না। কারণ দিল্লীর জামা-মসজিদের ইমাম সৈয়দ আহমেদ বুখারী স্বয়ং তসলিমা নাসরিনকে ভারত থেকে বহিষ্কার করার জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে। সরকার বাহাদুর দিল্লীর জামা মসজিদের ইমাম সাহেব-এর নির্দেশ অমান্য করতে পারে না। অতএব তসলিমা নাসরিনকে ভারতের নাগরিকত্ব? নৈব নৈব চ।

দেখা যাচ্ছে গত কয়েক দশক ধরে যে ধরনের ঘটনা পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে ঘটছিল এখন সে সমস্ত ঘটনা পশ্চিমবাংলায় অবাধে ঘটে চলেছে। অর্থাৎ মুসলমান দুর্বৃত্তদের দ্বারা হিন্দুরা আক্রান্ত হচ্ছে, অত্যাচারিত হচ্ছে, লাঞ্ছিত হচ্ছে অথচ পুলিশ কোন

ব্যবস্থা না নিয়ে নির্বিকার থাকছে। বাংলাদেশী হিন্দুরা মুসলমানদের অত্যাচার লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে সহায়সম্বলহীন হয়ে ভারতে চলে আসতে চাইছে, কিন্তু সহজ পথে আসতে পারছে না কারণ ভারতের পরাক্রমী সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর অতন্দ্র প্রহরা। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে ধর্মীয় কারণে কোন হিন্দুকে প্রবেশ করতে দেওয়া চলে না। তাই চোরাপথে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা। বিডিআর বা বাংলাদেশ রাইফেলস-এর হাতে ধরা পড়লে আবার অত্যাচার, নির্যাতন মহিলাদের শ্লীলতাহানি। আর ভারতের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর হাতে ধরা পড়লে গলা ধাক্কা বা Push back. তবুও আসছে। সম্ভব হলে দালালদের হাত ধরে। দালালদের হাত ধরলে অতি সহজেই বাজিমাত হয়ে যায়। কারণ দুর্নীতি ভারতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। ঠিক জায়গায় নৈবেদ্য দিতে পারলে সব কাজ সহজেই হয়ে যায়। আর ঠিক এই কারণেই পশ্চিমবঙ্গের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকাগুলি প্রায় বাংলাদেশী মুসলমানদের কবলে চলে গেছে। জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনার সীমান্তবর্তী এলাকাগুলি সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশী মুসলমানরাই নিয়ন্ত্রণ করছে। তাদের কথাই ওইসব অঞ্চলে শেষ কথা। ওই সব অঞ্চলে হিন্দুরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। বেছে বেছে হিন্দু বাড়ীতে ডাকাতি, হিন্দু মেয়েদের উত্যক্ত করা ওইসব অঞ্চলের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। ওইসব অঞ্চলে একটা প্রবাদ বাক্য খুব চালু রয়েছে 'টাকা রাখবি ব্যাঙ্কে, গরু রাখবি ক্যাম্পে, জরু রাখবি কোথা''? অবশ্যই হিন্দুদের উদ্দেশ্য করে বলা।

''গত এক দশকে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলা বাংলাদেশ থেকে সন্ত্রাসবাদী, বিস্ফোরক, জালনোট আর আই এস আই এজেন্টদের এদেশে ঢোকার প্রধান প্রবেশদ্বার হয়ে উঠেছে। একদিকে বাংলাদেশের জঙ্গী সংগঠন জামায়েত-উল-মুজাহিদিন এবং অন্যদিকে ভারতের স্টুডেন্টস্ ইসলামিক মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া (SIMI) এবং জামায়েত-উল-ইসলাম-এ হিন্দ মুর্শিদাবাদের সীমান্তবর্তী এলাকায় ঘাঁটি গেঁড়ে বসেছে। ২০০১ সাল থেকে বাংলাদেশের জামাতে-উল-মুজাহিদিন গোষ্ঠী মুর্শিদাবাদ জেলায় তাদের একটি ইউনিটও খুলেছে। বাংলাদেশে এদের একটি সশস্ত্র বাহিনীও রয়েছে এদের কাজ ইসলাম-এর রক্ষণাবেক্ষণ। এ সম্পর্কে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট জমা দিয়েছে বিদেশমন্ত্রক এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের বিশিষ্ট অফিসার তথা জাতীয় উপদেষ্টা এম কে নারায়ণন বাঙ্গালোরের এক অনুষ্ঠানে গিয়ে সরাসরি অভিযোগ করে বলেছেন ভারতে সন্ত্রাসবাদ ছড়ানোর ঘাঁটি বা লাঞ্চিং প্যাড-এ পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ।

স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-ও গত ১৮ অক্টোবর এখানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে স্থল, নৌ এবং বায়ুসেনার শীর্ষ কম্যান্ডারদের বার্ষিক সম্মেলনে বাংলাদেশকে ভারতের ''আর একটি নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ'' বা এ্যানাদার সিকিউরিটি কনসার্ন বলে উল্লেখ করেছেন। তিন বাহিনীর ওই কম্যান্ডার সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন অর্থের সন্ধানে ও রুটিরুজির তাগিদে বাংলাদেশ থেকে ব্যাপকহারে ভারতে অনুপ্রবেশ হচ্ছে এবং তারই সুযোগ নিয়ে আমাদের শত্রুরা ভারতে সন্ত্রাস ছড়াতে চাইছে। ওই কম্যান্ডার সম্মেলনের প্রস্তুতি হিসেবেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও বিদেশমন্ত্রক পৃথকভাবে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে উদ্বেগজনক রিপোর্ট দুটি পাঠিয়েছে। সেখানে মুর্শিদাবাদকে ঘাঁটি করে বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানি জঙ্গী ও চরদের ভারতে ঢোকার ব্যাপারে বিশদ উল্লেখ রয়েছে।

সরকারি সূত্রের খবর বিদেশ সচিব শিবশঙ্কর মেনন যে গতকাল কলকাতায় গিয়ে

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য-র সঙ্গে বৈঠক করেছেন, সেখানেও বাংলাদেশ থেকে আগত বিপদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং সেই আলোচনায় বিদেশ সচিব মেনন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে সীমান্তবর্তী মুর্শিদাবাদ জেলা দিয়ে বাংলাদেশী জামায়েত-উল-মুজাহিদিনের ভারতে ঘাঁটি গড়ার তৎপরতা সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও বিদেশ মন্ত্রক ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠানো রিপোর্টে জানিয়েছে, বাংলাদেশে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে চলতি রাজনৈতিক হিংসা ও অস্থিরতার সুযোগে জামায়েত-উল-মুজাহিদিন ফের সক্রিয় হচ্ছে। সে দেশের উত্তর পূর্বর শ্রীহট্ট থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে সাতক্ষীরা পর্যন্ত জামায়েতের নতুন সশস্ত্র গোষ্ঠী কিতাল-ফি-সাবিবিল্লাহ ৫টি কম্যান্ড ডিভিশন গঠন করেছে। ফলে আগামীদিনে মুর্শিদাবাদ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশী ও পাকিস্তানি জঙ্গীদের আরও ব্যাপকহারে ভারতে প্রবেশের আশঙ্কা রয়েছে।" (বর্তমান ৩০.১০.০৬)

পূর্ব পাকিস্তান এবং অধুনা বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষ করে হিন্দু এবং বৌদ্ধ উপজাতি চাকমারা যে অবর্ণনীয়ভাবে অত্যাচারিত হচ্ছেন তার প্রতিক্রিয়া পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে কি হয়েছে তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তারা সকলেই যে দলেরই হোন না কেন সকলেই জোটবদ্ধ মুসলিম ভোটের লালসায় মুসলমানদের সেবায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে তো কি করা যাবে? ওটা তো বিদেশের ঘটনা। বিদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানো অনুচিত বা গর্হিত কাজ বলেই মনে করেন। এরাই আবার কিউবায় কাক মরলে কেঁদে কঁকিয়ে একশা হন। বসনিয়ায় মুসলমানদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে, আফগানিস্তানে আমেরিকান সৈন্যের উপস্থিতিতে এবং আরও বিভিন্ন কারণে প্রতিবাদে সোচ্চার হন। কলকাতায় মহামিছিল করে যান চলাচল স্তব্ধ করে দেন। কিন্তু বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে মুখে রা কাড়েন না। মৌনীবাবা বনে যান। দেশের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় সব কটি রাজনৈতিক দলই মুসলিম প্রার্থী দেয়। অমুসলমান প্রার্থী দিয়ে তাকে জিতিয়ে আনার কথা চিন্তাও করতে পারে না, যদিও হিন্দু এলাকায় মুসলমান প্রার্থী দিয়ে তাকে জিতিয়ে আনার ব্যাপারে কোনদলই দুশ্চিন্তা করে না। কারণ তারা ভাল মতই জানে হিন্দু ভোটাররা প্রার্থীর যোগ্যতা দেখে, কোন দলের প্রার্থী সেটা দেখে। কিন্তু হিন্দু না মুসলমান সে ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। তাই হিন্দু এলাকায় এমনকি উদ্বাস্তু অধ্যুষিত এলাকাতেও মুসলমান প্রার্থী স্বচ্ছন্দে জিতে যায়। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে মুসলমান বিধায়কদের সংখ্যাবৃদ্ধি লক্ষ্য করার মত। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে মুসলমান বিধায়কদের সংখ্যা ছিল ৫ আর ২০১১-য় সদ্য অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মুসলমান বিধায়কদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬০। যে দ্রুতহারে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান ভোটারদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটছে তাতে আগামী ১০ বছরে পশ্চিমবঙ্গে মুসমানরা ১০০-টি আসনে জয়লাভ করলেও আশ্চর্য্যের কিছু নয়। আর এই সব মুসলমান বিধায়ক সাংসদরা তখন নিজ নিজ পার্টির অর্থাৎ সিপিআইএম কংগ্রেস বা তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে নিজেরা মুসলিম ফ্রন্ট তৈরি করে 'চাঁদ তারা' সমন্বিত সবুজ পতাকাতলে একত্রিত হবে। তখন তাদের দাবীর কাছে মাথা নত করতে বাধ্য থাকবে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীরা। পশ্চিমবঙ্গের একাধিক মুসলিম অধ্যুষিত জেলাকে মুসলিম জেলা করার দাবী উঠবে। সেই সব জেলাতে জেলা শাসক, এস.ডি.ও, এস.পি. থানার ও.সি. সব

পদাধিকারীকেই মুসলিম সম্প্রদায় থেকে নিয়োগ করার দাবী ওঠাও বিচিত্র নয়। আর সরকার সে দাবী মানতে বাধ্য থাকবে। আর এসবের পরিণতি কি হতে পারে পূর্বপাকিস্তান বা বাংলাদেশ থেকে সর্বস্বান্ত হয়ে পালিয়ে আসা উদ্বাস্তু পরিবারের লোকজনদের তা ভোলা উচিত নয়। তবে মনে হয় তারা সে সব ভুলে গেছেন। তাই উদ্বাস্তু অধ্যুষিত এলাকায় নির্বাচনে মুসলিম প্রার্থী স্বচ্ছন্দে জিতে যায়। আর তারপর ওই সব এলাকার উদ্বাস্তু ভোটাররা মহা উল্লাসে গলা ফাটায় আমাদের "জাভেদ ভাই জিতে গেছে।" এই জিতে যাওয়ার পরিণতি পরবর্তীকালে কি হতে পারে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তাভাবনা নেই ওইসব উদ্বাস্তু অধ্যুষিত এলাকার হিন্দু ভোটারদের। তাদের পিতা, মাতা, জ্যাঠা, কাকা, মামারা যে ওই জাভেদ মিঁঞা, কাদের খান, নুরুল ইসলামদের দ্বারা উৎপীড়িত, হয়ে নিপীড়িত হয়ে নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে কপর্দকহীন অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এসে উদ্বাস্তু হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন, তাদের মা, মাসী, পিসী, দিদিদের অনেকেই যে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন, পরে অনেকের সন্ধান পাওয়া গেলেও পরবর্তীকালে তাদের যে আর উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি সেসব বিস্মৃত হয়ে এরা এখন মহানন্দে "হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই" শ্লোগান দিচ্ছেন আর "একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান" গাইছেন। এরা জানে না যে মুসলমানরা হিন্দুদের ভাই হতে চায় না তবে দুলাভাই অর্থাৎ জামাইবাবু হতে খুবই পছন্দ করে। যদিও মুসলমানরা একটি হিন্দুকেও জামাতা হিসেবে মেনে নিতে রাজী নয়। যদি কোন হিন্দু ধর্ম পরিবর্তন না করে মুসলিম কন্যা বিবাহ করে তা হলে তার পরিণতি হয় শৈলেন্দ্র প্রসাদ বা অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত।

পশ্চিমবঙ্গের বাংলাদেশ সংলগ্ন সীমান্ত অঞ্চলগুলি ক্রমশ মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের দখলে চলে যাচ্ছে একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য অঞ্চলগুলিও ক্রমশ মুসলমানদের দখলে চলে যাচ্ছে। কিভাবে দেখা যাক।

সাতক্ষীরা খুলনার লোকজন ক্যানিং বাসন্তীতে দোকান, হোটেল চোরাকারবার চালাচ্ছে:

সুন্দরবনের ক্যানিং ও বাসন্তী ডকঘাট ক্রমেই বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের 'মুক্তাঞ্চলে' পরিণত হচ্ছে। মূলত বাংলাদেশের সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও খুলনা জেলা থেকে লোকজন এসে ঘাঁটি গেড়েছে এখানে। পুলিশ ও গোয়েন্দাদের কাছে এমন তথ্যও আছে যে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে কয়েকজন বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় গুরু হিসাবে এখানকার বিভিন্ন জলসায় অংশ নিতে এসে পাকাপাকিভাবে থেকে গিয়েছে। আবার বাংলাদেশের মৌলবাদী ছাত্র সংগঠন ইসলামিক ছাত্র শিবিরের কয়েকজন মাথাও এখানে প্রতিনিয়ত আসা যাওয়া করছে। এই মাথারা সেদেশের জেহাদি বানানোর ক্যাম্পে ক্যানিং ও সংলগ্ন এলাকার ছাত্র যুবকদের নিয়ে যাওয়ার কাজ করে। গোয়েন্দারা মানছেন ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক ও সংস্কৃতির মিলের কারণে এদের আলাদা করে চিহ্নিত করা সত্যিই কষ্টকর।

স্থানীয় বাসিন্দাদের একটি অংশের মদতে এবং ডান ও বাম রাজনৈতিক দলের সাহায্যে মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরা সহজেই রেশন কার্ড, ভোটার পরিচয়পত্র জোগাড় করে রাতারাতি ভারতীয় বনে যাচ্ছে। ডকঘাট, গোলাবাড়ী, বখরাবনি, পিছামারি, পূর্ব-শ্যামনগর সহ আশেপাশে বেশ কিছু এলাকায় জমি জিরেত কিনে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছে বাংলাদেশীরা। নিজের আস্তানা পাকা করার পর বাংলাদেশ থেকে পরিচিত লোকজনকে নিয়ে এসে 'এদেশীয়' বানানোর প্রক্রিয়াও চলছে বহুদিন ধরে। ভারতীয় বনে যাওয়া এই বাংলাদেশীরা নিষিদ্ধ ঘোষিত স্টুডেন্টস্ ইসলামিক মুভমেন্ট অব ইন্ডিয়ান

(সিমি) কাজকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে বলে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন।

গত তিন চার বছর আগে পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে যারা ক্যানিং ও বাসন্তী ডকঘাট সংলগ্ন এলাকায় আস্তানা গেড়েছিল তারা প্রত্যেকেই ভারতীয় হওয়ার নথিপত্র জোগাড় করে ফেলেছে। এখনও নথি জোগাড় করতে পারেনি এমন চারজন বাংলাদেশী মুসলিম ক্যানিং ডকঘাট চত্বরে দোকানপাট বানিয়ে কারবার ফেঁদে বসেছে। সাতক্ষীরার মায়াচরের বাসিন্দা এদেরই একজন নাম বদল করে চালাচ্ছে খাবারের দোকান। তার এখানকার আস্তানা ক্যানিং-এর গোলাবাড়ীতে। সেই দোকান এদেশে চোরাপথে ঢোকা লোকজনদের ট্র্যানজিট পয়েন্ট। পুলিশের খাতায় এরই পাশাপাশি আরও নানা কুকীর্তির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এই হোটেলের নাম।

ক্যানিং ডকঘাট চত্বর গড় কয়েক বছর ধরেই সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তের দুষ্কৃতীদের সদর দপ্তর বলেই পরিচিত। খুন, ছিনতাই, অপহরণ, নদী সমুদ্রে ভুটভুটি এবং ট্রলার ছিনতাই সব কিছুর সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে ডকঘাটের নাম। কুখ্যাত জলদস্যু রেজ্জাক সর্দার ও তার দল সমস্ত অপারেশন চালাত ক্যানিং ডকঘাট থেকে। এনকাউন্টারে রেজ্জাক মারা যাওয়ার পর পুলিশ জানতে পারে এই দলে কমপক্ষে পাঁচজন বাঙ্গলাদেশের নাগরিক। যাদের মধ্যে বাগেরহাটের শাজাহান মীর, মমিন ও কুদ্দুসের অস্থায়ী ডেরা ছিল ডকঘাটেই। বাসন্তী ডকঘাট চত্বরে দাপট রয়েছে সাতক্ষীরা থেকে বছর দেড়েক আগে আসা এক যুবকের। এক বামপন্থী দলের ছত্রছায়ায় থাকা ওই ব্যক্তি এখন 'ভারতীয়' বনে গিয়েছে।

ক্যানিং ও বাসন্তী ডকঘাট এবং সংলগ্ন এলাকা যে বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের চারণক্ষেত্রে পরিণত হচ্ছে তা দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য সরকারের গোচরে আনা সত্ত্বেও কোন লাভ হয় নি বলে জানিয়েছেন ক্যানিং-এর বিজেপি নেতা কৃষ্ণ দেবনাথ। কৃষ্ণবাবু জানান স্থানীয় সিপিএম-এর একটা অংশের মদতে এদেশে এসেই অনুপ্রবেশকারী মুসলমানরা রেশনকার্ড সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছে। বিনিময়ে লাল ঝাণ্ডা ধরছে তারা। ভারতীয় বনে যাওয়া এ রকম ৫০-৬০ জন বাংলাদেশীর নাম তাঁরা ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার দাবী গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে জানিয়েছিলেন। কিন্তু তা কার্যকর হয়নি বলে তাঁর অভিযোগ। ক্যানিং-এর সিপিএম নেতা দুলাল ঘোষ জানিয়েছেন বাংলাদেশ থেকে ইদানিং চোরাপথে কয়েকজন এখানে আসছে এ কথা সত্যিই। তবে তারা রেশনকার্ড জোগাড় করে ভোটার তালিকায় নাম তুলছে এ কথা মানতে রাজী নন দুলাল বাবু। (বর্তমান, ৪.৯.২০০৬)

কাকদ্বীপে পল্লি গড়ে তুলেছে বরিশাল চট্টগ্রামের বাসিন্দারা : কাকদ্বীপ শহর ও সংলগ্ন কয়েকটি এলাকায় অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশীরা জনসংখ্যার সংখ্যাগুরু অংশে পরিণত হতে চলেছে। বিশেষ করে কালীনগর, অহল্যা কলোনি, অক্ষয়নগর, মাইতির চক, পূর্বগঙ্গাধরপুর ও নামখানার কয়েকটি অংশে নিয়ন্ত্রণ কার্যত বাংলাদেশীদের হাতেই চলে গিয়েছে। চোরাচালান, মাদক ও আগ্নেয়াস্ত্র পাচারসহ আরও নানা কুকীর্তির সঙ্গে কাকদ্বীপ এলাকায় যাদের নাম জড়াচ্ছে তাদের সিংহভাগই বাংলাদেশী। রাজ্যের অন্যতম মৎসবন্দর কাকদ্বীপের মাছের কারবারের ৭৫ ভাগই এখন ভারতীয় সেজে থাকা বাংলাদেশীদের ওপরে নির্ভরশীল। অথচ এদের সিংহভাগেরই কোন ভারতীয় পরিচয়পত্র নেই। ট্রলারে শুধুমাত্র ভারতীয় পতাকা টাঙ্গিয়ে এরা সমুদ্রে মাছ ধরে। গোয়েন্দারা বলছেন গভীর সমুদ্রে বেশকটি বাংলাদেশী ট্রলার এখন ভারতীয় পতাকাকে আড়কাঠি করে তাদের কাজ সারছে।

গোয়েন্দারা জেনেছেন জম্মুদ্বীপকে ঘিরে আই এস আই যে নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে চাইছে তাতে জড়িয়ে রয়েছে বাংলাদেশীদের একাংশ। এদের অনেকেই নাম পরিচয় ভাঁড়িয়ে দাশ পদবি নিয়ে কাকদ্বীপে আস্তানা গেড়েছে। বাংলাদেশীদের এই সমস্ত আস্তানা স্থানীয়ভাবে চট্টগ্রাম পল্লি, বরিশাল পল্লি, হাতিয়া পল্লি, নামে পরিচিত রয়েছে। এ ছাড়াও কাকদ্বীপে এমন বেশ কয়েকজন লোকের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে যারা একই নামের দুটি ট্রলার রেখেছে ভারতীয় ও বাংলাদেশ জল সীমানায়। মাছ ধরা ছাড়া অন্য সব কাজকর্ম চলে এই ধরনের ট্রলি বা ট্রলারে। গোয়েন্দারা বলেছেন কাকদ্বীপের বিভিন্ন এলাকায় বসানো হয়েছে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন রেডিও টেলিফোন। যার মাধ্যমে এপার থেকে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ করা হয় ওপারে।

সাতক্ষীরা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, খুলনা, নোয়াখালি ও হাতিয়া জেলা থেকেই বেশীরভাগ বাংলাদেশী কাকদ্বীপে এসে ডেরা বাঁধছে। গোয়েন্দাদের হিসেব অনুযায়ী প্রতিদিনই ৫-১০ জন করে বাংলাদেশী 'ভারতীয়' হতে এখানে আসছে। চোরাগোপ্তাভাবে স্থলপথে সীমান্ত পেরিয়ে এবং জলপথে মাছ ধরার ট্রলারে চেপে কাকদ্বীপে এসে উঠছে বাংলাদেশীরা। এরা কোথাও পূর্ত দপ্তরের, কোথাও সেচ দপ্তরের জমি দখল করে বাড়ীঘর বানিয়ে নিচ্ছে। অনেকে আবার রায়তি জমি কিনেও আস্তানা গাড়ছে। গোয়েন্দাদের কাছে যে তথ্য আছে তাতে দেখা যাচ্ছে এখন কাকদ্বীপ, নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ ও বকখালিতে ৫০-৬০ হাজার বাংলাদেশী অবৈধভাবে বাস করছে। এলাকার আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উপর বাংলাদেশীরা যে মারাত্মক প্রভাব ফেলছে এ কথা মুখে বললেও কার্যক্ষেত্রে তা নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করতে সাহস পাচ্ছেন না রাজনৈতিক নেতারা। পঞ্চায়েত, বিধানসভা কিংবা লোকসভা নির্বাচনেই ভারতীয় সেজে থাকা এই সমস্ত বাংলাদেশীরাই যে জেতার অমোঘ অস্ত্র সেটা জানে ডান বাম সব পক্ষই। গোয়েন্দা দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী কাকদ্বীপ মহকুমার ভোটার তালিকায় এই মুহূর্তে বাংলাদেশীদের অবস্থান শতকরা ১৮ থেকে ২০ ভাগ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর কাকদ্বীপে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ নিয়ে বারবার সতর্ক করেছে রাজ্য সরকারকে। কিন্তু ভোটার তালিকায় এই বিশাল সংখ্যাকে অবজ্ঞা করার মত দেশপ্রেম দেখাতে তাই রাজী নয় কোন পক্ষই। কাকদ্বীপের যে সমস্ত এলাকা বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের প্রায় দখলেই চলে গিয়েছে সেগুলির অন্যতম হাতিয়া কলোনি। একসময় বাংলাদেশের উপজেলা হাতিয়া এখন পূর্ণাঙ্গ জেলায় পরিণত হয়েছে। সেখান থেকে চোরাপথে আসা লোকজন দেশের স্মৃতিকে টাটকা রাখার জন্য কাকদ্বীপেই বানিয়ে ফেলেছে হাতিয়া কলোনি। এক কথায় বাংলাদেশের এই কাকদ্বীপ সংস্করণে ভারতীয় খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। এ হেন হাতিয়া কলোনিতে গত মার্চ মাসে ভারতীয় হতে এসেছেন বছর চল্লিশের এক ব্যক্তি। সঙ্গে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও পরিবারের অন্যরা। নাম ভাঁড়িয়ে এই ব্যক্তি বর্তমানে অমূল্য দাশ। "মাছ ধরার ট্রলারে চেপে কেঁদো দ্বীপ পর্যন্ত এসেছিলাম। সেখান থেকে ভুটভুটিতে চেপে নামখানা হয়ে কাকদ্বীপ পৌঁছেছি। যদি এখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় ফের ফিরে যাব বাংলাদেশে জানালেন 'অমূল্য'।"

কাকদ্বীপ মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাংলাদেশীদের কাছে কখনও না ভুলতে পারা নামটি মেজর জিয়ার। শোনা যায় এই ব্যক্তি এক সময় মুক্তি যুদ্ধেও অংশ নিয়েছিলেন। এখন কট্টর জেহাদি নেতা। গোয়েন্দারা বলছেন কাকদ্বীপ নামখানায় নদী সমুদ্র পথে লোক ঢোকানোর মূল পাণ্ডা সাতক্ষীরার রাঙাবালিয়ার মেজর জিয়া। আই এস

আইয়ের বাংলাদেশের দক্ষিণ অংশের নেটওয়ার্কের অনেকটাই সামলায় এই ব্যক্তি। বঙ্গোপসাগরে ভারত বাংলাদেশ দুদেশের মৎসজীবীদের নাকি জিয়াই নিয়ন্ত্রণ করে। সমুদ্রে ট্রলার ও ট্রলি ছিনতাই হলে ভারতীয় মৎসজীবীরা জিয়ার দরবারে নজরানা দিয়ে সেগুলি ছাড়িয়ে নিয়ে আসে বলে জেনেছেন গোয়েন্দারা। বর্তমান (৫.৯.০৬)

দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্র বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশ ঘটে চলেছে এবং কোন কোন জায়গায় তারা যথেষ্ট শক্তিশালী এবং তারাই সব কিছুর নিয়ন্ত্রক। জলপাইগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা সর্বত্র উদ্বেগজনকভাবে মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটছে। ফলে ওইসব অঞ্চলে শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। কিছু কিছু এলাকায় চুরি ডাকাতি খুন অপহরণ ধর্ষণ প্রভৃতি নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে। কিছু কিছু সেক্যুলার হিন্দু বলে থাকেন মুসলমানরা কি সবাই খারাপ না কি? সবাই কি চোর ডাকাত? তা অবশ্য নয়। তবে আমাদের দেশে যত চোর, ডাকাত, স্মাগলার, খুনী, ধর্ষক প্রভৃতি ধরা পড়ে তাদের মধ্যে ৯০ শতাংশই মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত। মনে রাখা দরকার একজন প্রকৃত মুসলমান কখনই কুরআন শরিফ বা হাদিসকে অবজ্ঞা করতে পারে না। কারণ কুরআন শারিফ-এর নির্দেশ পালন করা একজন সাচ্চা মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। এখন দেখা যাক কুরআন শারিফের নির্দেশগুলি কি এবং ইসলাম কত মহান কত উদার কত সুন্দর এবং পরধর্মসহিষ্ণু। নিম্নলিখিত আয়াতগুলি সংগৃহীত হয়েছে কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ হরফ প্রকাশনী এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলকাতা ৭০০০০৭ থেকে প্রকাশিত মাওলানা মোবারক করীম জওহর সাহেব অনুবাদিত কুরআন শারিফ তৃতীয় সংস্করণ ২০০৫ থেকে। এখানে প্রথমেই জেনে রাখা ভাল বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী বলতে পবিত্র কুরআন-এ কি বোঝানো হয়েছে। বিশ্বাসী তারাই যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং তার উপাসনা করে, অর্থাৎ মুসলমান। আর অবিশ্বাসী তারাই যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, আল্লাহর উপাসনা করে না অর্থাৎ অমুসলমান। ইহুদী খৃষ্টান হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন এরা সবাই অবিশ্বাসী।

(১) হে বিশ্বাসীগণ তোমাদের আপনজন ব্যতীত অন্য কাকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের বিভ্রান্ত করতে ত্রুটি করবে না, যা তোমাদের বিপন্ন করে তাই তারা কামনা করে। (সুরা ৩ আয়াত ১১৮, পৃষ্ঠা ৫২)

(২) অবিশ্বাসীগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু (সুরা ৪ আয়াত ১০১, পৃষ্ঠা ৬৮)

(৩) যারা আমার আয়াতে অবিশ্বাস করে তাদের আগুনে দগ্ধ করবই। যখনই তাদের চর্ম দগ্ধ হবে, তখনই ওর স্থলে নতুন চর্ম সৃষ্টি করব, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে।
(সুরা ৪ আয়াত ৫৬, পৃ. ৬৪)

(৪) হে নবী বিশ্বাসীদের জন্য উদ্বুদ্ধ কর। তোমাদের মধ্যে ২০ জন ধৈর্যশীল থাকলে তারা ২০০ জনের ওপর বিজয়ী হবে এবং তোমাদের মধ্যে একশত জন থাকলে এক সহস্র অবিশ্বাসীর ওপর বিজয়ী হবে। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যার বোধশক্তি নেই। (সুরা ৮ আয়াত ৬৫, পৃষ্ঠা ১১৭)

(৫) আর যেখানে পাও তাদের হত্যা কর এবং যেখান থেকে তোমাদের বার করে দিয়েছে তোমরাও সেখান থেকে তাদের বার করবে। ফিৎনা (দাঙ্গা বা ধর্মদ্রোহিতা) হত্যা অপেক্ষাও গুরুতর। (সুরা ২ আয়াত ১৯১, পৃষ্ঠা ৩৩)

(৬) অতএব আল্লাহর পথে গৃহত্যাগ না করা পর্যন্ত তাদের মধ্য হতে কাউকে

বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না, যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তাদের যেখানে পাবে গ্রেফতার করবে এবং তাদের মধ্য হতে কাউকেও বন্ধু ও সহায়রূপে গ্রহণ করবে না। (সুরা ৪ আয়াত ৮৯, পৃষ্ঠা ৬৭)

(৭) নিশ্চয়ই, আল্লাহ্‌র নিকট নিকৃষ্ট জীব তারাই যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং অবিশ্বাস করে। (সুরা ৮ আয়াত ৫৫, পৃষ্ঠা ১১৭)

(৮) অতএব নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে অংশীবাদীদের যেখানে পাবে বধ করবে, তাদের বন্দী করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাকবে, কিন্তু যদি তারা তওবা (অনুপাত) করে, যথাযথ নামাজ পড়ে ও যাকাত দেয় (দান করে) তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (সুরা ৯ আয়াত ৫, পৃষ্ঠা ১১৯)

(৯) আত্মীয়স্বজন হলেও অংশীবাদীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং বিশ্বাসীদের জন্য সঙ্গত নয় যখন এ সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে ওরা জাহান্নামবাসী।

(সুরা ৯ আয়াত ১১৩, পৃষ্ঠা ১২৭)

(১০) হে বিশ্বাসীগণ! অবিশ্বাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখুক। (সুরা ৯ আয়াত ১২৩, পৃষ্ঠা ১২৮)

(১১) যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোষাক; তাদের মাথার ওপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে, যাতে ওদের উদরে যা আছে তা গলে যাবে, এবং ওদের জন্য থাকবে লৌহ মুদ্‌গর, যখনই ওরা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম হতে বেরুতে চাইবে তখনই তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে ওতে; (ওদেরকে বলা হবে) 'আস্বাদ কর দহন যন্ত্রণা'। (সুরা ২২ আয়াত, ১৯, ২০, ২১, ২২, পৃষ্ঠা ২০২)

(১২) অভিশপ্ত অবস্থায় ওদের যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে। (সুরা ৩৩, আয়াত ৬১, পৃষ্ঠা ২৫২)

(১৩) আল্লাহ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছেন যেখানে ওরা স্থায়ী হবে এবং ওরা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না যেদিন অগ্নিতে ওদের মুখমণ্ডল উল্টেপাল্টে দগ্ধ করা হবে সেদিন ওরা বলবে 'হায় আমরা যদি আল্লাহ ও রসুলকে মান্য করতাম।

(সুরা ৩৩ আয়াত ৬৪, ৬৫, ৬৬, পৃষ্ঠা ২৫২)

(১৪) পরিণামে আল্লাহ কপট পুরুষ ও কপট নারী এবং অংশীবাদী পুরুষ ও অংশীবাদী নারীকে শাস্তি দেবেন এবং বিশ্বাসী নর ও বিশ্বাসী নারীকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (সুরা ৩৩ আয়াত ৭৩, পৃষ্ঠা ২৫২)

(১৫) আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কোন উপাস্য নেই । (সুরা ৩ আয়াত ২, পৃষ্ঠা ৪৪)

(১৬) এবং কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম চাইলে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না।

(সুরা ৩ আয়াত ৮৫, পৃষ্ঠা ৫০)

এ ধরনের আয়াত অর্থাৎ উপদেশ বা নির্দেশ পবিত্র কুরআন-এ আরও অনেক রয়েছে। এতে কি প্রতিভাত হচ্ছে না যে ইসলাম পরধর্মসহিষ্ণু নয়? আল্লাহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বা অমুসলমানদের কাছে নিষ্ঠুর প্রতিহিংসাপরায়ন দানব বিশেষ, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের খতম্ করাই তার লক্ষ্য। এই পরিস্থিতিতে যারা সর্বধর্ম সমন্বয়-এর কথা বলেন, সব ধর্মই সমান বলেন তাদের নির্বোধ ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? যারা শ্লোগান দেন 'হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই' বা গান করেন 'একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান' তাদের কি বলা যেতে

পারে অজ্ঞ না ভণ্ড, সঠিক জানা নেই। এই সব মেকি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী হিন্দুরাই হিন্দু পাড়ায় মুসলমানদের মাংসের দোকান করতে ঘর ভাড়া দেয়, বেশী টাকার লোভে জমি বা বাড়ী বিক্রি করে, কাশ্মীরী শালওয়ালাদের ঘর ভাড়া দেয়, মুসলমান দর্জি না হলে জামা প্যান্ট তৈরি পছন্দ হয় না। লেপ তোষক করাতে হলে অবশ্য মুসলমান ধুনকর ছাড়া উপায় নেই, তালা বা ছাতা মেরামতি করাতে হলেও একই অবস্থা।

এই সমস্ত কারণে হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটছে। তারা জানে যে, হিন্দু এলাকায় তাদের কোন বিপদ হবে না। তাই একজন মুসলমান হিন্দু পাড়ায় বাড়ী কিনলে বা ভাড়া নিলে কিছুদিন পরে সুবিধে মত আর একজনকে নিয়ে আসে। এইভাবে ক্রমাগত তাদের সংখ্যা বেড়ে চলে। এইভাবে তাদের সংখ্যা বেড়ে গেলে তারা ছোটখাট উৎপাত শুরু করে। ছোটখাট চুরি, ছিনতাই, ইভটিজিং ইত্যাদি। পরবর্তী কালে এলাকা বা পাড়াটি মুসলিম মহল্লায় পরিণত হয়। শুধু একটি বা দুটি শহরে এ ধরনের ঘটনা ঘটছে তা নয়। উত্তর থেকে দক্ষিণ সারা পশ্চিমবঙ্গে এ ধরনের ঘটনা ঘটে চলেছে। টিভিতে যখন গ্রামাঞ্চলের কোন সাধারণ মানুষের কোন মতামত জানতে চাওয়া হয় সে হাওড়া, বীরভূম, উত্তর ২৪ পরগনা যে জেলারই হোক না কেন দেখা যায় কোন মুসলমান মতামত দিচ্ছে। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা হলে তো কথাই নেই। অর্থাৎ ধীরে ধীরে সর্বত্রই মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং প্রাধান্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অনুপ্রবেশকারীদের দখলে চলে যাচ্ছে কলকাতা : পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে কলকাতা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে মেটিয়াব্রুজ, গার্ডেনরিচ, খিদিরপুর, চিৎপুর, রাজাবাজার, এন্টালি, ধর্মতলা, বেনিয়াপুকুর, পার্কসার্কাস, মল্লিকবাজার প্রভৃতি এলাকায় গেলে মনে হয় পাকিস্তানের কোন শহরে আছি। ধর্মনিরপেক্ষতা এবং গণতন্ত্রের পীঠস্থান শহর কলকাতা ক্রমশ বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের দখলে চলে যাচ্ছে। বাংলাদেশের উর্দুভাষী বিহারী মুসলমান যারা এক সময় হুংকার দিয়েছিল ভারতের মধ্য দিয়ে লংমার্চ করে পাকিস্তানে যাওয়ার, তারা প্রায় সকলেই শর্টমার্চ করে 'বিছমিল্লা' বলে কলকাতা এবং সন্নিহিত অঞ্চলে ঢুকে পড়ে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। শহীদ মিনার সংলগ্ন এলাকায় যে সমস্ত উর্দুভাষী মুসলমানদের দেখা যায় রাস্তায় বা ফুটপাথে দোকান দিয়ে বসেছে তাদের মধ্যে অন্তত ৫ শতাংশ বাংলাদেশী উর্দুভাষী মুসলমান অনুপ্রবেশকারী। কলকাতার প্রাণকেন্দ্র রাজভবন, বিধানসভা, বিমানবন্দর, আকাশবানী ভবন, রিজার্ভব্যাঙ্ক, ফোর্ট উইলিয়াম প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলির চারদিকে বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটছে আশঙ্কাজনকভাবে। প্রিন্সেপ ঘাট, বাবু ঘাট, আউট্রাম ঘাট, চাঁদপাল ঘাট সহ গঙ্গাবক্ষে অসংখ্য ছোট ছোট ভাড়ার নৌকা থাকে সান্ধ্যভ্রমণ এবং নানা অসামাজিক, কাজকর্মের জন্য। ওই সমস্ত নৌকাগুলির মাঝিদের ৮৫ শতাংশই বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারী। রাতের অন্ধকারে মাদক দ্রব্য এবং আগ্নেয় অস্ত্র পাচারের কাজ করে থাকে ওইসব বাংলাদেশী মাঝিরা। শিয়ালদহ স্টেশন শহরের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। আনুমানিক ১৬ লক্ষ যাত্রী প্রতিদিন এই স্টেশন দিয়ে যাতায়াত করে থাকে। এই স্টেশন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় অনুপ্রবেশকারীরা অত্যন্ত ধীরে তাদের সংখ্যা এবং শক্তিবৃদ্ধি করে চলেছে। এক সময় পূর্ব পাকিস্তানে সর্বস্ব হারিয়ে বাঙ্গালী হিন্দু উদ্বাস্তুদের একাংশ জীবিকা হিসেবে স্টেশনের আশেপাশে হকারী করত। মৌলালী থেকে

সূর্য সেন স্ট্রীট, বৈঠকখানা থেকে পূরবী সিনেমা এইসব অঞ্চল ছিল এদের হকারী করার এলাকা। রাজনৈতিক দলের নেতাদের পকেটপুষ্ট করে এবং আশির্বাদধন্য হয়ে কয়েকশো মুসলমান অনুপ্রবেশকারী এই সমস্ত অঞ্চলে হকারী করছে। শুধুমাত্র হকার নয় এদের মধ্যে রয়েছে ভিখারী, পকেটমার, ছিনতাইকারী এবং গুণ্ডা বদমাইশ। গ্রাম্য বা ভাল মানুষ গোছের খদ্দের পেলে এদের কাছে এরা সস্তার জিনিষ বেশীদামে গছিয়ে দিতে সিদ্ধহস্ত। খদ্দের একটু মেজাজ খারাপ করলে বা তর্কাতর্কি করলে গুণ্ডার দল চলে আসে আর খদ্দেরকে সর্বস্বান্ত করে ছাড়ে। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় রোড, বৈঠক খানা রোড, কেশব সেন স্ট্রীট, আর্মহাস্ট স্ট্রীট প্রভৃতি নিয়ে একটা বিশাল এলাকা 'দপ্তরী পাড়া' নামে পরিচিত। এই এলাকায় কয়েক হাজার বই বাঁধাই-এর কারখানা রয়েছে। এখানেও থাবা বসিয়েছে বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা। কিছু বই বাঁধাই-এর কারখানাও বসিয়েছে তারা। বছরে প্রায় ২৫-৩০ লক্ষ টাকা রোজগার করে বাংলাদেশে পাঠায় এরা। কলকাতায় অর্থ উপার্জন করে সেই টাকাতে বাংলাদেশে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বানাচ্ছে। অনেক অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশ থেকে পরিবার নিয়ে এসে নারায়নপুর, রাজারহাট, বারাসাত, ভাঙ্গর এলাকায় ঘরবাড়ি তৈরি করে বাস করছে। অনেকে এখানকার মেয়ে বিয়ে করে সংসার পেতেছে। রেশন কার্ডের ব্যবস্থা করে ভোটার লিস্টে নাম তুলে এরা এখন ভারতীয় নাগরিক বনে গেছে। এখন আর অনুপ্রবেশকারী বলা চলবে না এদের। রাজনৈতিক দলের নেতাদের সৌজন্যে এসব সম্ভব হচ্ছে। দমদম বিমান বন্দর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। যশোর রোডের পাশে দমদম বিমান বন্দরের ভেতরে রানওয়ের পাশে একটি পুরনো মসজিদ আছে। কোন অজ্ঞাত কারণে সেটি স্থানান্তরিত করা সম্ভব হয় নি। আবার যশোর রোডের অন্য পাশে গড়ে উঠেছে মদিনানগর মাদ্রাসা। মাঝখানে মসজিদ। পিছন দিকে রাজারহাট থানার বিভিন্ন এলাকায় বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের বসতি গড়ে উঠেছে। এরা নিয়মিত বাংলাদেশে যাওয়া আসা করে থাকে। জনশ্রুতি ভারত সীমান্তে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর 'উপযুক্ত লোকের' হাতে ৫০০ টাকা গুঁজে দিলে বাংলাদেশ সীমান্তে বাংলাদেশ রাইফেলসকে কিছু দিতে হয় না। আবার ফেরার সময় বাংলাদেশ রাইফেলস্‌কে ৬০০ টাকা দিলে ভারত সীমান্তে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সকে কিছু দিতে হয় না। এভাবেই অনুপ্রবেশকারীরা যাতায়াত করে থাকে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন হাকিমপুর, গোপালপুর, ঘোজাডাঙ্গা, বসিরহাট অনুপ্রবেশকারীদের যাতায়াতের সহজ রাস্তা। ১০ বছরের দয়ারাম ক্ষেত্রীর এসব জানার কথা নয়। তাই বি এস এফ-এর গুলিতে বেঘোরে প্রাণটা দিতে হল তাকে। কি দোষ করেছিল সে। সে বাংলাদেশী মুসলমান দুর্বৃত্তদের দ্বারা ধর্ষিতা হতে চায়নি। তাই পিতামাতার সাথে ভারতে পালিয়ে আসছিল সে। তাই তাকে চরমমূল্য দিতে হল।

দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের অবাধ বিচরণ। সর্বত্রই তাদের গতিবিধি, কাজকর্ম। প্রসঙ্গক্রমে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হল। সম্প্রতি আমার এক বন্ধু দমদম বিমান বন্দরে যাওয়ার কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে রিক্সা নিয়েছিলেন বিমান বন্দরে যাওয়ার জন্য। উদ্দেশ্য ছিল বিমান সংক্রান্ত কিছু অনুসন্ধান। ভাড়া ঠিক হওয়ার পর রিক্সায় যেতে যেতে রিক্সাওয়ালার সঙ্গে আমার বন্ধুর যে কথাবার্তা হয়েছিল সংক্ষিপ্তকারে তার কিছু অংশ প্রকাশ করা হল। রিক্সাওয়ালাকে আমার—

বন্ধুর প্রশ্ন : তোমার বাড়ী কোথায়?

রিক্সাওয়ালা : বাবু আমাদের বাড়ী বাংলাদেশে।

বন্ধু : আমাদের মানে? তোমরা কতজন?

রিক্সাওয়ালা : বাবু আমরা ৫০-৬০ জন আছি।

বন্ধু : তা তোমরা এদেশে এলে কি ভাবে? তোমাদের ভিসা পাশপোর্ট আছে?

রিক্সাওয়ালা : না বাবু আমাদের ওসব লাগে না। বর্ডারে লোক আছে তারাই সব ব্যবস্থা করে দেয়। তবে টাকা দিতে হয়।

বন্ধু : বাঃ ভাল ব্যবস্থা। তা তোমরা থাক কোথায়?

রিক্সাওয়ালা : আমরা এই আশেপাশে এখানেই থাকি। আমাদের তো রাত দিনই কাজ। অনেক সময় রিক্সাতেই ঘুমাই।

বন্ধু : তা এখানকার লোকজন কিছু বলে না? থানা থেকে পুলিশ আসে না? ধরে নিয়ে যায় না?

রিক্সাওয়ালা : না বাবু, থানাতেও আমাদের লোক আছে। পার্টির দাদারা আছেন। তারাই সব সামাল দেন। তবে আমাদের প্রত্যেককে তাদের ৫০০ টাকা করে দিতে হয় তবে তারা বলে দেছেন এই এলাকার বাইরে না যেতে।

বন্ধু : তা তোমরা দেশে যাও না? তোমাদের বিবি বাচ্চারা তো সেখানেই আছে, তাই না?

রিক্সাওয়ালা : হ্যাঁ বাবু আমরা মাঝে মাঝে দেশে যাই। দেশে গেলে মসজিদের ইমাম সাহেব আমাদের ডেকে নানারকম পরামর্শ দেন।

বন্ধু : তা তোমাদের ইমাম সাহেব কি পরামর্শ দেন? তোমরা যেভাবে এদেশে আসছ, সংখ্যায় বাড়ছ আমরাই তো এদেশে সংখ্যালঘু হয়ে যাব এক সময়। তখন তো তোমরাই দেশটার দখল নিয়ে নেবে। তা তখন কি আমাদেরও মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তে হবে?

রিক্সাওয়ালা : না বাবু আপনাদের নামাজ পড়তে লাগবে না। একটু সময় লাগবে তো। তবে আপনাদের পরে যারা থাকবে তাদের নামাজ পড়তে লাগবে।

বন্ধু : তার মানে তোমরা আস্তে আস্তে এ দেশটার দখল নিয়ে নেবে। তোমাদের ইমাম সাহেবরা কি বলেন?

রিক্সাওয়ালা : ইমাম সাহেব তো তাই বলেন। বলেন এদেশে তোমাদের রুজিরোজগার নাই। তোমরা ইন্ডিয়া চলে যাও। সেখানে অনেক রকম কাজ আছে। যে যেরকম কাজ পাবা করবা। আর ওখানকার লোকেরা যে মজুরী চায় তোমরা তার থিক্যা কম নিবা। এতে তোমাদের কামের অভাব হবে না। যেমন ধরেন আমি রিক্সা ভাড়া চাইলাম ১৫ টাকা। আপনে কইলেন ১২ টাকা। আমি তাতেই রাজী হইলাম কি না? আমি জানি এখানকার রিক্সাওয়ালারা ২০ টাকা ভাড়া চাইত। ঠিক কি না বলেন। আমাদের অনেকেই এখানে শাদী করছে। তাদের বিবিরা হিঁদু বাড়ীতে কাজ করে। এখানকার মেয়ে বউরা যদি ২০০ টাকা চায়, তো আমাদের বিবিরা ১৫০ টাকা বা ১৪০ টাকা চায়। তাদের কেউ বসে থাকে না, সহজেই কাম পায়। তাছাড়া আমাদের অনেকে পান বিড়ির দোকান দেছে, কেউ বা চায়ের

দোকান। কেউ মাটি কাটার কাজ করে, কেউ ফেরিওয়ালা। লোকে জানে ওরা মুর্শিদাবাদের লোক। আসলে সবাই বাংলাদেশী। বাবু, এদেশে আমাদের কাজ কামের অভাব নেই।

বন্ধু : তোমাদের ইমাম সাহেব আর মুরুব্বীরা আর কি বলেন?

রিক্সাওয়ালা : মুরুব্বীরা বলেন তোমাদের যারা পারবা হিঁদু পাড়ায় একটা করে খাসীর মাংসের দোকান দিবা। দাম কিছুটা কম রাখবা। তাহলে অন্য দোকানের খরিদ্দাররা তোমাদের দোকানে যাইব। পরে দ্যাশটা আমাদের কব্জায় আইলে ওগুলারে গোস্তের (গরুর মাংস) দোকান বানাবা। তাহলে হিঁদুরা আর ধারে কাছে থাকবে না। বাড়ী ঘর বিক্রী করে দোকান ব্যবসা বন্ধ করে দূরে সরে যাবে। তোমরা তখন সেগুলা কম দামে কিনে নিবা। তাইলে জাইগাটা তোমাদের মহল্লা হইয়া যাইব। এরপর সেখানে একটা মসজিদ বা মাজার বানাবা। ধীরে ধীরে সেগুলান বাড়াতে থাকবা। সব জায়গায় আমাদের লোক থাকব, টাকা দেওয়া থাকবে, কেউ বাধা দিবে না।

বন্ধু : সর্বনাশ! তোমাদের ইমাম সাহেব আর মুরুব্বীরা এইসব বলেন? তারা আর কি বলেন?

রিক্সাওয়ালা : হ্যাঁ বাবু, আর এতে তো আমাদের খারাপ কিছু হয় না। বরং ভালই হয়। উনারা আরও বলেন তোমাদের সংখ্যা আর একটু বাড়লে পঞ্চায়েত, পুরসভা, বিধানসভা সব জায়গায় তোমাদের ক্যান্ডিডেট দিয়ে তাদের জিতিয়ে আনবা। ইমাম সাহেব বলেছেন যেখানে মোছলমান ক্যান্ডিডেট থাকবে, সে লাল পার্টি হোক বা অন্য পার্টি তাকেই ভোট দিবা। বাবু কিছু মনে করেন না, ইমাম সাহেব বলেন, হিঁদুরা ভীষণ লোভী, স্বার্থপর আর বোকা হয়। তারা লড়াই করতে ভয় পায় তাই, খালি ঠাকুর ঠাকুর করে। ওদের ঠাকুরের কোন ক্ষমতা নাই। কিসে ওদের ভাল আর কিসে ক্ষতি সেটাও তারা বোঝে না। এই সুযোগটা কাজে লাগাবা। হিঁদুদের দিয়েই মোছলমানদের মাদ্রাসা তৈরি হবে, পুলিশে, সরকারি চাকরিতে মোছলমানদের জন্য সংরক্ষণ করা হবে। তবে তোমাদের কাজ থাকবে। সরকার ১০ শতাংশ সংরক্ষনের কথা বললে, তোমরা ২০ শতাংশ দাবী করবে, ২০ শতাংশ দিলে তোমরা ৩০ শতাংশ চাইবে। মোছলমানদের জন্য হিন্দুরাই সব ব্যবস্থা করে দেবে। টাকা পেলে এরা সব করতে পারে। হিঁদুরাই সব জায়গায় মোছলমানদের সুবিধা করে দেবে। সব জায়গায় আমাদের লোক থাকলে দেশটা আমাদের হাতে চলে আসতে বেশী সময় লাগবে না। হিঁদু পাড়ায় তোমরা বসবাস শুরু করবে। তারপর উৎপাত শুরু করবে। ছোট খাট, চুরি ছিনতাই, হিঁদু মেয়েদের ফুসলানো, হাত ধরে টানাটানি, টিটকারি মারা এই সমস্ত আর কি। এসব সুযোগ বুঝে করবা। পার্টি আর পুলিশকে টাকা দিলে সব চুপ থাকবে। পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেবে না। আমাদের লোকজন তো থাকবেই। হিঁদুদের দুর্গাপূজা, কালীপূজা সব বন্ধ করে দিতে হবে। বলতে হবে মসজিদের সামনে দিয়ে ঢাক বাজিয়ে মূর্তি নিয়ে যাওয়া চলবে না। ওতে গুনাহ্ হয়। ইমাম সাহেব বলেন তার পরামর্শ মত

কাজ করলে ১০-১৫ বছরের মধ্যেই দেশটা মোছলমান-এ ভর্তি হয়ে যাবে। আর একটা মোছলমান ১০টা হিঁদুর সাথে টক্কর দিতে পারে, তাহলে ভয় কিসের? ইনশাল্লাহ্ ২০ বছরের মধ্যে দেশটারে ইসলামিক রাষ্ট্র করা যাবে।

ইতিমধ্যে আমার বন্ধুর গন্তব্যস্থল "এয়ার পোর্ট" এসে যাওয়াতে বন্ধু রিক্সা থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিলে রিক্সাওয়ালা সালাম করে রিক্সা নিয়ে চলে গেল। বন্ধুর কথা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল একজন অশিক্ষিত বাংলাদেশী মুসলমান যা বলছিল পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র তো তাই ঘটে চলেছে। হিন্দু পাড়ায় একের পর এক মাংসের দোকান গজিয়ে উঠছে, পান বিড়ির দোকান, সাইকেল, স্কুটার বা মোটর সাইকেল সারাবার দোকান সবই তো মুসলমানদের। লেপ তোষক বানাবার, শার্ট, প্যান্ট, ব্লাউজ, সালোয়ার কামিজ তৈরির দোকান, ফলের দোকান সবই তো মুসলমানদের। এমন কি স্টেশনারী দোকান। হিন্দু পাড়ার নিকটবর্তী মুসলিম মহল্লা থেকে মুসলমান মেয়ে বউরা হিন্দু পাড়ায় হিন্দুবাড়ীতে পরিচারিকার কাজ করতে আসছে। আমাদের পাড়ায় ৩/৪টি পানের দোকান রমরমিয়ে চলা সত্ত্বেও একজন শিক্ষক (অবশ্যই হিন্দু) একটি মুসলমানের দোকান ISLAM PAN SHOP থেকে রোজ পান কিনে খান। হিন্দু স্টেশনারী দোকান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আর পাশেই ফারুকের স্টেশনারী দোকান দিনকে দিন ফুলে ফেঁপে উঠছে। পাড়ার হিন্দুরাই ফারুকের দোকানের নিয়মিত খরিদ্দার। তবে দূর বা অন্য জায়গা থেকে মুসলমানরা আসছে ফারুকের দোকানে জিনিষপত্র কিনতে। হিন্দুরা এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তাভাবনা করে না। তারা উদার, ধর্মনিরপেক্ষ। তাদের কাছে সব ধর্মই সমান। তাই বাংলাদেশ থেকে, পাকিস্তান থেকে অত্যাচারিত নির্যাতিত হয়ে পালিয়ে আসতে হয়। এরা পণ করেছে কোন কিছু থেকেই এরা শিক্ষা নেবে না। সাইকেল সারানো বা চাকায় হাওয়ার মুসলমানদের দোকানগুলি এমন এমন জায়গায় যে স্কুল কলেজের ছাত্রীরা সেখানেই ভিড় করে। রবিবার বা ছুটির দিন ভোর বেলায় মাংসের দোকানে বিরাট লাইন। দুর্গাপুজোর নবমীর দিনে জবাই করা পাঠার মাংস খেয়ে পুণ্যার্জন করার জন্য 'হিঁদু পাঁঠাদের' কি লম্বা লাইন। অথচ মুসলমানরা কখনই এক কোপে পাঁঠা বা অন্য কিছুর মাংস ছোবে না পর্যন্ত। বলবে "ও গুনাহ্ হ্যায়"। বেশ কয়েক বছর আগে হুগলীর চাঁপদানি অঞ্চলে এলাকার মহিলাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত এক দুর্গাপুজোয় পাঁঠা বলি হয়েছিল। পরে মহিলারা যখন স্থানীয় মাংস বিক্রেতা (অবশ্যই মুসলমান) দু একজনকে বলি দেওয়া পাঁঠাটার ছাল ছাড়িয়ে রান্নার উপযুক্ত অর্থাৎ টুকরো টুকরো করে কেটে দেওয়ার জন্য বলল, তারা কেউই রাজী হয় নি। আজকাল পাড়ায় পাড়ায় সাইকেল ভ্যান-এ সব্জী বিক্রী হয়। সব্জীওয়ালাদের নাম জানতে চাইলে বলে বিনোদ, মন্টু, বিজয় প্রভৃতি। প্রকৃত পরিচয় সেখ বিনোদ, মন্টু মিএগ্রা, এইসব। প্রকৃত পরিচয় গোপন করতে চায়।

ফলওয়ালারা তো সবাই মুসলমান। হাওড়া স্টেশনের আশেপাশে যারা ফল, সব্জী, লেবু নিয়ে বসে তারা প্রায় সবাই মুসলমান, হিন্দুরাই এদের খদ্দের, হিন্দুরাই এদের রক্ষাকর্ত্তা। এদের দাপট এতটাই যে বছর কতক আগে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বামফ্রন্টের এক বিধায়ককেই এদের হাতে নিগৃহীত হতে হয়েছিল। আট দশ বছর আগেও যেটা হত না এখন সেটা হামেশাই হয়ে চলেছে। মুসলমান যুবকেরা ৩।৪ জনের দল নিয়ে হিন্দু পাড়ায় আসছে, হাসি মস্করা করছে কাপ্তানি করছে, সুযোগ বুঝে হিন্দু মেয়েদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করার চেষ্টা করছে, ব্যর্থ হলে কটু মন্তব্য করছে বা অন্যভাবে উত্যক্ত

করছে। হিন্দুরা এর কোন প্রতিবাদ তো করেই না বরং অনেক সময় হিন্দুরা প্রশ্রয় দেয়। বছর তিনেক আগে ঈদের দিন তিনটি মুসলিম যুবক নতুন পাজামা পাঞ্জাবী, মাথায় সাদা টুপি পরে একটি মোটর বাইক চালিয়ে হিন্দু পাড়ায় কাপ্তানি করল। ওই বছরই জগদ্ধাত্রী পূজার সময় বড় বাজার পূজা প্যাণ্ডেলের কাছে এক দোকানদারের সঙ্গে প্রচণ্ড বাদানুবাদে লিপ্ত হল, মারামারি হওয়ার উপক্রম। অর্থাৎ এরা কোন কিছুকেই পরোয়া করছে না। কারণ এরা ভালমতই বুঝে গেছে দেশের রাজনৈতিক দলগুলি মুসলিম ভোটের লোভে এদের চাটুকারিতা করছে, এদের পদলেহন করছে। থানা, পুলিশ, প্রশাসন এদের হুকুমেই চলে। আর হিন্দুরা তো ভীতু, কাপুরুষ, লড়াই করতে ভয় পায়। তাহলে ভয় কিসের?

এদেশে বাংলাদেশীরা যেমন ভিসা পাশপোর্ট ছাড়াই দলে দলে ঢুকছে এবং বহাল তবিয়তে বসবাস করছে, তেমনই পঞ্চায়েত, পুরসভা, পুলিশ প্রশাসন সর্বত্র তাদের সংখ্যা বাড়ছে। সরকার থেকে বেআইনি মাদ্রাসাগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শপথ নেওয়ার সাত দিনের মধ্যে ১০ হাজার বেআইনি মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দিলেন। এতে সরকারী অনুদান পাওয়া যাবে ঠিকই, তবে অতি দরিদ্র, শিক্ষার আলোক বর্জিত মুসলিম সমাজের কি উন্নতি হবে বোঝা যাচ্ছে না। তবে প্রাচীনপন্থী ধর্মান্ধ অর্ধশিক্ষিত কিছু মাওলানা মৌলবি সরকার থেকে বেতন, ভাতা ইত্যাদি সুবিধা পাবে। কলকাতায় আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হয়েছে। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর আপত্তি সত্ত্বেও কয়েকশ ধর্মান্ধ গোঁড়া জেহাদী মনোভাবাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীর দাবী অনুযায়ী আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মাদ্রাসা কথাটি যুক্ত করে হল আলিয়া মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়। যতোটা জানা আছে মাদ্রাসা কথাটির অর্থ শিক্ষালয় বা বিদ্যালয়। তাহলে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মাদ্রাসা কথাটি যুক্ত করার স্বার্থকতা কোথায়? একমাত্র স্বার্থকতা এটি যে সরকারীভাবে স্বীকৃত একটি ইসলামিক প্রতিষ্ঠান সেটি জাহির করা। এছাড়া এর অন্য কোনো অর্থ নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে মুর্শিদাবাদে আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির ধাঁচে একটি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হবে। প্রশ্ন আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির ধাঁচে কেন? কলকাতা, যাদবপুর, শিবপুর প্রখ্যাত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাঁচে নয় কেন? উদ্দেশ্য ধীরে ধীরে পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত প্রতিষ্ঠান, ভবন, রাস্তা, পার্ক সবকিছুর ইসলামিকরণ। কারণ পশ্চিমবঙ্গ তো বৃহত্তর বাংলাদেশের অঙ্গীভূত হতে চলেছে। তাই আগে থেকেই কিছু কিছু এগিয়ে রাখার প্রক্রিয়া। অবশ্য কলকাতার বিভিন্ন স্থানের ইসলামিক নামকরণের প্রক্রিয়া বহুদিন আগেই শুরু হয়ে গেছে। যেমন চাঁদনিচক মেট্রো স্টেশনের নাম টিপু সুলতান করা হচ্ছে। কে এই টিপু সুলতান? প্রায় আটশো হিন্দু মন্দির ধ্বংসকারী টিপু সুলতানের প্রধান কাজ ছিল সহস্র সহস্র হিন্দুকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা অথবা হত্যা করা। তাঁর আরও একটা কাজ ছিল হিন্দু রমণীদের বন্দি করে নিজের সৈন্য দলের কাছে পাঠিয়ে দিতেন তাদের যৌন লালসা নিবৃত্তির জন্য। এমন একজন মহৎ প্রাণ সুলতানের নামে চাঁদনিচক মেট্রো স্টেশন উৎসর্গ করা হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী ঘোষণা করেছেন বালীগঞ্জ রেল স্টেশনের নাম স্বাধীনতা সংগ্রামী বাহাদুর শাহ জাফরের নামে হবে। বালীগঞ্জ রেল স্টেশন থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে রয়েছে শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ মহারাজ প্রতিষ্ঠিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। সেখানেই রয়েছে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জাদুকর পি সি সরকারের বাসভবন। তাঁদের নাম বিবেচনা করা হলো না। বাহাদুর শাহ জাফর কবে কোথায় স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছেন কেউ প্রশ্ন করে না। ১৮৫৭ সালে সিপাহী

বিদ্রোহের সময় মুসলমান সিপাইরা চেয়েছিল ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটিয়ে মুসলিম শাসনের প্রবর্তন ঘটাতে। তাই তারা শেষ মোঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে তখ্ত-এ আসীন করেছিল। বাহাদুর শাহ-এর অবদান এই টুকুই। ইতিমধ্যেই ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের নামকরণ হয়েছে মির্জা গালিব স্ট্রীট, ওয়েলেসলি স্ট্রীট হয়েছে, রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড, রিপণ স্ট্রীট হয়েছে মুজফ্ফর আহমেদ স্ট্রীট। এবার নাকি সল্ট লেক সিটির বিভিন্ন রাস্তার নামকরণ হবে। কলকাতা শহরেরও নতুন নাম হতে পারে। রয়েছে ফোর্ট উইলিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সহ আরও অনেক কিছু। কলকাতাকে লন্ডন বানাতে এগুলি খুবই কার্যকরী হবে।

স্বাধীনতার আগে দেশভাগের সময় স্থির হয়েছিল অখণ্ড বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে। এতে আপত্তি ছিল না তৎকালীন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতাদের। কিন্তু রুখে দাড়িয়েছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্তানের কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। তাই তিনি পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা। অথচ সরকারিভাবে পশ্চিমবঙ্গে তিনি উপেক্ষিত। যে সব রাজনৈতিক নেতা পশ্চিমবঙ্গে মন্ত্রীত্ব করছেন তাঁরা একবার চিন্তা করেও দেখেন না সেদিন পশ্চিমবঙ্গ রক্ষা না পেলে এরা কোথায় মন্ত্রীত্ব করতেন, কোথায় রাজনৈতিক ক্ষমতার স্বাদ উপভোগ করতেন। আজ নেই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মত কোন নেতৃত্ব। তাই পশ্চিমবঙ্গ ক্রমে ক্রমে মুসলমানদের করাল গ্রাসে চলে যাচ্ছে। গ্রামে গঞ্জে সর্বত্র মুসলমানরা আধিপত্য বিস্তার করছে। পশ্চিমবঙ্গের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে হিন্দুরা লুপ্তপ্রায় প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে। কারণ সেখানে হিন্দুদের কোন নিরাপত্তা নেই। চুরি, ডাকাতি, খুন, অপহরণ, ধর্ষণ সেখানকার নিত্তনৈমিতিক ঘটনা।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় মুসলমানরা যখন সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করছে, বিভিন্ন অঞ্চলে যখন মিনি পাকিস্তান গড়ে উঠছে, হিন্দুরা এই পশ্চিমবঙ্গেই যখন মুসলমানদের দ্বারা নানা ভাবে উৎপীড়িত হচ্ছে নিপীড়িত হচ্ছে তখন পশ্চিমবঙ্গবাসী হিন্দুরা এ বিষয়ে কি চিন্তা ভাবনা করছেন? না, তারা এ বিষয়ে কোন কিছু ভাবছেন না কোন কিছু চিন্তা করছেন না। হিন্দু বাড়ীতে চুরি হচ্ছে, ডাকাতি হচ্ছে, হিন্দু তরুণী অপহৃতা এবং ধর্ষিতা হচ্ছে? ওগুলে দুর্বত্তদের কাজ। এরজন্য সমস্ত মুসলিম সমাজকে দায়ী করা উচিত হবে না। তাছাড়া দেশে, পুলিশ আছে প্রশাসন আছে। এসব তারাই দেখভাল করছে, তারাই ব্যবস্থা নিচ্ছে। যথার্থই। তবে পুলিশ ও প্রশাসন কি ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছে তা পূর্বোল্লিখিত কিছু কিছু ঘটনায় প্রকাশ পেয়েছে। কলকাতায় বড় বাজার অঞ্চলে মুসলমানরা ১৪৪ ধারা অমান্য করে রাস্তা অবরোধ করে নামাজ পড়লে পুলিশ কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু মুসমানরা স্থান ত্যাগ করলেই পুলিশ সক্রিয় হয়ে স্থানীয় হিন্দুদের লাঠিপেটা করে এ্যারেস্ট করে, মুসলমানদের আপত্তির কারণে পুলিশ হিন্দুর বাড়ীতে এসে বজংরংবলীজীর মূর্তি অপসারণ করতে চায়, হিন্দু কিশোরী ছাত্রী মুসলমান দুর্বৃত্তদের দ্বারা অপহৃতা এবং ধর্ষিতা হলে থানা কোন অভিযোগ নেয় না, প্রকাশ্যে গরু জবাই হচ্ছে পুলিশকে জানালেও পুলিশ নিষ্কৃত থাকে। অনেক সময় হিন্দু পুলিশ স্থানটি ঘিরে রাখে যাতে হিন্দুরা এসে কোন গণ্ডগোল পাকাতে না পারে। আরও ২/১টি উদাহরণ অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয় না।

(১) বাসন্তীর রানীগড়ে লক্ষ্মী প্রতিমার মাথা কাটা হল : ২০১০ সালের অক্টোবর বাসন্তী থানার অন্তর্গত জ্যোতিষপুর বাজারের ৩২ বছরের পুরনো দুর্গাপুজোর স্থান

রাধাকৃষ্ণ মন্দির প্রাঙ্গনে হঠাৎ করে ঈদ মিলন অনুষ্ঠানের দাবী জানাল স্থানীয় কিছু মুসলমান। স্বভাবতই এর ফলে একটা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে, এই আশঙ্কায় হিন্দুরা এই অন্যায্য দাবী মেনে নিতে পারে নি। গত ২১ অক্টোবর যখন হিন্দুদের প্রভাত সংকীর্তন চলছিল তখন কিছু শান্তিভঙ্গকারী মুসলিম এসে হুমকি দেয় এই সংকীর্তন বন্ধ করতে হবে। এর ফলে পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে ওঠে। ২২ তারিখ ছিল কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো। মণ্ডপে রাত ২টো পর্যন্ত আয়োজকরা পূজা এবং কাজ কর্ম সেরে বাড়ী চলে যায়। ঢাকী এবং একজন আয়োজক মণ্ডপেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকালে ঘুম ভাঙতে তারা দেখে যে লক্ষ্মীপ্রতিমার মাথা ও হাত কে বা কারা কেটে নিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর হিন্দু সেখানে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। বিক্ষুব্ধ হিন্দুরা বাজার অবরোধ করে। পুলিশ এসে যায়। কিন্তু অপরাধীকে গ্রেপ্তার না করলে হিন্দুরা অবরোধ তুলবে না বলে দেয়। উত্তেজনা চরমে ওঠে। আসেন রাজ্যের মন্ত্রী ও এলাকার বিধায়ক সুভাষ নস্কর। হিন্দুরা তাকেও ঘেরাও করে রাখে। বিক্ষুব্ধ হিন্দুদের চাপে মন্ত্রী মহাশয় বাধ্য হয়ে মাইকে ঘোষণা করেন যে উক্ত স্থানে কোনভাবেই ঈদ মিলন অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া হবে না এবং অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। তখন হিন্দুরা তাকে যেতে দেয়। পুলিশও প্রতিশ্রুতি দেয় অবিলম্বে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা হবে। হিন্দুরা জানিয়ে দেয় অপরাধী গ্রেপ্তার না হলে তারা ওই ভাঙা মূর্তি বিসর্জন দেবে না। কিন্তু এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার পরই মন্ত্রী সুভাষ নস্করের আচরণ পাল্টে যায়। ২৩শে অক্টোবর রাত্রি ১২টার সময় পুলিশ ও র‍্যাফ জোর করে পূজা আয়োজকদের দিয়ে ওই ভাঙা মূর্তি বিসর্জন করিয়ে দেয়। সমবেত হিন্দুরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে পুলিশকে বাধা দেয়। তাতে পুলিশ বনমালী দলুই নামে একজনকে গ্রেপ্তার করে ও আরও ৬ জনের নামে কেস্ দেয়। অথচ মূল দুষ্কৃতীরা কেউই গ্রেপ্তার হয় না। স্থানীয় আর এস পি কর্মীরা মন্ত্রীকে ফোন করলে মন্ত্রী বলেন তিনি কিছু করতে পারবেন না। আইন তার নিজের পথে চলবে।

(স্বদেশ সংহতি সংবাদ নভেম্বর ২০১০)

(২) সাগর সঙ্গমে মুসলিম মৌলবাদ : সম্পূর্ণ হিন্দু অধ্যুষিত গঙ্গাসাগরে রুদ্রনগর, বাজারে হিন্দুর জমিতে মুসলিম মাদ্রাসা, এতিমখানা ও মসজিদ নির্মাণের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিতে হিন্দুরা জোট বেঁধেছিল। বিতর্কিত জমির মালিক নির্মল মণ্ডল বর্ষাকালীন চাষের জমিতে পাওয়ার টিলার নামালে মুসলিম প্ররোচনায় পুলিশ ওই পাওয়ার টিলার তুলে নিয়ে যায়। পরে নির্মল মণ্ডল মামলার মাধ্যমে পাওয়ার টিলারসহ জমিতে চাষের অধিকার ফিরে পান। এতে ওই বিতর্কিত স্থানে হিন্দুর অধিকার সাব্যস্ত হয়। তবুও গোপনে মুসলমানরা ওই জায়গার অধিকার লাভ এবং ওই জায়গাতেই স্থানীয় অহল্যা ক্লাবের দুর্গাপুজো আটকানোর মতলব আঁটতে থাকে। রমজান মাসের শুরুতেই হঠাৎ দেখা গেল অহল্যা ক্লাবের অদূরেই রুদ্রনগর বাজারে একটি স্থানে মুসলমানরা ইফ্‌তারের পর নামাজ পড়তে শুরু করে। আশ্চর্যের বিষয়। রুদ্রনগর বাজারে স্থানীয় কোন মুসলমান না থাকলেও পার্শ্ববর্তী খানসামাবাদ কমলপুর, সাগর কলোনীর বহিরাগত মুসলমানরা ওই স্থানে নামাজ পড়তে এসেছিল। এই ঘটনায় সচকিত হিন্দু ব্যবসায়ীরা থানায় অভিযোগ জানালে থানা থেকে বলা হয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে এই নামাজ পড়তে দেওয়া হোক যাতে অহল্যা ক্লাবের আসন্ন দুর্গাপূজার কোন অসুবিধা না হয়। স্থানীয় হিন্দুরা এই যুক্তি মানতে চান নি এবং জমির মালিক নির্মলবাবুর প্রকাশ্যে মুসলমানদের এই অন্যায় আবদারের প্রতিবাদ করেন।

গত ১লা সেপ্টেম্বর ২০১০ সকাল ৭-৩০ মিনিট নাগাদ ৩-৪ জন মুসলিম দুষ্কৃতী নির্মলবাবুকে বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে পেটাতে থাকে। নির্মলবাবুর চিৎকারে স্থানীয় হিন্দুরা জড়ো হয়ে ওই মুসলমানদের পাল্টা মার দেয়। মুসলমানদের ছেড়ে দিলে তারা নিজেদের এলাকায় গিয়ে অপপ্রচার করে উত্তেজিত করে, ফলস্বরূপ দুপুর ১-৩০ মিনিট নাগাদ বাজার যখন খালি তখন ৫-৬টি বাইকে করে ১৫-২০ জন মুসলিম যুবক ধারালো অস্ত্রশস্ত্র এবং বোমার বস্তা নিয়ে এলাকায় হাজির হয়। অহল্যা ক্লাবের কাছে তারা তিনটি বোমা চার্জ করে সবাইকে সরে যাওয়ার হুমকি দেয়। কিন্তু প্রায় ৪০০ জন হিন্দু ওই বাইকগুলি ঘিরে ফেলে। কিন্তু ওই সময় থানা থেকে পুলিশ এসে যায় আর হিন্দুদের নিরস্ত করে যাতে উপস্থিত জনতার কোন ক্ষতি না হয়। সুযোগ বুঝে ওই বাইক বাহিনী পালিয়ে যায়। পুলিশের সামনে থেকে মুসলিম দুষ্কৃতীদের পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় হিন্দু জনতা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবী জানায়। এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জনতা লাঠি সোটা নিয়ে রুদ্রনগর এলাকার রাস্তায় নেমে পড়ে গাড়ী ঘোড়া বন্ধ করে দেয় এবং কোন কারণেই মুসলমানদের ঢুকতে দেবে না বলে তৎপরতা শুরু করে। ঘটনার তীব্রতা বুঝে কাকদ্বীপের S.D.P.O এবং O.C. অকুস্থলে পৌছান এবং হিন্দু স্বার্থরক্ষাকারী নেতা এবং অহল্যা ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। পরে যে জায়গায় নামাজ পড়া হচ্ছিল সেখানে একটি তুলসী মঞ্চ ও দুর্গা ঠাকুরের কাঠামো স্থাপন করা হয়। পুলিশ অহল্যা ক্লাবের চারদিকে ২০০ মিঃ এলাকা পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি করে।

মুসলিম দুষ্কৃতীদের আক্রমণে গুরুতর আহত নির্মল মণ্ডল সাগর থানায় ডায়েরি করেছেন (জি ডি নং ২৮ তাং ১.৯.২০১০) যে ছয়জন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করা হবে বলে পুলিশ প্রশাসন জানিয়েছিল তারা হল সেখ সাইফুল, সেখ ফরিদ, সেখ মসিবুল, সেখ সামসুল, সেখ ফরাদ ও সেখ সাইবুল। প্রায় হাজার চারেক হিন্দু সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ করে এবং প্রতিকরে নামে। তাই পুলিশ বাধ্য হয় তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নিতে। রাজনীতি নির্বিশেষে মুসলিম নেতারা তলে তলে গঙ্গাসাগরের মত গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থানেরও ইসলামিকরণ ঘটাতে জোট বেঁধেছে। গত কয়েক বছরে গঙ্গাসাগরে, জমায়াতে ইসলাম-ই হিন্দ, জামায়েত উলেমা, মুসলিম লীগ, পিডিসিআই ও কোরান প্রচার কেন্দ্রের কাজকর্ম খুব বেড়ে গেছে।

(স্বদেশ সংহতি সংবাদ সেপ্টেম্বর ২০১০)

(৩) বাগনানে পাড়ায় পাড়ায় রাজনৈতিক মদতে জেহাদি কর্মসূচী : হাওড়া জেলার বাগনানে সাম্প্রতিককালে রাজনৈতিক দলগুলির প্রশ্রয় ও মদতে মুসলিম যুব সম্প্রদায়ের এক অদ্ভুত মানসিকতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সেটি হল হিন্দুদের সাথে পায়ে পা তুলে ঝগড়া বাধিয়ে মুসলিম সমাজের সর্ববিষয়ে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় উন্মত্ত আচরণ। এই রকম ঘটনা বাগনানে একের পর এক ঘটেই চলেছে। গত ১লা সেপ্টেম্বর ২০১০ বাগনান কলেজের কাছে চিলড্রেন্স ক্লাবের ঘটনা সেই কথা প্রমাণ করে। ওই ক্লাবের সভাপতি বাগনান যুব কংগ্রেসের সভাপতি সফিকুল ইসলাম। এর ভয়ে বাগনান কলেজের হিন্দু মেয়েরা সদা সর্বদা সন্ত্রস্ত। কলেজে বহুবার মারপিটের ঘটনায় সফিকুল জড়িত থেকে একদিকে সন্ত্রাস ও অন্যদিকে ওই এলাকায় ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। ১লা সেপ্টেম্বরের আগে কয়েকদিন ধরে কয়েকটি হিন্দু ছেলেকে মারধর ও দেখে নেবার হুমকি দেওয়া শুরু করে। তারই জেরে গত ১লা সেপ্টেম্বর ওদেরকে ভীষণভাবে প্রহার করে। সেদিন কোনরকমে একটি হিন্দু ছেলে পালিয়ে এসে সরস্বতী আশ্রমে জন্মাষ্টমীর পূজার আয়োজনে ব্যস্ত হিন্দু সংহতির সদস্যদের

খবর দেয়। এরপর হিন্দু সংহতির ৪০-৫০ জন সদস্য একযোগে চিলড্রেন্স ক্লাবের দিকে রওনা হয়। পথে বাগনান স্টেশনের ওভারব্রীজে সফিকুলের ২-১ জন সাগরেদকে দেখতে পেয়ে মারধর করে। শেষে ওই ক্লাবে পৌঁছে মুসলিম অত্যাচারের প্রতিবাদে ক্লাবে ভাঙচুর করে ও স্থানীয় অত্যাচারী মুসলিমদের সন্ধানে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। এই ঘটনা স্থানীয় হিন্দুদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

আর একটি ঘটনা মুরালীবাড়ে। গত ২৯ সেপ্টেম্বর বাস রাস্তার পাশে প্রকাশ্য স্থানে খাদিনান খাঁ পাড়ার দুজন মুসলিম ছেলে বসে মদ খাচ্ছিল। স্থানীয় মানুষ ও পথচারীদের প্রতিবাদে তারা তখনকার মত চলে যায়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মুর্শিদ আলি খাঁর নেতৃত্বে দুজন মোটর বাইকে চেপে সেখানে ফিরে আসে। তাদের একজনের হাতে সোর্ড ও অন্যজনের হাতে রামদা। অস্ত্র ঘোরাতে ঘোরাতে তারা স্থানীয় মানুষদের ভয় দেখিয়ে বলতে থাকে আমাদের সঙ্গে লাগা এবার কচুকাটা করব। রায়ট বাধিয়ে ছাড়ব। ইতিমধ্যে মদ খাওয়ার বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদকারী হিন্দু যুবকটিকে দেখতে পেয়ে ওরা সোর্ড ও রামদা নিয়ে তার দিকে তেড়ে যায়। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রচুর হিন্দু যুবকের তাড়া খেয়ে মুর্শিদ মোটর বাইক ফেলে পালিয়ে যায়। অন্য জন ধরা পড়ে। তাকে স্থানীয় ইলেকট্রিক পোস্টে বেঁধে গণপ্রহার চলতে থাকলে পুলিশ এসে ওই দুষ্কৃতী ও মোটর বাইক নিয়ে থানায় চলে যায়। এবার মুসলিম যুবকেরা ছুটে যায় স্থানীয় বিধানসভা সদস্য আক্কেল আলির কাছে। বিধায়ক থানায় ছুটে আসে এবং মুসলিম দুষ্কৃতীকে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। সোর্ড ও রামদা নিয়ে আক্রমণ করলেও যেহেতু দুষ্কৃতী মুসলিম তাই এদের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অপরাধেও কোন কেস্ করতে পারল না বাগনান থানার পুলিশ। কি অদ্ভুত বিচার ব্যবস্থায় আমাদের বাস।

(৪) সাঁকরাইল বিডিওকে ডেপুটেশন : হাওড়া জেলার সাঁকরাইল ব্লকে হিন্দুদের ভাগ্যে শান্তি নেই। দক্ষিণ সাঁকরাইল পালপাড়ায় বকরি ঈদের দিন অবৈধ গোহত্যা রুখতে গিয়ে মুসলিম দুষ্কৃতীর তরবারির আঘাতে আহত হল বিট্টু পাল। হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে তাকে ৭দিন থাকতে হল। পুলিশের সামনেই এই হামলা হয়েছিল, তাও পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করল না। তারপর পূর্ব পাড়ায় গত ৯ নভেম্বর ২০১০ একটি মুসলিম ছিনতাইকারী এক হিন্দু মহিলার গলা থেকে হার ছিনিয়ে নিয়েছিল। জনতা তাকে ধরে পেটায়। এতে পুলিশ ১৪জন হিন্দুর নামে কেস্ দেয়। এখন পুলিশ হিন্দুদের বাড়ী বাড়ী রেইড করছে। তারা বাড়ী ছাড়া। ওখানেই টাইগার ক্লাবের মুসলমান ছেলেদের অত্যাচারে হিন্দু নারীর সম্মান বিপন্ন। অথচ পুলিশ হিন্দুদের বাড়ীতে গিয়েই অত্যাচার করছে।

(৫) চাপড়ায় চক্রান্ত : নদীয়া জেলার বাংলাদেশ সীমান্তে চাপড়া থানার অন্তর্গত আলফা গ্রাম পঞ্চায়েত একেবারে সীমান্তের পাশে। এই অঞ্চলের আলফা গ্রামে ঢোকার পথে সন্ধ্যাবেলা ছিনতাই নিয়মিত ঘটনা। এই নিয়ে প্রায়ই অশান্তি লেগে থাকে। গত ৬ মার্চ সন্ধ্যা ৮-৩০ মিঃ-এ দুটি মোটর বাইকের লাইট মারা নিয়ে এক সামান্য ঝগড়া অতি দ্রুত সাম্প্রদায়িক রূপ নেয়। সেই সময় ওইখান দিয়ে ফিরছিল বাবলু ঘোষ সাইকেলে চেপে। সে গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়ে এবং মুসলমানরা তাকে মারতে মারতে মুসলমান পাড়ায় নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে। এলাকাটিতে হিন্দু মুসলমান অনুপাত ২০:৮০ হলেও হিন্দুদের মধ্যে লড়াকু ঘোষেদের সংখ্যাই বেশী। তাই বাবলু ঘোষের অপহরণের খবর পেয়েই হিন্দুরা একজোট হয়ে সশস্ত্রভাবে ওই মুসলমান পাড়ায় গিয়ে বাবলু ঘোষকে উদ্ধার

করে নিয়ে আসে। আর কিছু দেরী হলে বাবলু ঘোষকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া যেত না। কিন্তু তাকে উদ্ধার করে আনার অতি অল্প সময়ের মধ্যে কয়েকশো মুসলমান এসে ওই হিন্দু গ্রাম আক্রমণ করে। হিন্দুরা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে তবে বাবু ঘোষ ও পদা ঘোষ নামে দুজন হিন্দু, মুসলমানদের হাতে প্রচণ্ড মার খায়। জানা গেছে যে পার্শ্ববর্তী বেতবেড়িয়া, ব্রহ্মনগর, ডোমপুকুর ও ভাটিগাছি গ্রাম থেকে মুসলিম দুষ্কৃতীরা এই হামলায় অংশগ্রহণ করেছিল। স্থানীয়দের অভিযোগ আলফা অঞ্চল প্রধান সেখ গোলাম হালসানা এবং তার ভাই অজিত হালসানা এই দুষ্কৃতীদের মধ্যে ছিল। কিন্তু স্থানীয় হিন্দুদের কাছে আজও রহস্য— এত তাড়াতাড়ি কি করে আশপাশের গ্রাম থেকে এত মুসলমান একত্রিত হল। তাহলে কি আগে থেকেই কোন ষড়যন্ত্রের ছক কষা ছিল? গ্রামবাসীদের একথা মনে হওয়ার কারণ আছে। আলফা গ্রামের মত পাশের হৃদয়পুর গ্রামও হিন্দুপ্রধান। আশপাশের ৫টি অঞ্চলের মধ্যে এই আলফা এবং হৃদয়পুর গ্রাম দুটি মুসলিম আধিপত্যকে কিছুটা ঠেকিয়ে রেখেছে। এই দুটি গ্রাম হিন্দুশূন্য করে দিতে পারলে এই চাপড়া ব্লক আর পাশের বাংলাদেশের মধ্যে কোন তফাৎ থাকবে না। এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য গত ২০১০-এর সেপ্টেম্বর মাসে হৃদয়পুর গ্রামে হিন্দুদের মাথা তেঁতুল মণ্ডলকে খুন করে তার লাশ গায়েব করে ফেলা হয়। হিন্দুদের প্রচণ্ড আন্দোলনের ফলে কয়েকজন দুষ্কৃতী গ্রেপ্তার হয় এবং ডোমপুকুর গ্রাম থেকে লাশ উদ্ধার হয়। হিন্দুরা ভাবছে হৃদয়পুর-এর পর এবার আলফা গ্রামের পালা।

(৬) সাঁকরাইল হাওয়াপোতা গ্রাম : সাঁকরাইলের হাওয়াপোতা গ্রামে গরীব হিন্দুদের বসবাস। রাস্তার পাশের এক শিব মন্দিরে বহু বছর ধরে তারা পুজো করে আসছে। গত এক বছর ধরে ওই গরীব মানুষেরা নিজেদের শ্রমের পয়সা জমিয়ে একটা ফান্ড তৈরি করে এবং সেই ফাণ্ডের টাকা দিয়ে ছোট মন্দিরটা পাকা করার জন্য ইট সিমেন্ট দিয়ে কাজ,শুরু করেছিল। কারও মনে কোন আশঙ্কা ছিল না যে এই কাজে কোন বাধা আসতে পারে। কারণ দীর্ঘদিন ধরেই তারা ওখানে পূজা-আর্চা করে আসছে। গত ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১১ সকাল ১০টা নাগাদ গ্রামের পুরুষরা যখন কেউই গ্রামে ছিল না, রাজমিস্ত্রীরা মন্দির নির্মাণের কাজ করছিল তখন সেখ বুলগান, জাহাঙ্গীর ও সেখ লালটুর নেতৃত্বে ৩০০ জন মুসলমান এসে লাথি মেরে ওই নির্মীয়মান মন্দিরটি ভাঙ্গতে লাগল। হিন্দু মহিলারা ছুটে এল কিন্তু তাদের প্রতিবাদে কান না দিয়ে তাদেরকে অকথ্য গালাগাল দিতে দিতে গোটা মন্দিরটাই ভেঙ্গে দিল। হিন্দুরা পুলিশকে খবর দিল। পুলিশ তাড়াতাড়িই এল। কিন্তু পুলিশদলের নেতৃত্বে ছিল এক মুসলিম অফিসার। পুলিশ দুষ্কৃতীদের কাজে বাধা না দিয়ে হিন্দুদের সরে যেতে বলল এবং মন্দিরে হিন্দুদের যাওয়া বন্ধ করে দিল। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে হিন্দুরা জড়ো হয়েছে। পুলিশ তাদের কথায় কান না দেওয়ায় তারা সাঁকরাইল চাঁপাতলা রোড অবরোধ করল। এতে প্রশাসন আরও ক্ষেপে গেল। সন্ধ্যাবেলা ওই অবরোধ ভাঙতে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে হিন্দুদের ওপর প্রচণ্ড লাঠিচার্জ করল। প্রায় ১০০ হিন্দু আহত হল। তার মধ্যে সিপিএম নেতা রবি জানার অবস্থা গুরুতর। পুলিশ রবি জানা, অরুণ কর্মকার ও বিশ্বজিৎ চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করল। রবি জানাকে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে ডাক্তারকে চাপ দিয়ে, সুস্থ সার্টিফিকেট দিতে বাধ্য করল। হিন্দুদের মন্দিরতো ভাঙলোই, তার ওপর পুলিশ ওই মন্দিরে সন্ধ্যা প্রদীপ দিতেও হিন্দুদের নিষেধ করে দিল।

এ ধরনের শত শত ঘটনা ঘটে চলেছে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গে। হয়ত বা অসম, ত্রিপুরা, বিহার সহ ভারতের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যেও। উল্লেখিত ঘটনাবলী থেকে কি মনে হয় ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, না বাংলাদেশ, পাকিস্তানের মত কোন ইসলামিক রাষ্ট্র? পাকিস্তানে, বাংলাদেশে হিন্দুরা যেভাবে উৎপীড়িত হচ্ছে, নিগৃহীত হচ্ছে মুসলমানদের দ্বারা, পশ্চিমবঙ্গে ঠিক তাই ঘটে চলেছে। ইসলামিক রাষ্ট্র বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের বিষয়ে মুসলমান দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসন কোন ব্যবস্থ্য নেয় না, সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রয় থাকে। শুধুমাত্র এই নয়। মুসলমান দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তো পুলিশ নেয়ই না, উপরন্তু উল্টো চাপ দিয়ে অভিযোগকারী হিন্দুকে লক্ আপ-এ ভরে। পরে উপযুক্ত নজরানা পেলে সতর্ক করে ছেড়ে দেয়। পশ্চিমবঙ্গেও ঠিক একই ধরনের ঘটনা ঘটে চলেছে বহুদিন ধরে। মুসলমান দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হলে পুলিশ নিষ্ক্রয় থাকে আর হিন্দুদের ওপর লাঠি চার্জ করে এ্যারেস্ট করে আর কেস দেয়। তারপর ৬ মাস কি ১ বছর ধরে আদালতের হ্যাপা সামলানো।

আসলে হিন্দুরা নিরীহ, শান্তি প্রিয় এবং অবশ্যই ভীতু। তাই তারা লড়াই বা "ঝুট্ ঝামেলা" যতটা সম্ভব এড়িয়ে থাকতে চায়। এই কারণে তারা সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে না। আর এই সুযোগটা কাজে লাগায় মুসলমানরা। মসজিদে মসজিদে মাইক লাগানোর আসল উদ্দেশ্য প্রয়োজনে আহ্বান জানানো হলে মুসলমানরা যাতে তৎক্ষণাৎ অস্ত্র সমেত হাজির হতে পারে, লড়াইতে অংশগ্রহণে, কাফের নিধনে। আর মসজিদে মসজিদে খুৎবা পাঠের আড়ালে মাওলানা সাহেবরা মুসলমানদের আসল উদ্দেশ্য সর্ম্পকে মুসলমানদের অবহিত করে থাকেন। উল্লেখিত ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কিভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ২-৩ হাজার মুসলমান একত্রিত হয়ে যায়। আর হিন্দুরা? "সাজতে গুজতে ফিঙে রাজা।" তৈরি হতে হতেই মুসলমানরা কাজ হাসিল করে ফেলে আর পুলিশ এসে হিন্দুদেরই পেটাতে পেটাতে ধরে নিয়ে যায়। তারপর উকিল ঠিক কর, জামিনের ব্যবস্থা কর আর নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ কর।

এ বিষয়ে হিন্দুদের উদাসীনতা বা নিস্পৃহতার মূল কারণ 'হিন্দুদের সর্বধর্মসমভাব'। হিন্দুত্ব বলছে (১) বসুধৈব কুটুম্বকম অর্থাৎ পৃথিবীর সকলেই একে অন্যের আত্মীয় (২) শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতসঃ পুত্রাঃ, অর্থাৎ বিশ্বের সব মানুষই অমৃতের সন্তান (৩) সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ, সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ ভবেৎ অর্থাৎ জগতে সকলে সুখে থাকুক, সকলে রোগমুক্ত হোক, সকলের জীবন আনন্দে ভরপুর হোক, কেউ যেন দুঃখে না থাকে। এ সমস্ত ছাড়া আছে মহাপুরুষদের বাণী— (১) সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। (২) জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। (৩) যত মত তত পথ; অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর লাভ সম্ভব। এই সমস্ত ধর্ম বিশ্বাস এবং উপদেশের কারণে হিন্দুরা পরিণত হয়েছে নিরীহ, যুদ্ধ বিমুখ, শান্তিপ্রিয় এবং দুর্বল এক জাতিতে। হিন্দু যে অন্যের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে, অত্যাচারিত হতে পারে আর আক্রান্ত হলে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলে প্রতি আক্রমণে যেতে হয় এ বোধ হিন্দুদের নেই। তাই আক্রান্ত হওয়া, অত্যাচারিত হওয়া এবং ক্রন্দন, হিন্দুদের বিধিলিপি। হিন্দুদের আর এক অপরাধ অনৈক্য। হিন্দুরা দলবদ্ধভাবে, সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না, বা প্রতি আক্রমণে যেতে পারে না। অতীতের ঘটনাবলী পর্যালোচনা

করলে দেখা যায় হিন্দুরা যখনই সংগঠিত হয়েছে এবং দলবদ্ধভাবে শত্রুর মোকাবিলা করেছে শত্রুকে প্রতি আক্রমণ করেছে তখনই শত্রু পরাস্ত হয়েছে, নতিস্বীকার করেছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৪৬ সালের Great Calcutta Killings-এর। তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দী ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করেন। মুসলিম লীগের নেতৃত্বে কলকাতা গড়ের মাঠে এক বিরাট জনসভা হয়। সেই সভায় হাওড়া এবং কলকাতার মুসলমানরা সশস্ত্র হয়ে যোগ দেয়। পাকিস্তানের দাবীর সমর্থনে মুসলিমলীগ নেতা সুরাবর্দী এবং নাজিমুদ্দীন উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করেন এবং "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান"-এর আওয়াজ তোলেন। উত্তেজিত সশস্ত্র মুসলমানরা সারা কলকাতায় হত্যার তাণ্ডবলীলা শুরু করে দেয়। হত্যা, লুঠ, ভাঙচুর, নারী অপহরণ, ধর্ষণ কোন কিছুই বাদ ছিল না। প্রস্তুতি না থাকায় প্রথম দুদিন ১৬ এবং ১৭ আগস্ট হিন্দুরা একতরফা মার খায়। পরে হিন্দুরা যখন সংঘটিত হয়ে হিন্দু ও শিখেরা যৌথভাবে প্রতিরোধ নামে তখন মুসলমানরা কচুকাটা হতে থাকে। প্রথম দুদিন সুবারর্দি পুলিশ ও মিলিটারিকে নিষ্ক্রয় রেখেছিল। কিন্তু এখন মুসলমানদের কচুকাটা হতে দেখে আর স্থির থাকতে না পেরে পুলিশ ও মিলিটারিকে দাঙ্গা থামাতে আদেশ দেন। সে সময় তাকে স্বগতোক্তি করতে শোনা গিয়েছিল "নিরীহ মুসলমান ভাইরা আমার"। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে হিন্দুরা যখনই সঙ্ঘবদ্ধভাবে মুসলমানদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে তখনই মুসলমানদের পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছে। অথচ হিন্দুরা এটা মনে রাখা এবং সেজন্য প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন মনে করে না। তাই বারবার তাদের ধন, মান, জান নিয়ে মুসলমানরা ছিনিমিনি খেলতে সাহস পেয়েছে। অতীতেও সেই একই ঘটনা ঘটেছে বারংবার। ৭১১খৃঃ মহঃ বিন কাশিম-এর ভারত আক্রমণ থেকে শুরু করে মুসলমান আক্রমণকারীরা বারবার ভারত আক্রমণ করেছে, জনপদ ধ্বংস করে, সহস্র সহস্র হিন্দু নরনারীকে বন্দী করে হত্যার তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে, নৃশংস অত্যাচার করেছে, দেবালয় ধ্বংস করে বিগ্রহ কলুষিত করেছে অথচ হিন্দুরা কোন শিক্ষা নেয় নি। হিন্দু রাজারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে মুসলিম আক্রমণ প্রতিহত করতে কোন চেষ্টাই করেনি। ফলশ্রুতি ৭০০ বছর বিদেশী শাসকদের পরাধীনতা। পরিণামে ভারতীয় তথা হিন্দুরা নিজেদের আত্মসত্ত্বা বিসর্জন দিয়ে পরিণত হয়েছে সারমেয়সুলভ মনোবৃত্তিসম্পন্ন এক জাতিতে। সারমেয়দের মতই প্রভুর মনোরঞ্জন করা, সন্তুষ্টি বিধান করাই এদের জীবনের লক্ষ্য। তাই প্রশাসনিক ক্ষমতার অলিন্দে থাকা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এক বিদেশিনীর পাদুকাশ্রিত হয়ে তাঁর কৃপালাভে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন। আর তাঁর কৃপালাভে ধন্য হয়ে স্বজাতীয়দের, স্বধর্মীয়দের আক্রমণ করে ছিন্ন ভিন্ন করতে দ্বিধা করেন না। তাই প্রশাসনের কর্তাদের নির্দেশে গত ৪ জুন ২০১১-তে দিল্লী রামলীলা ময়দানে যোগগুরু বাবা রামদেব ও তাঁর শিষ্য শিষ্যা, অনুগামীদের ওপর মধ্যরাত্রিতে পুলিশ বর্বরোচিত আক্রমণ চালালো নিরস্ত্র, নিদ্রিত প্রায় এক লক্ষ স্ত্রী-পুরুষ শিশু-কে কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়ে এবং ডাণ্ডা মেরে, সভামঞ্চ ভেঙ্গে চুরমার করে, মাথার ওপর ছাউনিতে আগুন লাগিয়ে সব কিছু তছনছ করে দিয়েছিল সরকারি গুণ্ডাবাহিনী। সবশেষে বাবা রামদেবকে 'চ্যাং দোলা' করে তুলে নিয়ে গিয়ে দিল্লী থেকে হরিদ্বারে পাচার করে দেয়। এই পরাক্রান্ত পুলিশবাহিনী নিরস্ত্র নিদ্রিত অনশনরত জনতার ওপর বীরত্ব ফলায় কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়ে, লাঠি চার্জ করে আর মুসলমান সন্ত্রাসী, যারা সারা দেশে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে শত শত মানুষকে হতাহত করছে, তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা

নিতে পারে না। যে সব মাওবাদী অন্ধ্রপ্রদেশে, ওড়িশায়, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ডে, বিহারে, পশ্চিম মেদিনীপুরে সক্রিয় রয়েছে, জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলছে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারে না। এদের বিক্রম নিরস্ত্র, নিদ্রিত, অনশনরত জনতার ওপর। পথ অবরোধকারী নিরস্ত্র হিন্দুদের ওপর পুলিশ বীরত্ব প্রদর্শন করে লাঠিচার্জ করে, টিয়ার গ্যাস শেল ফাটায়, কিন্তু ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে, রাজপথ অবরোধ করে মুসলমানরা যখন নামাজ শুরু করে তখন পরাক্রমী পুলিশ কাঠের পুতুল-এ পরিণত হয়। সব বিক্রম সাহস তখন উবে যায়। কারণ অবশ্যই আমাদের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের নির্দেশ।

পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলায় গ্রামে গঞ্জে হিন্দুরা যখন মুসলমানদের দ্বারা ক্রমাগত আক্রান্ত হচ্ছে, হিন্দু বাড়ী ঘর, দোকানে লুটপাট চালানো হচ্ছে, হিন্দু মন্দির ভেঙ্গে বিগ্রহ কলুষিত করা হচ্ছে, হিন্দু কিশোরী এবং তরুণীরা অপহৃতা হচ্ছে, ধর্ষিতা হচ্ছে, তখন কি ভাবছেন শহরাঞ্চলে বাসকরা উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙ্গালীরা, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, রাজনীতিকরা? নাহ্ তাঁরা কিছু ভাবছেন না। তাঁরা ব্যস্ত তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নিয়ে, তাঁদের জীবিকা, সংসার আর বিনোদন নিয়ে। তাঁদের চিন্তাভাবনা কি একটা? শারদোৎসব, ক্রিকেট, দেশভ্রমণ, রবীন্দ্রসার্ধশতবর্ষ, নিয়ে তাঁদের ব্যস্ততার শেষ নেই। এবারের দুর্গোপুজোয় theme কি হবে সেটা নিয়ে যথেষ্ট ভাবনাচিন্তার প্রয়োজন রয়েছে। এবারের tour programme-এ রয়েছে কাশ্মীর। অথচ ট্রেন-এর রিজার্ভেশন পাওয়া যাচ্ছে না তাই হোটেল বুক করাও সম্ভব হচ্ছে না। আর্জেন্টিনার খেলাটা stadium-এ বসে সামনা সামনি দেখার ইচ্ছে বহুদিনের, সেটা হাতছাড়া করাটা উচিৎ হবে না। ইংল্যান্ড সফরে ইন্ডিয়া কতটা কি করতে পারবে এইসব হাজারো চিন্তায় হিন্দুবাঙ্গালী যখন দিশেহারা, তখন কোন অজ গ্রামে হিন্দু তরুণী অপহৃতা এবং ধর্ষিতা হল, কোথায় হিন্দুদের হরি সংকীর্ত্তন করতে দেওয়া হল না, কোথায় একটা পতিত জমি মসজিদ করার জন্য পাঁচিল দিয়ে ঘিরে ফেলল মুসলমানরা, সেগুলি নিয়ে ভাবনা চিন্তার অবকাশ কোথায়? আমরা গঙ্গার ধারে থাকি, দেগঙ্গায় কি ঘটেছে, সেজন্য আমাদের চিন্তার কি আছে? জয়নগরের ঘটনার সঙ্গে চন্দননগরের কি সম্পর্ক? তাছাড়া ওসব সাম্প্রদায়িক বিষয়ে বেশী কিছু বলা বা করা উচিত নয়। ওতে দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হয়। হিন্দু মুসলমানে বন্ধুত্ব থাকে না।

এরা একবারও চিন্তা করে দেখেন না সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এ রাজ্যে কবে, কোথায় ছিল? প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন "১৮৩৩ সালে বাংলায় দুটি প্রধান জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল, হিন্দু ও মুসলমান। একই ভূমিতে বসবাস করলেও একমাত্র ভাষা ছাড়া বাকি সমস্ত বিষয়ে এরা পরস্পরের বিরোধী ছিলেন। ধর্ম, শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ৬০০ বছর ধরে তারা দুটি পৃথক দুনিয়ার বসবাস করতেন। শুধু তাই নয় এই ৬০০ বছর ধরে মুসলমানরা হিন্দুদের মহান আদর্শ ও পবিত্রতম চিন্তাধারাকে গুরুতর রূপে আহত করেছিল এবং এই সম্পূর্ণ কালখণ্ডে হিন্দুদের অসামরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সমূহকে ধ্বংস করেছিল। রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকনাথ ঠাকুর এবং প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের মত বাঙলার নেতৃস্থানীয় মহান ব্যক্তিরাও মনে করতেন যে গত ৯০০ বছর ধরে হিন্দুদের জীবনে যে চূড়ান্ত দুঃখকষ্ট এসেছে তার উৎস হল মুসলমান।" শুধুমাত্র ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার নয়, অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তিনি তাঁর "বর্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা" নিবন্ধে লিখেছেন

"বস্তুত মুসলমান যদি কখনও বলে হিন্দুর সহিত মিলন করিতে চাই, সে যে ছলনা ছাড়া আর কি হইতে পারে ভাবিয়া পাওয়া কঠিন।" শুধুমাত্র এই নয় তিনি আরও লিখেছেন "একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই। সেদিন কেবল লুঠ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্বহানি করিয়াছে, বস্তুতঃ অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের উপর যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায়, কোথাও কোন সঙ্কোচ মানে নাই। দেশের রাজা হইয়াও তাহারা এই জঘন্য প্রবৃত্তির হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি নামজাদা সম্রাটের কথা ছাড়িয়া দিয়াও যে আকবর বাদশাহের উদার বলিয়া এত খ্যাতি ছিল, তিনিও কসুর করেন নাই।..."

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যাই লিখুন না কেন হিন্দু বাঙ্গালী তার ভণ্ডামি ছাড়তে পারে না। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে সহায় সম্বলহীন হয়ে পালিয়ে এসে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবির কুপার্স ক্যাম্প, ধুবুলিয়া প্রভৃতিতে আশ্রয় নেওয়া উদ্বাস্তু পরিবারের পরবর্তী প্রজন্ম। মুসলমানদের কাছে অত্যাচারিত হয়েও উৎপীড়িত হয়েও এদের মুসলিম প্রীতি অটুট রয়েছে। তাই এরা মিটিং-এ মিছিলে শ্লোগান দেন "হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই", আর গান ধরেন "একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান।" তাদের সাত পুরুষের ভিটে মাটিতে পূর্ব পাকিস্তানে বা বাংলাদেশে এ শ্লোগান কেন দেওয়া গেল না বা এ গান কেন গাওয়া গেল না সে প্রশ্নের জবাব নেই। পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে এসেছেন বটে তবে ভুলতে পারেন নি সেখানকার ভাষা, দোল দুর্গোৎসব, হরি সংকীর্ত্তন, খিচুরী ভোগ আর ইলিশ মাছের স্বাদ। বাংলাদেশী ইলিশ, পদ্মার ইলিশের স্বাদ পেতে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা বড়ই ব্যাকুল, বড়ই উতলা। তাই বাংলাদেশ পদ্মার ইলিশ পাঠাচ্ছে বটে তবে সেই সঙ্গে পাঠাচ্ছে সন্ত্রাসবাদী বা জেহাদী যারা সঙ্গে নিয়ে আসছে আর ডি এক্স-এর মত বিস্ফোরক আর লক্ষ লক্ষ টাকার জাল নোট আর আসছে হাজার হাজার বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারী। আর বছর কতকের অপেক্ষা। তারপর পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশ মিলে মিশে একাকার হয়ে যাবে যদি না কোন অঘটন ঘটে। তারপর চতুর্দিকে ধ্বনিত হবে, রণিত হবে "লা ইলাহা ইল্লাল্লা মহম্মদুর রসুলুল্লা।"

সব কিছু পর্যালোচনা করলে কি মনে হয় না পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ-এর অঙ্গীভূত হতে চলেছে?

তৃতীয় পর্ব

পরিশিষ্ট

মুসলিম পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করার অপরাধে সামাজিক বয়কটের শিকার, জারি ফতোয়া

মুর্শিদাবাদের বহরমপুর এবং কান্দী থানার সংযোগস্থল উদয়পুর গ্রামের ঘটনা। গ্রামের নতুন বউ মুসলিম পরিবারের। স্রেফ এ কারণে দীর্ঘ ২০ দিন সামাজিক বয়কট করে রাখা হয়েছে ওদের অর্থাৎ প্রদ্যুৎ মণ্ডল এবং কাশ্মীরা খাতুনদের। দুই গ্রামের দুই সম্প্রদায়ের মোড়লদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে তারা সিদ্ধান্ত নেয় বিয়ে করার। বাধা আসে দুপক্ষ থেকেই। দুই গ্রামের মোড়লরা তৈরি হয় এ নিয়ে সংঘর্ষে নামার। পরে কাশ্মীরার বাবা আবদুল বশির, মা খাতেজা বিবি এবং প্রদ্যুতের বাবা নিমাই মণ্ডল এ বিয়েতে রাজী হন। দুই পরিবারের সম্মতি মোতাবেক এ বছরের ২৫ জুলাই ১৯৫৪-এর বিশেষ বিবাহ আইন মোতাবেক রেজিস্ট্রি করে প্রদ্যুৎ এবং কাশ্মীরার বিয়ে হয়।...

গ্রামের হিন্দু মোড়লরা জানিয়ে দেন পাড়ার কোনও হিন্দু পরিবারের কেউ নিতাই বাবুদের সঙ্গে যেন কথা না বলেন। তাদের মুদিখানার দোকান থেকে কেউ যেন জিনিষ না কেনেন। এমন কি পাড়ার নলকূপ থেকে নিতাইবাবুদের পরিবারের কেউ জল নিতে পারবে না এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। (সংক্ষেপিত)

দৈনিক স্টেটসম্যান ২৯.১০.১০

জাতপাতের বাধা টপকে নতুন পথে শ্যামপদ-সমি

পুলিশের হস্তক্ষেপে নবদম্পতি ফিরে পেল রঙিন স্বপ্ন দেখার সুযোগ। তবে চন্দ্রকোণা টাউনের কমরপুর এবং মহেশপুর গ্রামের বাসিন্দাদের আশঙ্কা, প্রিয়ঙ্কা-রিজওয়ানের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়।

মহেশপুর গ্রামের বাসিন্দা আফতাবুল ইসলাম খানের মেয়ে উনিশ বছরে সমি আকতার এবং কমরপুর গ্রামের গঙ্গাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে সাতাশ বছর বয়সী শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেমের পরিণতি আর পাঁচটা বিয়ের মতো নয়। শ্যামাপদ এবং সমি পরস্পরকে ভালোবাসতো বলে গ্রামবাসীরা জানিয়েছে। কিন্তু বিয়ের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাড়ায় সেই জাতপাত। সেই বাধা টপকে কলাবিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী সমি ও একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত শ্যামাপদ গত ৫ই জুন পালিয়ে গিয়ে বালিচকের একটি কালিমন্দিরে গিয়ে হিন্দু মতে বিয়ে করে। কিন্তু এই বিয়েতে হিন্দু ও মুসলিম দুই পরিবারই ঘোরতর আপত্তি করে। দুই পক্ষই থানায় মিসিং ডায়েরি করে। অন্যদিকে দুই গ্রামের

মানুষজন জানতে পারে শ্যামাপদ এবং সমি দুজনে বিয়ে করেছে। এরা দুজন রবিবার গ্রামে ফিরে এলেও কেউ করো বাড়িতে যেতে পারেনি। দুই পরিবারই এই বিয়ে মেনে না নেওয়ায় নিরাপত্তার অভাব বোধ করে নবদম্পতি। এর পরই থানায় গিয়ে পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করে। পুলিশের সাহায্যে থানায় মুচলেকা দিয়ে শ্যামাপদ ও সমি থানা সংলগ্ন একটি বাড়ি ভাড়া করে সেখানে বসবাস শুরু করে। শ্যামপদ জানায়, আমরা ভালো-বাসতাম তাই বিয়ে করেছি। এই নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার কিছু নেই। সমি জানায়, সে তার ভালোবাসার মানুষকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু বাড়ীর লোক মেনে না নেওয়ায় পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছে। তবে থানায় মুচলেকায় কী লিখেছে তা জানাবে না সে।

শ্যামপদর বাবা গঙ্গাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ছেলের বিয়েকে মেনে না নিলেও ওর ভালোমন্দর কথা চিন্তা করে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি। এই বিয়ে নিয়ে হিন্দু ও মুসলিম সমঝোতা নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে ভিন্ন জাতের মেয়ে আসবে তা কোনও মতেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। অন্যদিকে অভিযোগ করে তিনি বলেন, মেয়ের বাবা ছেলেকে মেরে ফেলবে বলে হুমকি দিচ্ছে। তাছাড়া গ্রামের সালিশি সভায় তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়, ছেলে যদি বাড়িতে ফিরে আসে তাহলে সমাজ থেকে বিতাড়িত করা হবে। ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে বাড়িতে। হিন্দু সমাজ থেকে এ ধরনের ভয় দেখানোয় সাহস করে ছেলে বৌমাকে ঘরে তুলতে পারছে না গঙ্গাপ্রসাদ। অন্যদিকে মেয়ের বাবা আফতাবুল ইসলাম খান তাঁর মেয়ের এরকমভাবে বিয়ে মেনে নিতে পারছেন না। তবে মারধর ও হুমকির অভিযোগ মানতে নারাজ তিনি। যদিও তাঁরাও বাড়িতে মেয়েজামাইকে তুলবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, হিন্দুর সাথে মুসলিমের বিয়ে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। পুলিশ জানিয়েছে অভিযোগ জমা পড়েছিল, তদন্ত করে দেখা গিয়েছে দুইজনেই প্রাপ্ত বয়স্ক। সেকারণে আমাদের কিছু করার নেই। থানায় এসে নিরাপত্তার জন্য আশ্রয় নিয়েছিল, এখন ওরা ভাড়াবাড়িতে রয়েছে।

দৈনিক স্টেটসম্যান ১১.০৬.০৮

ভিন্ন ধর্মীকে বিয়ে করে একঘরে হোসনারারা

ভিন্ন ধর্মের ছেলেকে বিয়ে করায় একঘরে হয়ে রয়েছেন হোসেনারার পরিবার। ঘটনাটি ঘটেছে মালদার বামনগোলা ব্লকের পাইকপাড়া এলাকায়। ওই পরিবারের সকলকেই গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ারও নাকি নির্দেশ দিয়েছে গ্রামের মোড়ল মাতব্বরেরা। মেয়ের বাবা হয়ে এমদাদুল এখন প্রশাসনের সাহায্যের দিকে মুখ চেয়ে রয়েছেন। বামনগোলা ব্লকের বি ডি ও অঞ্জন ঘোষ বলেন, এ ব্যাপারে কোনও অভিযোগ জানা নেই। তবে বিষয়টি অবশ্যই খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।

বামনগোলা ব্লকের জামতলা গ্রামের বাসিন্দা সুজল মণ্ডলের সঙ্গে পাইকপাড়ার হোসেনারার দীর্ঘদিনের ভালোবাসা ছিল। তারা দুইজনেই সাবালক। ভালোবেসে একে অপরকে বিয়ে করেন। আর তারপর থেকেই শুরু হয় বিপত্তি। প্রথমে ছেলের বাড়ি থেকে সুজলকে ত্যাজ্য পুত্র করে দেওয়া হয়। কিন্তু পরে তাদের দুইজনের বিয়ের বিষয়টি মেনে নেয় সুজলের পরিবার। হোসেনারার ক্ষেত্রেও সমস্যা হয়েছিল। কিন্তু এমদাদুল মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই জামাইকে আদর করে ঘরে তোলেন। কিন্তু দুই পরিবার মেনে নিলেও গ্রামের মোড়ল মাতব্বরেরা এই বিধান মানতে নারাজ। তাই রাতারাতি গ্রামে

সালিশি সভা ডেকে মেয়ের বাবা এমদাদুলকে সভায় হাজির করানো হয়। সেখানেই সিদ্ধান্ত হয় এম.দাদুলের পরিবারকে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে। এখন গ্রামের কেউই আর এম.দাদুলের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন না। এমনকি তার পরিবারের জন্য গ্রামের বাজার-হাট, মুদির দোকানের রাস্তাও প্রায় বন্ধ।

হোসেনারার বাবা এমদাদুল বলেন, গ্রামের কেউই তাদের সঙ্গে কথা বলেন না। রাস্তায় বেরোলেই অনেক কড়া ভাষা শুনিয়ে দিচ্ছেন। এমন কী গ্রাম থেকে চলে যাওয়ার হুমকিও দিচ্ছেন। এম.দাদুলের কথায়, "ধর্ম মেনে বিয়ের বিষয় আমি মানি না। ছেলে প্রতিষ্ঠিত জামাই আমার মেয়েকে সুখে রাখবে। এই ভেবেই জামাইকে ঘরে তুলেছি। কিন্তু সমাজের এক শ্রেণীর মাতব্বরেরা তা মানতে চাইছে না। এব্যাপারে পুলিশকেও জানানো হয়েছে।"

এদিকে বেশ কয়েকদিন ধরে সুজল মণ্ডল শ্বশুরবাড়িতে থাকায় গত শুক্রবার রাতে বউ আর ছেলেকে নিতে সদলবলে আসেন সুজলের পরিবার। কিন্তু হোসেনারা রিজওয়ান কাণ্ডের কথা ভেবে নিজের স্বামীকে নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে ভয়ে ফিরতে পারেননি। এদিকে সুজলের বাবা সুরেশ মণ্ডল বলেন, ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বউমার বাড়ি গিয়েছিলাম। কিন্তু তারা খুবই ভয়ে দিন কাটাচ্ছেন। আসলে এই অবস্থায় কাউকে বিশ্বাস করতে চাইছেন না।

বামনগোলা থানার ওসি আত্রেয়ী সেন বলেন, "ওই দুইজনের বিরুদ্ধে বাড়ি থেকে নিঁখোজ হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। তবে তারা দুইজনে সাবালক এবং নিজের মতে বিয়ে করেছে। তবে ঐ দম্পতির পরিবারের বিরুদ্ধে কোনওরকম গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে যথাসাধ্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

দৈনিক স্টেটসম্যান ০১.০৯.০৮

সুরজিতের সঙ্গে প্রণয়ের বিয়ে মেয়ের, তালিবানি ফতোয়ায় আরেজুল একঘরে

ধর্মীয় বিধান মেনে মেয়ের বিয়ে না-দেওয়ার 'অপরাধ'-এ একঘরে করা হয়েছে আরেজুল মণ্ডলের গোটা পরিবারকে। ওই বাড়ির ছেলের সঙ্গে কথা বলায় গ্রামের চার কিশোরের জরিমানা হয়েছে। এই ঘটনা মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া অঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রাম মহিষমারার। কিন্তু আরেজুল মণ্ডলের অপরাধটা সত্যি কী?

আরেজুলের ১৯ বছরের মেয়ে রেবননারা খাতুন ভালবেসে বিয়ে করেন ওই গ্রামেই পুলিশ ক্যাম্পের কনস্টেবল সুরজিৎ তিওয়ারিকে। কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে না-গিয়ে তাঁরা 'স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট' অনুসারে বিয়ে করেন। রেবননারার বাবা-মা সেই বিয়ে মেনে নেন। কিন্তু গ্রামের সিপিএমের আশ্রিত মাতব্বরেরা 'তালিবানি' বিচারসভা বসিয়ে ফতোয়া দেন, সুরজিৎকে ধর্মান্তরিত করতে হবে। আরেজুল মণ্ডল তাতে রাজি হননি। সিপিএমের স্থানীয় ব্রাঞ্চ কমিটির সম্পাদক ও পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক শরিয়ত মণ্ডল পরিচালিত 'গ্রাম সমাজ কমিটি' তখন আরেজুলের পরিবারকে একঘরে করে। গ্রামের জুম্মা মসজিদে রীতিমতো বিচারসভা বসিয়ে ঢ্যাড়া পিটিয়ে ঘোষণা করা হয়, 'ওই পরিবারের জন্য গ্রামের ধোপা, নাপিত, মুদিখানা, মুনিষ-মজুর বন্ধ করা হল। গ্রামের কারও জমির উপর দিয়ে ওরা হাঁটতে পারবে না, চাষের কাজে যেতে পারবে না। ওদের সারের দোকানে বা গম ভাঙানোর কলে গ্রামের কেউ যাবে না। কেউ কথাও বলতে পারবে না।'

আরেজুল মণ্ডল তখন গ্রামের পুলিশ ক্যাম্পে গিয়ে সব জানান। তাতে ফল হল

উল্টো। সুরজিতের চাকরি 'খেয়ে নেওয়া'র হুমকি দিয়ে তাঁকে বহরমপুরে বদলি করে দেন পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ। আরেজুলের বক্তব্য, ''ছেলে-মেয়ে ভালবেসে বিয়ে করেছে। আমরা তা মেনে নিয়েছি। তাতেই মোড়লেরা আমাদের একঘরে করে দিল।'' একঘরে ওই পরিবারের কী দশা হয়েছে, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে আরেজুল বললেন, ''কথা বলা বারণ, তাই কারও কাছ থেকে ব্যবসার বকেয়া টাকা আদায় করতে পারছি না। ধানের জমি ঘাসে ভরে গিয়েছে, পাটের জমিতে সার দেওয়া দরকার। এক দিন মাঠে বেরোতেই লাঠিসোঁটা নিয়ে মোড়লেরা তাড়া করে।'' এই ত্রাসের পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে আরেজুল সপরিবার গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। সেই সুযোগে তাঁদের জ্বালানি পাটকাঠি আর গরুর জন্য রাখা খড় লুঠ হয়ে গিয়েছে।

এর পরে মোড়লদের নামধাম জড়িয়ে আরও দু'বার থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আরেজুল। কিন্তু প্রতিকার মেলেনি। উল্টে তাঁদের থানায় ডেকে নিয়ে গিয়ে অভিযুক্তদের হাতেই মীমাংসার ভার দেন ও সি আব্দুর গফফর। তিনি বললেন, ''স্পর্শকাতর বিষয়। তা ছাড়া খুব দুর্গম এলাকা। তাই পরিস্থিতি বিবেচনা করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হবে।'' তবে এই ঘটনার কিছুই জানা নেই অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পবিত্রকুমার দাসের। আর জেলার সভাধিপতি এবং সিপিএমের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সচ্চিদানন্দ কাণ্ডারী তো আকাশ থেকে পড়ে বলেছেন, ''এই প্রথম শুনলাম। খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নিচ্ছি।''

অথচ তাঁর দলের গ্রাম স্তরের নেতারা যে আইনের তোয়াক্কা না-করে 'তালিবানি'

....

আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯ জুলাই ১৯৯৯

কম বয়সে বিয়ে চালু রাখার দাবি কাজি সংগঠনের

বিয়েতে পাত্র-পাত্রীর বয়স নিয়ে কোনও বিধিনিষেধ মানবে না সারা বাংলা মুসলিম ম্যারেজ রেজিস্ট্রার অ্যান্ড কাজি সোসাইটি। সরকার বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্র ও পাত্রীর ন্যূনতম বয়স যথাক্রমে ২১ ও ১৮ বছর হতে হবে বলে নির্দেশ জারি করেছে। সুপ্রিম কোর্ট একাধিক মামলায় বিয়ের ন্যূনতম বয়স বেঁধে দিয়েছে। কিন্তু মুসলিম সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ মাহাতাবুর রহমান এবং সহকারী সম্পাদক এ কে এম ফারহাদের দাবি, ১৮৭৬ সালের মহামেডান ম্যারেজেস অ্যান্ড ডিভোর্সেস রেজিস্ট্রেশন আইনে বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর ন্যূনতম বয়সের উল্লেখ নেই। ওই আইনে অভিভাবকের সম্মতি নিয়ে নাবালক ও নাবালিকার বিয়ে বৈধ। সংগঠনের এক প্রতিনিধিদল সোমবার রাজ্যের আইন ও বিচারমন্ত্রী রবিলাল মৈত্র'র সঙ্গে দেখা করে ১০ দফা জানিয়ে স্মারকলিপি দেন।

সংগঠনের আরও বক্তব্য, রাজ্য সরকার বিয়ে রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করেছে। এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে তাঁরা একমত। কিন্তু আইনে মুসলিম বিয়ে ও তালাকের ব্যাপারে যে কর্মপদ্ধতির উল্লেখ আছে, তা নিশ্চিত করতে হবে। রাজ্যের আইন ও বিচার দপ্তরের এক পদস্থ অফিসার বলেন, আপাতত বিয়ের রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করাই রাজ্য সরকারের লক্ষ্য। পাত্র-পাত্রীর বিয়ের বয়স নিয়ে রাজ্য কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারই যা করার করবে।

বর্তমান, ১৯.০২.২০০৮

বিষ খেয়ে আত্মহত্যা হিন্দু প্রেমিক ও মুসলিম প্রেমিকার

ভালোবাসাকে পরিণয় করতে ধর্মের প্রবল বাধার মুখে পড়ে আত্মহননের পথ বেছে নিলো এক প্রেমিক যুগল। বাড়ি থেকে পালিয়ে ভূপতিনগর থানার মাগলাতি গ্রামের কাছে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলো প্রেমিক রিন্টু সিং ও প্রেমিকা রশিদা খাতুন। রবিবার সকালে পূর্বমেদিনীপুর জেলার ভূপতিনগর থানার বাতাকুলের কাছে মাগলাতি গ্রামের কাছে দুই যুবক যুবতীর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনার বিবরণ, হেঁড়িয়া থানার খাড়োল গ্রামের রিন্টু সিং এর সাথে প্রতিবেশী শেখ সিরাজুলের মেয়ে রশিদা খাতুনের দীর্ঘদিন ধরে প্রণয়ের সম্পর্ক। এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে রিন্টু ও রশিদার সম্পর্ক মেনে নিতে পারেনি দুই পরিবার। দুই যুগলের প্রেম সারা জীবনের পরিণয় হয়ে ওঠার মুখে বাধা হয় ধর্ম। গত কয়েকদিন আগে রিন্টু বিয়ে করে রশিদাকে। এরপর থেকে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পারিবারিক অশান্তি থেকে বাঁচতে এই প্রেমিক যুগল আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে বলে স্থানীয় মানুষের ধারণা। শনিবার রাত থেকেই রিন্টু সিং ও রশিদা খাতুন বাড়ি থেকে নিঁখোজ ছিল। রবিবার সকালে যুবক-যুবতীর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে মাগলাতি এলাকার অধিবাসীরা ভূপতি নগর থানায় খবর দেয়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। পূর্বমেদিনীপুর জেলা পুলিশ সুপার ঋষিকেশ মীনা বলেন, ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। তবে প্রাথমিকভাবে অনুমান বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে যুবক-যুবতী। থানায় কোনও অভিযোগ হয়নি। তবে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে জানান অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার।

দৈনিক স্টেটসম্যান ২৭.০৯.১০

সুফিয়াকে বিয়ে করে ঘর বাঁধতে চাওয়ায় খুনের হুমকি দেবব্রতকে

রিজওয়ানুদের মতো মর্মান্তিক মৃত্যু আমরা চাই না। সুফিয়াকে বিয়ে করে শান্তিতে সংসার করতে চাই। সোমবার বারাসাত থানায় এসে এই কথা বললেন দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, সুফিয়ার বাবা হায়দার আলি হালদার, দাদা টিপু সুলতান এই বিয়ের পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। সুফিয়াকে ত্যাগ না করলে বা বিয়ে করলে তাঁকে খুন করা হবে বলেও হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এদিন বারাসত থানায় এসে নিরাপত্তার দাবি জানান দেবব্রতবাবু। তাঁর প্রেমিকা বি এ দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী সুফিয়াও নিরাপত্তা চেয়ে বারাসাত থানায় হাজির। তারপরই সুফিয়ার বাবা হায়দার আলি ও দাদা টিপু স্থানীয় জনপ্রতিনিধিকে নিয়ে থানায় হাজির হন সোমবার সন্ধ্যায়।

পুলিশ জানিয়েছে, কলকাতার পার্ক সার্কাসের ১৬৮ই তিলজলা রোডের বাসিন্দা হায়দার আলির মেয়ে সুফিয়ার সঙ্গে বারাসাত থানার ছোট জাগুলিয়ার ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে দেবব্রতর প্রায় এক বছর ধরে প্রেম। তিন-চার দিন আগে তাঁরা বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন।

রিজওয়ানুরের প্রেমের ঘটনায় মনে সাহস সঞ্চয় করে দেবব্রত তাঁর বন্ধুদের নিয়ে গত বৃহস্পতিবার হায়দার আলিকে প্রণাম করে সুফিয়াকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। সুফিয়ার পরিবার তাতে ঘোর আপত্তি তোলায় শনিবার তিনি দেবব্রতর সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে পালান। এরপর হায়দার আলি সপরিবারে মেয়ের খোঁজে ছোট জাগুলিয়ায় এসে জনপ্রতিনিধিদের দ্বারস্থ হন।

দেবব্রত বলেন, আমার মোবাইলে ফোন করে আমাদের বিয়ে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে উভয়ের পরিবার আশ্বাস দিয়ে আমাদের ডাকে। সরল মনে আমরা ধরা দিতেই সফিয়ার বাবা এবং দাদা রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন। তিনি বলেন, হিন্দু-মুসলমানে বিয়ে হয় না। বিয়ে করলে আমাকে খুন করা হবে বলেও সুফিয়ার দাদা হুমকি দেন। সুফিয়া বলেন, এরপরই বেগতিক দেখে দেবব্রতকে নিয়ে আমি বারাসাত থানায় চলে আসি। তিনি বলেন, "আমরা উভয়ে প্রাপ্তবয়স্ক। একে অপরকে ছাড়া আমরা বাঁচতে পারব না। আমরা বিয়ে করব। ধর্ম সেখানে বাধা হবে কেন।" পুলিশের কাছে নিরাপত্তা চেয়ে লিখিত আবেদন হাতে নিয়ে বারাসাত থানায় বসে একথা জানান সুফিয়া।

থানায় ঢুকেও সুফিয়ার দাদা দেবব্রতকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেন। সুফিয়ার বাবা হাইকোর্টে যাওয়ারও হুমকি দেন। সুফিয়ার অভিযোগ, পুলিশের সামনে দেবব্রতকে আমার বাবা-দাদা হুমকি দিচ্ছেন। অথচ পুলিশ তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নিয়ে কোনও অভিযোগ ছাড়াই দেবব্রতর মোবাইল কেড়ে নিয়ে তাকে থানার আসামীদের রাখার ঘরে ঢুকিয়ে আটকে রাখে। বারাসাত থানার আই সি জানান, ওদের মধ্যে অশান্তি হচ্ছিল। অশান্তি এড়াতে ছেলেটির নিরাপত্তার জন্যই তাকে ওই ঘরে বসিয়ে রাখা হয়।

সুফিয়ার বাবা হায়দার আলি বলেন, মোহের বশে ওরা এই জঘন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হিন্দু-মুসলমানে বিয়ে হয় না। ছেলের পরিবারও এ বিয়ে মেনে নিচ্ছে না। ছেলের পরিবার এ বিয়ে মেনে নিলে আমাদের বলার কিছু ছিল না। কেউ ওদের বিয়ে মেনে নেবে না।

ছোট জাগুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্য গৌরচন্দ্র ঘোষ বলেন, আমরা অশান্তি চাই না। সেজন্য পুলিশের পরামর্শ নিতে থানায় এসেছি। এ ঘটনায় বারাসাত থানার পুলিশ পড়েছে মহাফাঁপরে। পুলিশ এ ব্যাপারে কী ভূমিকা নেবে সেটা নিয়েই তাদের এখন মাথাব্যথা।

বর্তমান, ৩০.১০.০৭

বাড়ির অমতে বিয়ে করা প্রাপ্তবয়স্ক দম্পতিকে গ্রেপ্তার করতে দিলেন না ঝাড়গ্রামের ও সি

অপহরণের অভিযোগ পেয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে পুলিশ বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রামে এসেও গ্রেপ্তার করল না বাড়ির অমতে বিয়ে করা প্রাপ্তবয়স্ক দুই যুবক-যুবতীকে। ঝাড়গ্রাম থানার ও সি দেবাশিস চক্রবর্তী ওই দলটিকে তিনি সাফ জানিয়ে দেন, কোনওভাবেই ওই নবদম্পতিকে ধরা যাবে না। দক্ষিণ ২৪ পরগনার নোদাখালি থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার শেষ পর্যন্ত খালি হাতেই ফিরে যায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগণার নোদাখালি থানার পশ্চিম পোয়ালী গ্রামের ব্যবসায়ী শেখ মহম্মদের ছোট মেয়ে রেজিনা খাতুন বাড়ির অমতে ঝাড়গ্রামের যুবক দোদন পাত্রকে বিয়ে করেন। দোদনের বাড়ি ঝাড়গ্রামের বাছুরডোবার চৌধুরী কলোনিতে। দোদন বলেন, জাতিগত সমস্যার কারণে কোনও পরিবার আমাদের বিয়ে মেনে নেয়নি। আমাদের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। রেজিনা ডায়মণ্ডহারবারের শহিদ অনুরূপচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। আমরা দু'জনেই প্রাপ্তবয়স্ক। সোমবার রেজিনা বাড়ি ছেড়ে খড়গপুরে চলে আসে। এরপর আমি ওকে ঝাড়গ্রামে আনি। বুধবার আমরা চিলকিগড় মন্দিরে বিয়ে করি। মুসলিম সম্প্রদায়ের মেয়েকে বিয়ে করার জন্য আমার বাড়িতে এই সম্পর্ক কেউই মেনে নেয়নি। বাধ্য হয়ে আমি বাড়ি ছেড়েছি।

মেয়ের বিয়ের খবর পেয়েই রেজিনার বাবা শেখ মহম্মদ নোদাখালি থানায় বুধবার

অপহরণের ডায়েরি করেন। অপহরণের অভিযোগ পাওয়ার পরে নোদাখালি থানার পুলিশ বাহিনী বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রামে পৌঁছায়। ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশের সাহায্য নিয়ে তারা দোদন এবং রেজিনার সঙ্গে দেখা করে।

দু'জনকেই দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করে। নবদম্পতি পুলিশকে জানিয়েছেন, তাঁরা পরস্পরকে ভালোবাসেন এবং বিয়ে করেছেন। এরপর ঝাড়গ্রাম থানার ও সি দেবাশিস চক্রবর্তী বলেন, প্রাপ্তবয়স্ক ওই যুবক-যুবতীর সম্মতির বিয়েতে হস্তক্ষেপ করে জলঘোলা করা ঠিক নয়। অপহরণের অভিযোগও ভিত্তিহীন।

রেজিনা বলেন, আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছি। আমার বাবা মোটেই আমাদের সম্পর্ক মেনে নিতেন না। তাই আমার কিছু করার ছিল না।

নোদাখালির পশ্চিম পোয়ালী গ্রামে শেখ মহম্মদের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, আমার মেয়েকে ফুসলিয়ে ওই যুবক নিয়ে গিয়েছে। তাছাড়া আমার মেয়ে ওই যুবককে নিয়ে সংসার করলে প্রতিবেশীরা আমাকে একঘরে করে দেবে বলে হুমকি দিচ্ছে। তাই আমি মেয়েকে ফিরে পেতে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করি।

বর্তমান ৫.১০.২০০৭

কিশোরীকে ট্রেন থেকে টেনে নামাল সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা

২০০২-এ মুম্বই যেন ফিরল ২০০৯-এর মহানগরে। মুম্বইয়ের লোকাল ট্রেনে নাবালিকা ধর্ষণের ২০০২ সালের সেই ছবি যেন ফিরে এল কলকাতার লোকাল ট্রেনে। পার্ক সার্কাস স্টেশনে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে যাওয়া ট্রেনের মহিলা কামরায় উঠে দুষ্কৃতীরা আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে এক কিশোরীকে জোর করে নামিয়ে নিয়ে গেল। তার আগে মহিলা কামরার অন্যান্য যাত্রীদেরও নামিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে দুষ্কৃতীরা। এই ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটেছে 'মরূদ্যান'-এ, শনিবার রাতে, শিয়ালদামুখী বজবজ লোকালে। সোমবার বিকেলে এই ঘটনার চার দুষ্কৃতীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। কিশোরীটিকেও উদ্ধার করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বুকে লোকাল ট্রেনে সাম্প্রতিক কালে তো বটেই, অতীতেও এমন ঘটনা নজিরবিহীন।

শিয়ালদা রেল পুলিশের সুপার শঙ্কর সিং সোমবার আমদাবাদ থেকে ফোনে জানান, কিশোরীটিকে উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় জড়িত আরও কয়েক জনের খোঁজ চলছে। ওই কিশোরীকে ধর্ষণ বা শারীরিক নিগ্রহের শিকার হতে হয়েছে কিনা, তা বোঝা যাবে মেডিক্যাল টেস্টের পরেই।

বজবজ থেকে গান শিখে ট্রেনে করে শনিবার ওই গুজরাতি কিশোরী শিয়ালদায় ফিরছিলেন। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ট্রেনটি বালিগঞ্জ ছেড়ে পার্ক সার্কাস ঢোকার মুখে লোহাপুলে সিগন্যাল না-পেয়ে দাঁড়িয়ে যায়। এই সময় ওই এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা কয়েক জন সশস্ত্র যুবক ট্রেনের মহিলা কামরায় উঠে পড়ে। কামরার ১০-১২ জন মহিলা যাত্রীকে 'গানপয়েন্ট'-এ দাঁড় করিয়ে, দুষ্কৃতীরা তাঁদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিজ্ঞতা, প্রথমে তিন জন লাফিয়ে কামরায় ওঠে। তখন কয়েক জন মহিলা সিটে বসেছিলেন। আর কয়েক জন গেটের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিলেন। দুষ্কৃতীরা উঠেই তিন যুবতীকে টানা-হ্যাঁচড়া করে ট্রেন থেকে নামিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। তাঁরা বাধা দিলে আরও দুই দুষ্কৃতী লাফিয়ে ট্রেনে উঠে আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে ভয় দেখায়। এর মধ্যেই সিগন্যাল পেয়ে ট্রেন ছাড়ার হুইসল বেজে ওঠে। তখন দুষ্কৃতীদের তিন জন মেয়েদের ছেড়ে নেমে

যায়। অন্য দুষ্কৃতীরা তখন ১৫-১৬ বছরের ওই কিশোরীকে কানে রিভলভার ঠেকিয়ে প্রায় চলন্ত ট্রেন থেকেই নামিয়ে নেয়। ট্রেন পার্ক সার্কাস ছেড়ে শিয়ালদা স্টেশনে ঢোকার পর, মহিলারা জিআরপি-তে অভিযোগ জানান। পরে অভিযোগ জানানো হয় বালিগঞ্জ জিআরপি-তে।

দমদম মধুঘর এলাকার বাসিন্দা ধীরু সাবেরিয়া পুলিশকে জানিয়েছেন, মেয়ে গান শিখতে বজবজে গিয়েছিল। অন্যান্য দিন সন্ধের পরেই মেয়ে ফিরে আসে। মেয়ে রাতে বাড়ি না ফেরায় পর দিন বজবজে খোঁজ নিয়ে তাঁরা জানতে পারেন, তালিম নিয়ে দেরি হওয়ায় রাতে বেরোতে মেয়ের দেরি হয়েছিল। তার পর চারদিকে খুঁজেও তাঁরা মেয়ের সন্ধান পাননি। মেয়েটিকে তুলে নিয়ে গিয়ে তিলজলা এলাকার কোন ফাঁকা গোডাউনে দেড় দিন আটকে রাখা হয়েছিল বলে পুলিশের সন্দেহ। অভিযোগ, দুষ্কৃতীদের যৌন লালসার শিকার হতে হয়েছে কিশোরীটিকে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত চার দুষ্কৃতীই তিলজলা-কড়েয়া এলাকার বাসিন্দা। ধৃতদের নাম শেখ মুন্না ওরফে সানি, জাকির হোসেন ওরফে নাটা ওরফে প্যাটা, শ্যামসুন্দর দাস ও সাবির খান।

কলকাতার লোকাল ট্রেনে বেনজির এই ঘটনা ঘটে যাওয়ায় ফের যাত্রী নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠে গিয়েছে স্বাভাবিক ভাবেই। যাত্রীদের অভিযোগ, রাতের ট্রেনে সেদিন কোন নিরাপত্তারক্ষী ছিল না। ছিল না মহিলা পুলিশও। কী ভীষণ অসহায় ভাবে প্রতিদিন মহিলা যাত্রীদের ট্রেনে যাতায়াত করতে হয়, এই ঘটনাই তা চোখে আঙুল দিয়ে আরও একবার দেখিয়ে দিল। এপ্রসঙ্গে তৃণমূল বিধায়ক জাভেদ খান বলেছেন, 'ঘটনাটা শুনেছি। রাতের ট্রেনে আরও নিরাপত্তা দাবি জানিয়েছি।' প্রাক্তন সিপিএম সাংসদ সুজন চক্রবর্তী বলেছেন, 'পুরনো ট্রেনকে নতুন নাম দিয়ে চালু করে নাটক করার চেয়ে, এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে এখনই রেলে নিরাপত্তা বাড়ানো উচিত।

মুম্বইয়ের এক লোকাল ট্রেনে নাবালিকা স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনা নিয়ে 'জাগো' তৈরি করেছিলেন পরিচালক মেহুল কুমার। মেয়ের সেই মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে রবিনা ট্যান্ডন নিজেই দুষ্কৃতীদের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিলেন। অবশেষে সেই দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু পার্ক সার্কাসের ঘটনার পর প্রশ্ন উঠছে, এখানে 'জাগো' রব তুলবে কে? পুলিশ? রেল দপ্তর? নাকি অসহায় যাত্রীরা? নাকি মুম্বাইয়ের মতো হংসিকা মটুয়ানির মায়েরা?

একদিন ১০.১১.২০০৯

ভিনধর্মে বিয়ে : যুবক খুনে ধৃত ৩

মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থানার নিয়াল্লিশপাড়া-গোয়ালজান গ্রামপঞ্চায়েতের প্রত্যন্ত গ্রাম লক্ষ্মণপুরে শুক্রবারও ছিল শ্মশানের নিস্তব্ধতা। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই গ্রামের জুনিয়র বেসিক স্কুলের প্রাঙ্গণেই বসেছিল সালিশি সভা। ১৪ জুলাইয়ের সেই সভায় ১০ জন মোড়ল মিলে শৈলেন্দ্র প্রসাদের (৩২) মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল। শৈলেন্দ্রের অপরাধ, সে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল ওই গ্রামেরই মনেরা খাতুনকে (২৫)। ভালোবাসার গভীরতা এতটাই ছিল, শৈলেন্দ্র নিজের ধর্ম লুকিয়ে মুন্না শেখ নাম ধারণ করে মনেরার সঙ্গে লক্ষ্মণপুরে থাকতে শুরু করেছিল। মুম্বইতে পরিচারিকার কাজ করত মনেরা। শৈলেন্দ্র ছিল রাজমিস্ত্রি। আড়াই বছর আগে বিহারের শৈলেন্দ্রের সঙ্গে লক্ষ্মণপুরের মনেরার বিয়ে হয় রেজিস্ট্রি করে। ইতিমধ্যে তাদের এক শিশুপুত্রও হয়। শ্বশুরবাড়িতে পরিচয় লুকিয়ে

এরমধ্যে কয়েকবার শৈলেন্দ্র থেকেও ছিল। এ বছরের ১ জুলাই মুম্বই থেকে ছেলের টানে আবারও সে লক্ষ্মণপুরে আসে। পরিচয় লুকিয়ে থাকতে শুরু করে। কিন্তু বিধি বাম। ১৪ জুলাই শ্বশুর আনসারিয়া শেখের সন্দেহ হয়। গ্রামের কয়েকজন মোড়লকে জুটিয়ে শৈলেন্দ্রের দেহ তল্লাশি হয়। পরীক্ষা করা হয় যৌনাঙ্গ। এরপরেই শ্বশুর নিশ্চিত হয়, জামাই ভিন্নধর্মের। বসে সালিশি সভা। সেই সভাতেই গাজু শেখ, সাত্তার শেখ, খায়রুল শেখরা 'মৃত্যুদণ্ড' ঘোষণা করে। সেই মোতাবেক শৈলেন্দ্রের মুণ্ড কেটে গ্রামের পাট খেতে পুঁতে দেয়। তিনদিন পর ১৭ জুলাই মুণ্ডহীন দেহ উদ্ধার হয়। ৩০ জুলাই বহরমপুর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে মনেরা গোপন জবানবন্দি দেয়। সেদিন রাতেই তিন মোড়লকে গ্রেপ্তারের পরে বিষয়টি জানাজানি হয়।

লক্ষ্মণপুর এবং তার পার্শ্ববর্তী দেবীদাসপুর, পুজিরৎপুর, খিলিপাড়া, অবদালপাড়া, নামুডিহা, উপরডিহা, ডিমপুর গ্রামে চাপা উত্তেজনা নতুন করে দেখা দেওয়ায় শুক্রবার ফের তদন্তে যায় পুলিশ। প্রায় চার ঘন্টা ধরে গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তারা বাকি সাতজনের নাম জানার চেষ্টা করে। কিন্তু দেড় হাজার বাসিন্দা সম্বলিত লক্ষ্মণপুরে কেউই এ বিষয়ে পুলিশের কাছে মুখ খোলেনি। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার দেবাশিস বেজ বলেন, "তদন্ত চলছে। তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে। বাকিদের খোঁজ চলছে। ওই গ্রামে বারবার পুলিশ যাচ্ছে। মৃতের শ্বশুর এবং বাকি অভিযুক্তরা পলাতক।" এদিকে এই গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা সন্তোষ মণ্ডল, মহাদেব ঘোষ, পল্টু শেখ, সাধন নাথ, আশিস প্রামানিক প্রমুখ সাফ বলেন, "এতবড় একটি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় পুলিশ ক্যাম্প বা ফাঁড়ি নেই। এ জাতীয় ঘটনা ঘটিয়ে অপরাধীরা সহজেই গা ঢাকা দেয়।"

দৈনিক স্টেটসম্যান ০২.০৮.২০০৮

পুণে কাণ্ডে থাকতে পারে হিন্দু মৌলবাদীর হাতও

পুণে বিস্ফোরণ কাণ্ডে চরমপন্থী হিন্দুদের হাতও থাকতে পারে। এমনই মনে করছে মহারাষ্ট্র সরকার। মঙ্গলবার এ কথা জানিয়েছেন মহারাষ্ট্র সরকারের উচ পদস্থ আধিকারিক।

মহারাষ্ট্র সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতরের ওই আধিকারিক মঙ্গলবার সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, পুণের বিস্ফোরণের সঙ্গে কোনও হিন্দু মৌলবাদী সংগঠনের যুক্ত থাকার আশঙ্কার কথাও তাঁরা একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন না। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি পুণের প্রাণকেন্দ্রে কোরেগাঁও অঞ্চলের ওশো আশ্রমের একেবারে গা-লাগোয়া ওশো কমিউন লেনের ব্যস্ত জার্মান বেকারি রেস্তোরাঁয় এক বিস্ফোরণে প্রাণ হারায় ১৫ জন। এঁদের মধ্যে চার বিদেশিনীও রয়েছেন। ঘটনার পরে পরেই একই সঙ্গে কেন্দ্র ও মহারাষ্ট্র সরকারের তরফ থেকে শঙ্কা প্রকাশ করা হয়, ২৬/১১-র মতোই এই ঘটনার পিছনেও পাকিস্তানি জঙ্গি সংগঠনের হাত রয়েছে। দফতরের আধিকারিকের মঙ্গলবারের এই বিবৃতির পরে গোটা বিষয়টিই নতুন করে বিবেচনা করে দেখবে গোয়েন্দা সংস্থাগুলিও।

এমনিতে পুণে শহর চরম দক্ষিণপন্থীদের ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল। তাই তাদের যোগসাজশের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। যদিও এখনও পর্যন্ত সে বিষয়ে কোনও প্রমাণ পুলিশের হাতে এসে পৌঁছয়নি। সংবাদমাধ্যমের থেকে পাওয়া তথ্য অবশ্য এ বিষয়ে অভিনব ভারত গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ খুঁজে পেয়েছে। গোপাল গডসের কন্যা হিমানী সাভারকরের নেতৃত্বাধীন এই অভিনব ভারত গোষ্ঠী। 'গডসে' পদবী যে কারণে

ভারতবাসীর কাছে পরিচিত, ঠিক সেই কারণেই পরিচিত বা কুখ্যাত গোপাল গডসে ও তাঁর পরিবার। মহাত্মার হত্যাকারী নাথুরাম গডসের ভাই এই গোপাল গডসে।

সংবাদমাধ্যমের কাছে থাকা তথ্য অনুযায়ী গোটা বিষয়টি তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি বা এনআইএ-র হাতে। যদিও একই সঙ্গে অ্যান্টি টেররিজম স্কোয়াড বা সন্ত্রাসদমন শাখা-ও তদন্ত চালিয়ে যাবে। তবে স্বরাষ্ট্র দফতরের ওই আধিকারিক জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনও নির্দেশ তাঁদের কাছে আসেনি।

একদিন, ২৪.০২.২০১০

মেয়েকে খুনে বাবা, মায়ের যাবজ্জীবন

মেহনাজ বানোকে খুনের অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে তাঁর বাবা ও মায়ের। আজ মুম্বাইয়ের এক দায়রা আদালত এই রায় দিয়েছে। এই খুনের ঘটনায় যুক্ত থাকার জন্য মেহনাজের এক নাবালিকা বোনকে শিশু সংশোধনাগারে রাখা হয়েছে।

২০০৬ সালের ২ জুলাই মুম্বইয়ের নাগপাড়ার বাসিন্দা মহম্মদ মুন্না খান, তাঁর স্ত্রী শেহনাজ খান ও তাদের ছোট মেয়ে গুলনাজ মিলে শ্বাসরোধ করে খুন করে মেহনাজকে (১৮)। পাড়ার এক হিন্দু ছেলের সঙ্গে মেয়ে মেহনাজের প্রেমের সম্পর্ক মেনে নিতে না পেরেই নিজের মেয়েকে মেরে ফেলে বাবা-মা। দিদিকে খুনে বাবা-মাকে সঙ্গ দিয়েছেন মেহনাজের ছোট বোন গুলনাজ (১৪)।

খুনের পরে মেহনাজের দেহ এগারোটি টুকরো করে দু'টি বস্তায় পুরে বায়াকুল্লা উড়ালপুরের নীচে ফেলে আসে মুন্না। যে সংস্থায় মুন্না কাজ করত, তার লোগো লাগানো বস্তা দু'টি উদ্ধার করে পুলিশের সন্দেহ হয়। শেষে জেরায় মেয়েকে খুনের কথা স্বীকার করে মুন্না ও তার স্ত্রী।

আনন্দবাজার পত্রিকা ১২.০৭.২০০৮

মুসলিম তোষণ প্রধানমন্ত্রীর, বিক্ষোভে মুলতুবি সংসদ

মনমোহন সিংয়ের বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে জমজমাট সংসদে আজ কোনও কাজ হল না। দিনভর তুঙ্গস্পর্শী হট্টগোলে ভণ্ডুল হয়ে গেল সংসদের যাবতীয় কর্মসূচি।

প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু তোষণের অভিযোগ তুলে লোকসভা ও রাজ্যসভায় আজ ব্যাপক হইহট্টগোল বাধিয়ে দেন বিজেপি এবং শিবসেনা সাংসদরা। তাঁদের দাবি ছিল, ক্ষমা চাইতে হবে প্রধানমন্ত্রীকে। কিন্তু বিজেপি এবং শিবসেনার অন্যায্য দাবির বিরুদ্ধে সরব হন কংগ্রেসিরাও। দু'তরফের টানা গোলমালের জেরে এক সময় সংসদ আজকের মতো মুলতুবি রাখতে হয়। গোলমালের ফলে সংসদ যেন হট্টমেলার রূপ নেয়। সেখানে কোন কাজই হয়নি।

মনমোহন সিংয়ের একটি মন্তব্যকে ঘিরেই আজ উত্তাল হয়ে ওঠে সংসদ। প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি বলেন, জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের কল্যাণমূলক সমস্ত প্রকল্প ও কর্মসূচিতে সংখ্যালঘু, বিশেষত মুসলিমদের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। দেশের সম্পদের উপরও সংখ্যালঘুদেরই প্রথম অধিকার, বলেছিলেন মনমোহন সিং। তাঁর এই মন্তব্যে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে বিরোধী বিজেপি শিবসেনা। প্রতিবাদের জন্য লোকসভা ও রাজ্যসভাকেই বেছে নেন তাঁদের সাংসদরা। সংসদের দুই কক্ষে তুমুল সমালোচনার মুখে পড়ে যান মনমোহন।

কক্ষের অধ্যক্ষরা চেষ্টা করেছিলেন বিরোধীদের থামাতে। কিন্তু ব্যর্থ হন। মধ্যাহ্ন বিরতির আগেই কমপক্ষে তিন তিনবার সাময়িক মুলতুবি রাখতে হয় সংসদ।

রাজ্যসভায় আজ শুরু থেকেই গোলমাল পাকান বিরোধীরা। লোকসভায় গণ্ডগোল শুরু হয় একটু দেরিতে। তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রীয় সমিতির নবনির্বাচিত সাংসদ কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের শপথ নেওয়ার পর। বিরোধী বেঞ্চ থেকে স্লোগান উঠতে থাকে— 'প্রধানমন্ত্রী মাফি মাঙ্গো' মানে 'সভায় এসে ক্ষমা চান প্রধানমন্ত্রী', 'দেশ কো মাত হস্তো', মানে 'দেশকে ভাগ কোরো না' ইত্যাদি বলতে বলতে বিজেপি ও শিবসেনার সাংসদরা ওয়েলে নেমে এসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। সঙ্ঘ সাংসদদের চিৎকারের জবাবে কংগ্রেস শিবির থেকেও চেঁচানো শুরু করে দেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি। বিজেপি-র বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ তুলে বলেন, কংগ্রেস নয়, বিজেপি-ই দেশভাগের খেলায় নেমেছে। লোকসভায় বিজেপি-সংসদীয় নেতা ভি কে মালহোত্রা প্রশ্নোত্তর পর্ব বাতিল করে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য নিয়ে আলোচনার দাবি জানান। অন্য বিরোধীরা প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতির কপি দেখিয়ে ক্ষমা চাওয়ার দাবি তোলেন। কিন্তু বিরোধীদের দাবিতে কান না দিয়ে স্পিকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, প্রশ্নোত্তর পর্বের পর সাংসদরা চাইলে আলোচনা হতে পারে। স্পিকারের বক্তব্যের পর বিরোধীদের আর রোখা যায়নি। বার বার মুলতুবি রাখতে হয় সংসদের কাজ।

এদিকে, রাজ্যসভার ছবিটাও ছিল আজ প্রায় লোকসভার মতোই। এই কক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি নিয়ে আলোচনার দাবি তোলেন বিরোধী বিজেপি-র দলনেতা যশোবন্ত সিং। কিন্তু চেয়ারম্যান ভৈরোঁ সিং শেখওয়াত সেই দাবি নামঞ্জুর করে দেওয়ায় ব্যাপক গোলমাল হয় রাজ্যসভাতেও। যশোবন্তকে বলতে দেওয়ার দাবি জানান রাজনাথ সিং, অরুণ শৌরি, যশোবন্ত সিনহা, মনোহর যোশি, সুষমা স্বরাজরা। শেখওয়াত নারাজ হন। ফলে এখানেও প্রতিবাদ জানাতে সাংসদরা ওয়েলে নেমে আসেন। লোকসভার স্লোগানগুলি এখানেও শোনা যায়। গোলমালে সভা পণ্ড হয়ে যায় বার বার। প্রশ্নোত্তর পর্বের পরও তা থামার কোনও লক্ষণ ছিল না।

লোকসভা ও রাজ্যসভায় দিনভর চাপানউতোরের জেরে শেষ পর্যন্ত আজকের মতো সভা মুলতুবির ঘোষণা করে দিতে বাধ্য হন গোলমাল থামাতে ব্যর্থ দুই কক্ষের স্পিকাররা। 'প্রধানমন্ত্রীর সংখ্যালঘু তোষণের ইস্যু'তে আজ কার্যত কোনও কাজই হয়নি সংসদে। চেঁচামেচি আর হইহট্টগোলই ছিল সার। এর জন্য অবশ্য একজন জনপ্রতিনিধিরও কোনও অনুশোচনা হয়েছে বলে খবর নেই।

দৈনিক স্টেটসম্যান ১২.১২.২০০৬

দেশভাগের জন্য দায়ী হিন্দু মহাসভা, আরএসএস : অর্জুন সিং

দেশভাগের জন্য দায়ী ছিল তৎকালীন হিন্দু মহাসভা এবং আর এস এস। শনিবার এই মন্তব্য করেছেন মানব সম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী অর্জুন সিং। পাশাপাশি গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং নীতিহীনতার জন্যই আগামী দিনে দেশের মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

এদিন এখানে এক আলোচনাসভায় অর্জুন সিং বলেন, "যদিও দেশের মানুষ জানেন মহম্মদ আলি জিন্না দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবক্তা কিন্তু একথা অনেকেই জানেন না যে তারও

আগে থেকে হিন্দু এবং মুসলিমদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করেছিল তৎকালীন হিন্দু মহাসভা এবং আর এস এস। ইতিহাস এই ঘটনার সাক্ষী। মানছি দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে জিন্না দ্বিজাতি তত্ত্বের সুবিধা নিয়ে পাকিস্তান তৈরি করেছিলেন। কিন্তু দেশভাগের আবহ তৈরি করেছিল হিন্দু মহাসভা এবং আর এস এস।"

সিং আরও বলেন, "কংগ্রেস কখনোই দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিঘ্ন ঘটায়নি। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ এদেশের মুসলিম জনসংখ্যা। যা পাকিস্তানে বসবাসকারী মুসলিমদের জনসংখ্যার চেয়ে বেশি। এই যে এত মুসলমান দেশভাগ হওয়া সত্ত্বেও এদেশে থেকে গেলেন, তা কিন্তু তাঁদের অসহায়তার জন্য নয়। তাঁরা রয়ে গিয়েছেন কেবলমাত্র কংগ্রেসের প্রতি বিশ্বাস এবং আস্থার জন্য।"

পাশাপাশি অর্জুন সিং বলেন, বিজেপিতে কোনও নীতি নেই। দলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এতটাই প্রকট যে বর্ষীয়ান নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ী পর্যন্ত দলের সামনের সারি থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছেন। নীতিহীনতা এবং গোষ্ঠী কোন্দলের জন্য খুব তাড়াতাড়িই বিজেপির সংগঠন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

দৈনিক স্টেটসম্যান ০৮.০১.২০০৬

জঙ্গি দমনের নামে সন্ত্রস্ত করা চলবে না মুসলিমদের, নির্দেশ সোনিয়ার

ইউ পি এ সরকারের 'অন্তরাত্মা' সোনিয়া গান্ধীর নির্দেশ হল, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার নামে মুসলিম সম্প্রদায়কে বেছে বেছে ভীত-সন্ত্রস্ত করা চলবে না। এ ব্যাপারে কংগ্রেস দলকে সজাগ ও সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন সোনিয়া গান্ধী। কংগ্রেসের সব দলীয় মুখ্যমন্ত্রীদের সুনির্দিষ্টভাবে এই নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি সোনিয়া একথা প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাতিলকেও জানিয়ে দিয়েছেন। সম্প্রতি জুলাই মাসে মুম্বই বিস্ফোরণের পর মহারাষ্ট্রে পুলিশ ও গোয়েন্দা বাহিনী যেভাবে মুসলিম যুবকদের ধরপাকড় চালিয়েছে বা চালাচ্ছে, তাতে কংগ্রেস সভানেত্রী আদৌ খুশি নন বলে দলীয় সূত্রের খবর।

তাই প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে শুরু করে কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রীদের সোনিয়া গান্ধী গত এক-দেড় মাসে বার বার বলে চলেছেন, 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে যেন ধর্মের ভিত্তিতে সমাজকে ভাগ করে না দেওয়া হয়।' কংগ্রেস দলের সরকারি কর্তাদের 'অন্তরাত্মা' আরও বলেছেন, দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষায় আমরা কোনও আপস যেমন করব না, তেমনি একতরফা মুসলিম সম্প্রদায়কেও টার্গেট করব না। বরং মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কেন্দ্র ও দলীয় রাজ্য সরকারগুলিকে আরও বেশি মনোযোগী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন কংগ্রেস সভানেত্রী। পার্টির শীর্ষস্থানীয় কর্তাব্যক্তিদের এই নির্দেশ দেওয়ার পর এবার কংগ্রেস দলের মাসিক মুখপত্র 'সন্দেশ' পত্রিকায় কংগ্রেস কর্মীদের উদ্দেশ্যে খোলা চিঠিতেও সোনিয়া গান্ধী লিখেছেন, 'সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা যেন কোনও একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে ভীত-সন্ত্রস্ত করায় পর্যবসিত না হয় তা আমাদের সুনিশ্চিত করতে হবে।'

কংগ্রেসের রাজনৈতিক ম্যানেজারদের মতে, সামনেই উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় ভোট আসছে। সেখানে এবার মুসলিম সম্প্রদায়ের এক বড় অংশকে সমাজবাদী 'সুপ্রিমো' মুলায়ম সিং যাদবের দিক থেকে ভাঙিয়ে আনা যাবে বলে ম্যাডাম মনে করছেন।

বিশেষ করে গত মাসে উত্তরপ্রদেশের কানপুর এবং বেরিলিতে সোনিয়া গান্ধীর দুটি জনসভায় মুসলিম সম্প্রদায় যেরকম উপচে ভিড় জমিয়েছিল, তাতে 'ম্যাডাম' আশান্বিত যে এবার ওই রাজ্যের মুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মুলায়ম সরকারের পতন চাইছে।

দীর্ঘদিন বাদে উত্তরপ্রদেশের মুসলিমরা অনেকেই আবার কংগ্রেসের প্রতি নরম হয়েছে। তাই এ সময় সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার নামে বেছে বেছে মুসলিম সম্প্রদায়কে টার্গেট করা হলে, কংগ্রেসের পক্ষে এই আপাত-অনুকূল পরিস্থিতি বদলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সোনিয়া গান্ধী তা কোনও ভাবেই হতে দিতে চাইছেন না।

বর্তমান, ৩১.১০.২০০৬

হজ ও অন্যান্য তীর্থে ভরতুকি খারিজ হাইকোর্টের

হজ সহ অন্যান্য তীর্থযাত্রীদের ভরতুকি প্রদানে জারি করা স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের জন্য কেন্দ্র এবং উত্তরপ্রদেশ সরকারের আবেদন আজ খারিজ করে দিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। বিচারপতি এ কে যোগ এবং বিচারপতি শৈলেন্দ্র সাক্সেনাকে নিয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলির কারোর তীর্থ যাওয়ার খরচ বহন করা উচিত নয়।

বর্তমান, ০৮.০৯.২০০৬

মুসলিমদের নেহস্তা না করতে নির্দেশ

সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করতে গিয়ে অকারণে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়কে সন্দেহ ও হয়রান না করার জন্য আজ সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের নির্দেশ দিলেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে এদিন দীর্ঘ সাড়ে ৬ ঘণ্টার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এই নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'মুসলিম সংখ্যালঘুদের মধ্যে সম্প্রতি যে ভয় ও নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিয়েছে, দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তার ভয়াবহ পরিণাম হতে পারে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সন্ত্রাসবাদের পালটা হিসাবে আজকাল মুসলিম সম্প্রদায়কে টার্গেট করা হচ্ছে।' এই প্রবণতা রুখতে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় মুসলিম সম্প্রদায়কে আরও বেশি মাত্রায় শামিল করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীদের উদ্যোগ নেওয়ার আর্জি জানালেন মনমোহন সিং।

বর্তমান, ০৬.০৯.২০০৬

১৫ শতাংশ ব্যাংক ঋণ মুসলিমদের দিতে দাবি বামেদের

আসন্ন কেন্দ্রীয় বাজেটে কৃষি ঋণে সুদের হার চলতি ৭ থেকে কমিয়ে ৪ শতাংশ করতে হবে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির দেওয়া ঋণের ১৫ শতাংশ মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে বেঁধে দিতে হবে। এই মর্মে ৪ বামদল প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমের কাছে লিখিত দাবি পাঠাচ্ছে। ৪ বামদলের তরফে সি পি এমের সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত আজ বাজেট সংক্রান্ত এমন এক ডজনেরও বেশি দাবি সম্বলিত একটি নোট তৈরি করেছেন। আগামী ২-১ দিনের মধ্যেই তা ইউপিএ সরকারের কাছে পাঠানো হবে।

বর্তমান, ০২.০২.২০০৭

রাজ্যে পুলিশে বাড়াতে হবে সংখ্যালঘুর সংখ্যা

রাজ্যে রাজ্যে পুলিশে নিয়োগের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। রেল, রাষ্ট্রয়ত্ত্ব ব্যাঙ্ক, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানেও চাকরির ব্যাপারে বাড়তি নজর দিতে হবে। সংখ্যালঘুদের সরকারি প্রতিষ্ঠানে এবং নামী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের ব্যাপারেও বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। কেন্দ্রীয় পুলিশবাহিনীতেও বিশেষ নজর দিতে হবে সংখ্যালঘুদের নিয়োগের ক্ষেত্রে। দাঙ্গাপ্রবণ এলাকায় দক্ষ, পক্ষপাতহীন ও ধর্মনিরপেক্ষ অফিসারদের নিয়োগ করতে হবে। জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধ অন্যতম প্রধান কাজ হবে। দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে কড়া শাস্তি দিতে হবে দাঙ্গাবাজদের। অফিসারদের প্রমোশনের ক্ষেত্রেও এইগুলি বিচার করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে যে পনেরো দফা নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন তাতে সংখ্যালঘুদের উন্নতিতে বিভিন্ন কর্মসূচির উল্লেখ রয়েছে। বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছে সংখ্যালঘুদের আর্থিক উন্নতির দিকে। চাকরির ক্ষেত্র ছাড়াও আরও নানা অর্থনৈতিক পদক্ষেপের কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। যেমন ইন্দিরা আবাস যোজনায় আলাদা করে গ্রামীণ দরিদ্র সংখ্যালঘুদের জন্য লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করতে বলা হয়েছে। নেহরু বস্তি উন্নয়ন মিশন প্রকল্পের ক্ষেত্রেও সমানুপাতিক হারে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব রাখার ব্যাপারেও নজর দিতে বলা হয়েছে। 'যথেষ্ট সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা' বলতে বোঝানো হয়েছে যেখানে সেখানকার অধিবাসীদের সিকিভাগ সংখ্যালঘু।

এছাড়াও, জোর দেওয়া হয়েছে সংখ্যালঘুদের শিক্ষার প্রসারের দিকেও। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের ক্ষেত্রে দেখতে হবে যাতে সংখ্যালঘু এলাকায় এই প্রকল্পের কিছু কেন্দ্র বা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র খোলা হয়। সর্বশিক্ষা অভিযানসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রসার প্রকল্পের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় যাতে সমান নজর থাকে তা সুনিশ্চিত করতে হবে। বিভিন্ন রাজ্যে উর্দুভাষার শিক্ষক যাতে যথেষ্ট পরিমাণে থাকেন, তাও দেখতে হবে। শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘুদের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণের কাজ আরও জোরদার করতে হবে। মেধাবী সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। মৌলানা আজাদ শিক্ষা ফাউন্ডেশনের টাকায় যাতে আরও ভাল কাজ হয়, তাও দেখবে সরকার।

সংখ্যালঘুদের আর্থিক উন্নতির জন্য স্বনিযুক্তির উপরেও জোর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। স্বর্ণজয়ন্তী স্বরোজগার যোজনায় ব্যাঙ্ক ঋণ ও সরকারি ভরতুকি দিয়ে সংখ্যালঘুদের স্বনিযুক্তির বিষয়ে আলাদা জোর দিতে হবে। একইভাবে স্বর্ণজয়ন্তী শহরি রোজগার যোজনা, আরবান ওয়েজ এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রামেও আলাদা করে দরিদ্র সংখ্যালঘুদের জন্য ব্যবস্থা রাখতে হবে। তাদের দিতে হবে কারিগরি প্রশিক্ষণ। যেখানে ইতিমধ্যেই কারিগরি প্রশিক্ষণের সুযোগ আছে, সেখানে সেই কেন্দ্রগুলি আরও উন্নত করতে হবে। গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পেও তাদের দিকে আলাদা নজর দিতে হবে।

অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্যোগের সমালোচনা শুরু হয়েছে বিরোধীমহলে। তারা সরাসরি একে মুসলিম তোষণ বলতে আরম্ভ করেছে। বলা হচ্ছে, পাঁচটি রাজ্যের ভোটের আগে সংখ্যালঘুদের মন টানতেই কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদ্যোগ। তাছাড়া, সাচার কমিটির রিপোর্ট ফাঁস হওয়ার পর যথেষ্ট উদ্বেগে কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক। ওই মন্ত্রকের মন্ত্রী এ আর আন্তুলে জানিয়েছেন, সংখ্যালঘুদের সার্বিক উন্নতিতে ইউ পি এ সরকার

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর পিছনে কোনও রাজনৈতিক মতলব নেই।

দৈনিক স্টেটসম্যান, ০৪.১১.২০০৬

সংখ্যালঘুদের জন্য তিন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ১৫ শতাংশ সংরক্ষণ

ইন্দিরা আবাস যোজনা, সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনা এবং স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা— এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ভবিষ্যতে ১৫ শতাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষণ থাকবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এবং তাদের সামাজিক কল্যাণের জন্য ইউ পি এ সরকার যে '১৫ দফা কর্মসূচি' রূপায়ণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার রূপরেখা তৈরির কাজ সমস্ত মন্ত্রকে জোর কদমে শুরু হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রক সর্বপ্রথম সেইসব প্রকল্প চিহ্নিত করে ফেলেছে, যেগুলিতে সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে।

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই তিন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের জন্য জাতীয় ভাবে কেন্দ্র যা বরাদ্দ করবে তার ১৫ শতাংশ টাকা এবং কাজের যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হবে তারও একটি অংশ সংখ্যালঘুদের জন্য বরাদ্দ থাকবে। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা দপ্তর সম্প্রতি এই মর্মে নির্দিষ্ট সার্কুলার তৈরি করে সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রকে পাঠিয়ে দিয়েছে।

উল্লেখ্য, সংখ্যালঘুদের সামাজিক উন্নতির জন্য ঘোষিত '১৫ দফা কর্মসূচি' কীভাবে রূপায়ণ করা সম্ভব, তা চিহ্নিত করতে কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সংখ্যালঘু উন্নয়নমন্ত্রককে এই কর্মসূচির নোডাল এজেন্সির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের ওই সার্কুলার সব রাজ্য সরকারকে পাঠানো শুরু হয়েছে। এমনকী আপাতত চলতি আর্থিক বছরের জন্য এইসব চলতি আর্থিক বছরের জন্য এইসব প্রকল্পে সংখ্যালঘুদের জন্য কত টাকা বরাদ্দ হবে, তার একটি তালিকাও তৈরি হয়েছে। সমাজের পিছিয়ে পড়া এবং দরিদ্রতম অংশের সামাজিক বিকাশের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যে সব প্রকল্প সবচেয়ে বেশিদিন ধরে চলছে এবং যেগুলির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি সেগুলির মধ্যে প্রধান হল ইন্দিরা আবাস যোজনা, সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনা এবং স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা। প্রথমটি গৃহহীন দরিদ্রের জন্য আবাস নির্মাণ। দ্বিতীয়টির লক্ষ্য, অতিরিক্ত কর্মসংস্থান এবং খাদ্য নিরাপত্তা দেওয়া। আর তৃতীয় প্রকল্পটির উদ্দেশ্য শিক্ষাহীন, জীবিকাহীন দরিদ্রদের জন্য স্বনিযুক্তির মাধ্যমে রোজগারের ব্যবস্থা করা এবং তাদের বিপিএল তালিকার বাইরে নিয়ে আসা। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রক এই তিন প্রকল্পকে চিহ্নিত করেছে সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষণের জন্য।

স্থির হয়েছে যে প্রকল্পটি একান্তভাবেই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে রূপায়িত হয় সেই সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনায় ১৫ শতাংশ সংরক্ষণ দেওয়া হবে সংখ্যালঘুদের জন্য। স্বর্ণজয়ন্তী গ্রামীণ স্বরোজগার যোজনার ক্ষেত্রে আর্থিক সংরক্ষণ দেওয়া হবে না। ওই প্রকল্পে কাজের একটি নির্দিষ্ট অংশ সংরক্ষিত থাকবে। জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন আইন অনুযায়ী সংখ্যালঘু হিসেবে তালিকাভুক্ত সম্প্রদায়গুলিই এই সুবিধা পাবে। এরা হল, মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, শিখ এবং পার্সি।

কিন্তু যেসব রাজ্যে এইসব সম্প্রদায় সংখ্যাগুরু সেখানে অন্য সম্প্রদায়গুলি সংরক্ষণের সুবিধা পাবে। যেমন জম্মু কাশ্মীরে মুসলিম, পাঞ্জাবে শিখ, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড ও

মিজোরামে খ্রিস্টান সম্প্রদায় সংখ্যাগুরু। সেখানে এরা সংরক্ষণের সুযোগ পাবে না।

বর্তমান, ২৭.১২.২০০৬

শুধু বিনয় কাটিয়া বললেই দোষ?

একটি সাম্প্রতিক খবরে দেখা গেল কলকাতার বেশ কয়েকটি মসজিদের ইমামরা একজোট হয়ে ঘোষণা করেছেন, তসলিমা নাসরিনকে কেউ হত্যা করলে তাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। সংবাদমাধ্যমের কাছে তাঁরা সে কথা স্বীকার করেছেন এবং বলেছেন, তসলিমা যেহেতু 'ধর্মনিরপেক্ষতার শত্রু', তাই ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচিত তাঁকে অবিলম্বে ভারত ছাড়তে বাধ্য করা। সরকার যদি এমন নির্দেশ না দেন, তা হলে তাঁদের কথা অনুযায়ী তাঁরা নিষ্ক্রিয় থাকবেন না। এই খবর বেরনোর পরে স্বভাবতই আশা করেছিলাম যাঁরা এই রকম সংবিধানবিরোধী এবং অপরাধে উস্কানিমূলক কথা বলেন, সরকার তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেবে।

মাত্র কিছুদিন আগেই যখন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিনয় কাটিয়ার কাশ্মীরে বলেছিলেন যে, প্রত্যেক ইসলামি উগ্রপন্থীকে মারার জন্য তাঁরা এক লক্ষ টাকা করে পুরস্কার দেবেন, তখন বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতারা, যাঁদের মধ্যে বামপন্থীরা পুরোভাগে ছিলেন, জোরালো প্রতিবাদ করেন ও ধিক্কার জানান। কাটিয়ারের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা হয়। কাটিয়ার তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেন। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ নাগরিক হিসাবে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, উগ্রপন্থায় উস্কানি দেওয়া এই ইমামদের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, যার মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং পুলিশমন্ত্রী, কী আইনি বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছেন?

মুখ্যমন্ত্রী কি মনে করেন, তাঁর মরূদ্যানে উগ্রপন্থার আগাছা তুলতে হবে না, তা আপনিই শুকিয়ে যাবে? গণতান্ত্রিক বাক-স্বাধীনতার সীমা নিশ্চয়ই হত্যার উস্কানি পর্যন্ত নয়। ইমামদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকলে তসলিমারও আছে, তাতে তিনি আক্রান্ত হবেন কেন? এর পর যদি উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা এই ইমামদের খতম করার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে, তখনও সরকার নির্লিপ্ত থাকবে তো? বামপন্থীরা কি কাছের অতীতের ইতিহাস ভুলে গিয়েছেন? গণতান্ত্রিক সরকারে নিষ্ক্রিয়তার ছিদ্র দিয়ে বেড়ে ওঠে ফ্যাসিবাদ ও উগ্রপন্থা।

আনন্দাবাজর পত্রিকা, ৩১.০৭.২০০৬

আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ চালু করবে কেন্দ্র

কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিতে অবশেষে মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ চালু করতে চলেছে ইউ পি এ সরকার। আজ এখানে অল ইন্ডিয়া এডিটরস কনফারেন্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের সংখ্যালঘু বিষয়কমন্ত্রী সলমন খুরশিদ এ কথা জানান। তিনি ঘোষণা করেন, এই ব্যাপারে বিভিন্ন মন্ত্রকের মতামত নেওয়ার কাজ প্রায় শেষ। কিছুদিনের মধ্যেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে। খুরশিদ জানান, এই ব্যাপারে কর্ণাটক মডেল অনুসরণ করতে চলেছে কেন্দ্র। অর্থাৎ আর্থিক মানদণ্ডকে বিবেচনায় রেখে পিছিয়ে থাকা মুসলিমদের জন্য বিশেষ সংরক্ষণ চালু করা হবে। আর্থিকভাবে সচ্ছল মুসলিমরা এই সংরক্ষণে সুবিধা পাবে না। পরে সাংবাদিকদের মন্ত্রী জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে এখন অন্যান্য অনগ্রসর

শ্রেণি বা ওবিসিদের জন্য ২৭ শতাংশ পদ সংরক্ষিত। অত্যন্ত পিছিয়ে থাকা মুসলিমদের এই ২৭ শতাংশের মধ্যেই বিশেষ কোটা দেওয়া হবে। তাঁর অনুমান এই কোটা ৬ শতাংশ হতে পারে।

কেন্দ্রের এই ঘোষণা নিশ্চিতভাবেই পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল ও কংগ্রেস জোটকে খুশি করবে। কারণ, সংখ্যালঘু ভোট ফিরে পেতে বামফ্রন্ট সরকার ইতিমধ্যেই দলিত মুসলিমদের জন্য ১০ শতাংশ পদ সংরক্ষণ করেছে। পুজোর আগেই এই সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশিকা বেরিয়ে যাবে বলে রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী যোগেশ বর্মন ক'দিন আগেই ঘোষণা করেছেন। তার আগে কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিতে মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ চালু হয়ে গেলে নিশ্চিত করেই বিধানসভা ভোটে আরও লাভবান হবে কংগ্রেস-তৃণমূল জোট। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রেলে যে নিয়োগ অভিযান চলছে, তাতেও লাভবান হবেন মুসলিমরা। খুরশিদ এদিন যখন সংরক্ষণের ঘোষণা করেন তখন মঞ্চে হাজির ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী তৃণমূলের সি এম জাটুয়া। তিনি দৃশ্যতই খুশি।

খুরশিদ জানান, রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশন এবং সাচার কমিটির রিপোর্ট খতিয়ে দেখে কেন্দ্র বেশ কিছু নতুন পদক্ষেপ নিচ্ছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, মুসলিমদের উন্নয়নে বরাদ্দ অর্থ খরচে নজরদারি। প্রধানমন্ত্রী ১৫ দফা কর্মসূচি এবং মুসলিম প্রধান এলাকায় বহুমুখী উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ অর্থ ঠিকঠাক খরচ হচ্ছে কিনা তা দেখা জন্য ৯০ জন জাতীয় পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। দেশের ৯০টি জেলার মুসলিমরা জনসংখ্যার ২০ শতাংশের বেশি। এরমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ১২টি জেলা আছে। আজ এখানে সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদকদের এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ। ছিলেন কেন্দ্রের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অম্বিকা সোনি।

বর্তমান, ১৩ জুলাই ২০১০

এক কোটি মুসলিম সংরক্ষণের আওতায় : মন্ত্রী

রাজ্যে মুসলিম জনসংখ্যার প্রায় ১ কোটি এখনও পর্যন্ত সংরক্ষণের আওতায় এসেছে। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা দপ্তরের মন্ত্রী আবদুস সাত্তার একথা জানিয়েছেন। ২০০১ সালের সেনসাস অনুযায়ী রাজ্যে মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ২ কোটি ২ লক্ষ। প্রসঙ্গত, ও বি সি হিসাবে চিহ্নিত মুসলিমদের জন্য সরকারি চাকরিতে ১০ শতাংশ বিশেষ সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ৩৫টি মুসলিম গোষ্ঠী ও বি সি-র স্বীকৃতি পেয়েছে। আরও বেশ কিছু মুসলিম গোষ্ঠীকে ও বি সি স্বীকৃতি দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। সরকারি সূত্রের খবর, রাজ্যে প্রায় দেড় কোটি মুসলিমকে ও বি সি হিসাবে চিহ্নিত করে বিশেষ সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কয়েক মাসের মধ্যে সরকারি চাকরিতে মুসলিম সংরক্ষণের ব্যাপারে সরকারি নির্দেশিকা জারি করা হবে।

এদিন সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের বাজেট বিতর্কে কংগ্রেসের আব্দুল খালেক মোল্লা অভিযোগ করেন, সংখ্যালঘু, বিশেষ করে মুসলিমদের জন্য সরকার কিছুই করেনি। তিনি এব্যাপারে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। কংগ্রেস বিধায়কের অভিযোগ অস্বীকার করেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার সংখ্যালঘুদের জন্য যা করছে তার থেকে অনেক বেশি

করছে রাজ্য সরকার। রঙ্গনাথ কমিশনের সুপারিশে সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষণ সহ বিভিন্ন সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও তা রূপায়ণ করতে কোনও উদ্যোগই নেয়নি কেন্দ্র। কিন্তু রাজ্য সরকার মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করছে। কংগ্রেস বিধায়কদের উদ্দেশে তিনি বলেন, মোল্লারা সংরক্ষণের মধ্যে চলে এসেছেন বলে আমি জেনেছি। মন্ত্রী বলেন, ও বি সি সার্টিফিকেট প্রদান প্রক্রিয়ার সরলীকরণ করা হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এফিডেভিট দিলেই সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে। এদিন বাজেট বিতর্কে মনোনীত বিধায়ক ব্যারি ও ব্রায়েন বলেন, চাকরিতে সংরক্ষণের চেয়েও জরুরি শিক্ষাক্ষেত্রে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। এই ব্যাপারে সরকার কী ভাবছে? মন্ত্রী জবাবে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, শিক্ষাতেও সংরক্ষণ হবে। কেন্দ্রীয় সরকার উচ্চ শিক্ষায় ও বি সি-দের সংরক্ষণ চালু করলেও রাজ্যে এখনও তা হয়নি। রাজ্যে শুধু স্কুল শিক্ষায় ওবিসি-দের জন্য সংরক্ষণ আছে। ব্যারি ও ব্রায়েন আরও বলেন, কলকাতা মৃতদেহ সংরক্ষণ ব্যবস্থায় ঘাটতি আছে। তাঁরা এর জন্য জমির ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। সরকারকে শুধু মৃতদেহ সংরক্ষণ করার পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে। আবদুস সাত্তার জানান, এই প্রস্তাব তাঁরা গ্রহণ করছেন।

বর্তমান, ০২.০৭.২০১০

নম্বর বেশি থাকলে সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীও জেনারেল ক্যাটিগরিতে পড়বেন

জেনারেল ক্যাটিগরির জন্য নির্ধারিত যোগ্যতামানের (কাট-অব মার্ক) চেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর বেশি থাকলে সংরক্ষিত শ্রেণির প্রাথমিক শিক্ষক পদপ্রার্থীকে জেনারেল ক্যাটিগরির জন্যই বিবেচনা করা যাবে। নম্বর তার চেয়ে কম থাকলে তার প্রার্থীপদকে সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত শ্রেণির কাট-অব মার্কের নিরিখে বিবেচনা করতে হবে। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি প্রণব চট্টোপাধ্যায় ও বিচারপতি মহম্মদ আবদুল ঘুনির ডিভিশন বেঞ্চ এই অভিমত দিয়েছে। এক অন্তর্বর্তী নির্দেশে বেঞ্চ, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রাথমিক স্কুল কাউন্সিলকে বলেছে, মামলাকারীদের ২৭ জুনের লিখিত পরীক্ষায় বসতে দিতে হবে। অবিলম্বে তাঁদের অ্যাডমিট কার্ড দিতে হবে।

রাস্তা তৈরির জন্য নন্দন মাইতি, চন্দন মাইতিদের জমি নিয়েছেন রাজ্য সরকার। এজন্য আইনানুযায়ী সংরক্ষিত বা একজেমটেড ক্যাটিগরির (বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণি) সুবিধা পাওয়া যাবে ধরে নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষক পদপ্রার্থী হিসাবে ফরম পূরণ করেছিলেন। কিন্তু প্রাসঙ্গিক সার্টিফিকেট দেখাতে না পারায় তাঁদের ফরম বাতিল হয়ে যায়। এই ঘটনার পর ২০১০ সালের মে মাসে জেনারেল ক্যাটিগরির প্রার্থী চেয়ে বিজ্ঞাপন দেয় কাউন্সিল।

এঁদের আইনজীবী কমলেশ ভট্টাচার্য এদিন আদালতে বলেন, মাধ্যমিকে নন্দনের প্রাপ্ত নম্বর ছিল ৬৪.৮০ এবং চন্দনের ৮০ শতাংশ। জেনারেল ক্যাটিগরির জন্য যোগ্যতামান বা কাট-অব মার্ক ৬৪.২৫ শতাংশ। কিন্তু তাঁদের প্রার্থীপদ আর বিবেচনা করা হবে না বলে কাউন্সিল জানিয়ে দেওয়ায় তাঁর হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তিনি বলেন, যাঁদের প্রাপ্ত নম্বর জেনারেল ক্যাটিগরির কাট-অব মার্কেট চেয়ে বেশি, তাঁদের পার্থিপদ কোন যুক্তিতে বাতিল করা যায়, তা ওই কাউন্সিলকে জানাতে বলা হোক। সেইসূত্রেই আদালত ওই নির্দেশ দিয়েছে।

বর্তমান, ২৫.০৬.২০১০

জনসংখ্যায় ২০২৫-এ চিনকে ছাপিয়ে যাবে ভারত, দাবি

চিনকে ছাপিয়ে ২০২৫-এর মধ্যে জনসংখ্যায় ভারতই প্রথম হতে চলেছে। এ কথা জানিয়েছে মার্কিন আদমসুমারি ব্যুরো। এই সংস্থা আরও জানিয়েছে পৃথিবীর সব থেকে বেশি জনবহুল দেশের তালিকায় ভারতের পাশাপাশি পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ-সহ তিনটি দেশ এই তালিকার প্রথম দশের মধ্যে থাকবে।

বর্তমান পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৩৩ কোটি জনসংখ্যার দেশ চিন, তালিকার প্রথমে। ১১৭ কোটি ৩০ লক্ষ জনসংখ্যার ভারত এই তালিকায় দ্বিতীয়। মার্কিন সংস্থার দেওয়া হিসাব অনুযায়ী ২০২৫-এর মধ্যে ভারতের সম্ভাব্য জনসংখ্যা হতে চলেছে ১৩৯ কোটি ৬ লক্ষ। চিনের এই জনসংখ্যা ২০২৫-এ হতে চলেছে ১৩৯ কোটি ৪ লক্ষের জনবহুল দেশ। ৩০ কোটি ১০ লক্ষ নাগরিকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন তৃতীয় স্থানাধিকারি। ২০২৫ সালে তার জনসংখ্যা হতে চলেছে ৩০ কোটি ৫৭ লক্ষ।

জনসংখ্যার তালিকায় ১৮ কোটি ৪ লক্ষ নাগরিকের পাকিস্তান আপাতত ষষ্ঠ স্থানে। ২০২৫ সালের মধ্যে তা ২২ কোটি ৮ লক্ষ জনসংখ্যা নিয়ে পঞ্চম স্থানে উঠে আসবে। বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়া দেশগুলির মধ্যে একমাত্র পাকিস্তান এবং বাংলাদেশই ভারতের ধারেকাছে। বর্তমানে পাকিস্তান ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে। ২০২৫-এর মধ্যে পাকিস্তানের জনসংখ্যা প্রায় চার কোটি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রকাশ করেছে ইউএস সেন্সস ব্যুরো। ভারতের মতো ইন্দোনেশিয়া এবং ব্রাজিলে জনসংখ্যা বিপুল হারে বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করছে তাঁরা। ২০৫০-এর মধ্যে এই জনসংখ্যা প্রায় চার গুণ হয়ে যাবে। যে ভাবে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে, তাতে ইতিমধ্যেই লাগাম না পড়ালে বিপদ আসন্ন। এগোতে হবে পরিকল্পনা মাফিক। না হলে বিপদ ঘোরতর হবে।

সকালবেলা, ৩১. ১২. ২০১০

সাতক্ষীরা, খুলনার লোকজন ক্যানিং, বাসন্তীতে দোকান, হোটেল, চোরা কারবার চালাচ্ছে

সুন্দরবনের ক্যানিং ও বাসন্তী ডকঘাট ক্রমেই বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের 'মুক্তাঞ্চলে' পরিণত হচ্ছে। মূলত বাংলাদেশের সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও খুলনা জেলা থেকে লোকজন এসে ঘাঁটি গেড়েছে এখানে। পুলিশ ও গোয়েন্দাদের কাছে এমন তথ্যও রয়েছে যে, বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে কয়েকজন বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় গুরু হিসাবে এখানকার বিভিন্ন জলসায় অংশ নিতে এসে পাকাপাকি ভাবে থেকে গিয়েছে। আবার বাংলাদেশের মৌলবাদী ছাত্র সংগঠন ইসলামিক ছাত্র শিবিরের কয়েকজন 'মাথাও' এখানে প্রতিনিয়ত আসা যাওয়া করছে। এই মাথারা সেদেশের জেহাদি বানানোর ক্যাম্পে ক্যানিং ও সংলগ্ন এলাকার ছাত্র-যুবকদের নিয়ে যাওয়ার কাজ করে। গোয়েন্দারা মানছেন, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক ও সংস্কৃতির মিলের কারণে এদের আলাদা করে চিহ্নিত করা সত্যিই কষ্টকর।

স্থানীয় বাসিন্দাদের একটি অংশের মদতে এবং ডান, বাম রাজনৈতিক দলের সাহায্যে মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরা সহজেই রেশন কার্ড, ভোটার পরিচয়পত্র জোগাড় করে রাতারাতি 'ভারতীয়' বনে যাচ্ছে। ডকঘাট, বখরাবনি, পিছামারি, পূর্ব শ্যামনগরসহ আশপাশের বেশ কয়েকটি এলাকায় জমিজিরেত কিনে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছে বাংলাদেশিরা। নিজের আস্তানা পাকা করার পর বাংলাদেশ থেকে পরিচিত লোকজনকে নিয়ে এসে 'এদেশীয়' বানানোর প্রক্রিয়াও চলছে দীর্ঘদিন ধরে। ভারতীয় বনে যাওয়া এই

বাংলাদেশিরা নিষিদ্ধ ঘোষিত স্টুডেন্টস ইসলামিক মুভমেন্ট অব ইন্ডিয়ার (সিমি) কাজকর্মের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়ছে বলে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন।

গত তিন-চার বছর আগে পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে যারা ক্যানিং ও বাসন্তী ডকঘাট সংলগ্ন এলাকায় আস্তানা গেড়েছিল তারা প্রত্যেকেই 'ভারতীয় হওয়ার' নথিপত্র জোগাড় করে ফেলেছে। এখনও নথি জোগাড় করতে পারেনি এমন চারজন বাংলাদেশি মুসলিম ক্যানিং ডকঘাট চত্বরে দোকানপাট বানিয়ে কারবার ফেঁদে বসেছে। সাতক্ষীরার মায়াচরের বাসিন্দা এদেরই একজন নাম বদল করে চালাচ্ছে খাবারের দোকান। তার এখানকার আস্তানা ক্যানিংয়ের গোলাবাড়িতে। সেই দোকান এদেশে চোরাপথে ঢোকা লোকজনের 'ট্রানজিট পয়েন্ট'। পুলিশের খাতায় এরই পাশাপাশি আরও নানা কুকীর্তির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এই হোটেলের নাম।

ক্যানিং ডকঘাট চত্বর গত কয়েক বছর ধরেই সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তের দুষ্কৃতীদের 'সদর দপ্তর' বলেই পরিচিত। খুন, ছিনতাই, অপহরণ, নদী-সমুদ্রে ভুটভুটি এবং ট্রলার ছিনতাই সব কিছুর সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে ডকঘাটের নাম। কুখ্যাত জলদস্যু রেজ্জাক সর্দার ও তার দল সমস্ত অপারেশন চালাত ক্যানিং ডকঘাট থেকে। এনকাউন্টারে রেজ্জাক মারা যাওয়ার পর পুলিশ জানতে পারে এই দলে কমপক্ষে পাঁচজন বাংলাদেশের নাগরিক। যাদের মধ্যে বাগেরহাটের শাজাহান মীর, মমিন ও কুদ্দুসের অস্থায়ী ডেরা ছিল ডকঘাটেই। বাসন্তী ডকঘাট চত্বরে 'দাপট' রয়েছে সাতক্ষীরা থেকে বছর দেড়েক আগে আসা এক যুবকের। এক বামপন্থী দলের ছত্রছায়ায় থাকা ওই ব্যক্তি এখন 'ভারতীয়' বনে গিয়েছে।

ক্যানিং ও বাসন্তী ডকঘাট এবং সংলগ্ন এলাকা যে বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের চারণক্ষেত্রে পরিণত হচ্ছে তা দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য সরকারের গোচরে আনা সত্ত্বেও কোনও লাভ হয়নি বলে জানিয়েছেন ক্যানিংয়ের বিজেপি নেতা কৃষ্ণ দেবনাথ। কৃষ্ণবাবু জানান, স্থানীয় সিপিএমের একটা অংশের মদতে এদেশে এসেই অনুপ্রবেশকারী মুসলিমরা রেশন কার্ডসহ অন্যান্য সুযোগসুবিধা পেয়ে যাচ্ছে। বিনিময়ে লাল ঝাণ্ডা ধরছে তারা। ভারতীয় বনে যাওয়া এ রকম ৫০-৬০ জন বাংলাদেশির নাম তাঁরা ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার দাবি গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে জানিয়েছিলেন। কিন্তু তা কার্যকর হয়নি বলে তাঁর অভিযোগ। ক্যানিংয়ের সিপিএম নেতা দুলাল ঘোষ জানিয়েছেন, বাংলাদেশ থেকে ইদানীং চোরাপথে কয়েকজন এখানে আসছে এ কথা সত্যিই। তবে তারা রেশন কার্ড জোগাড় করে ভোটার তালিকায় নাম তুলছে এ কথা মানতে রাজি নন দুলালবাবু।

বর্তমান, ০৪.০৯.২০০৬

কাকদ্বীপে পল্লি গড়ে তুলেছে বরিশাল, চট্টগ্রামের বাসিন্দারা

কাকদ্বীপ শহর ও সংলগ্ন কয়েকটি এলাকায় অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশিরা জনসংখ্যার সংখ্যাগুরু অংশে পরিণত হতে চলেছে। বিশেষ করে কালীনগর, অহল্যা কলোনি, অক্ষয়নগর, মাইতির চক্‌, পূর্ব গঙ্গাধরপুর ও নামখানার কয়েকটি অংশের নিয়ন্ত্রণ কার্যত বাংলাদেশিদের হাতেই চলে গিয়েছে। চোরাচালান, মাদক ও আগ্নেয়াস্ত্র পাচারসহ আরও নানা কুকীর্তির সঙ্গে কাকদ্বীপ এলাকায় যাদের নাম জড়াচ্ছে তাদেরই সিংহভাগই বাংলাদেশি। রাজ্যের অন্যতম মৎস্যবন্দর কাকদ্বীপের মাছের কারবারের ৭৫ ভাগই এখন 'ভারতীয় সেজে থাকা' বাংলাদেশিদের উপরে নির্ভরশীল। অথচ এদের সিংহভাগেরই

কোনও ভারতীয় পরিচয়পত্র নেই। ট্রলারে শুধুমাত্র ভারতীয় পতাকা টাঙিয়ে এরা সমুদ্রে মাছ ধরে। গোয়েন্দারা বলছেন, গভীর সমুদ্রে বেশ কয়েকটি বাংলাদেশি ট্রলার এখন ভারতীয় পতাকাকে আড়কাঠি করে তাদের 'কাজ' সারছে।

গোয়েন্দা জেনেছেন, জম্মুদ্বীপকে ঘিরে আই এস আই যে নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে চাইছে তাতে জড়িয়ে রয়েছে বাংলাদেশিদের একাংশ। এদের মধ্যে অনেকেই নাম পরিচয় ভাড়িয়ে 'দাশ' পদবি নিয়ে কাকদ্বীপে আস্তানা গেড়েছে। বাংলাদেশিদের এই সমস্ত আস্তানা স্থানীয় ভাবে 'চট্টগ্রাম পল্লি', 'বরিশাল পল্লি', 'হাতিয়া পল্লি' নামে পরিচিত হয়েছে। এছাড়াও, কাকদ্বীপে এমন বেশ কয়েকজন লোকের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে, যারা একই নামের দুটি ট্রলার রেখেছে ভারতীয় ও বাংলাদেশ জল সীমানায়। মাছ ধরা ছাড়া অন্য সব 'কাজকর্ম' চলে এই ধরনের ট্রলি বা ট্রলারে। গোয়েন্দারা বলছেন, কাকদ্বীপের বিভিন্ন এলাকায় বসানো হয়েছে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন রেডিও টেলিফোন (আর টি)। যার মাধ্যমে এপার থেকে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ করা হয় ওপারে।

সাতক্ষীরা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, খুলনা, নোয়াখালি ও হাতিয়া জেলা থেকেই বেশিরভাগ বাংলাদেশি কাকদ্বীপে এসে ডেরা বাঁধছে। গোয়েন্দাদের হিসাব অনুযায়ী প্রতিদিনই ৫-১০ জন করে বাংলাদেশি 'ভারতীয়' হতে এখানে আসছে। চোরাগোপ্তা ভাবে স্থলপথে সীমান্ত পেরিয়ে এবং জলপথে মাছ ধরার ট্রলারে চেপে কাকদ্বীপে এসে উঠছে বাংলাদেশিরা। এরা কোথাও পূর্ত দপ্তরের আবার কোথাও সেচ দপ্তরে জমি দখল করে বাড়ি ঘর করে নিচ্ছে। অনেকে আবার রায়তি জমি কিনেও আস্তানা গাড়ছে।

গোয়েন্দাদের কাছে যে তথ্য রয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে এখন কাকদ্বীপ, নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ ও বকখালিতে কমপক্ষে ৫০-৬০ হাজার বাংলাদেশি অবৈধ ভাবে বসবাস করছে। এলাকার আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উপর বাংলাদেশিরা যে মারাত্মক প্রভাব ফেলছে একথা মুখে বললেও, কার্যক্ষেত্রে তা নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্যই করতে সাহস পাচ্ছেন না রাজনৈতিক নেতারা। পঞ্চায়েত, বিধানসভা কিংবা লোকসভা যেকোনও নির্বাচনেই 'ভারতীয় সেজে থাকা' এই সমস্ত বাংলাদেশিরাই যে জেতার অমোঘ অস্ত্র সেটা জানে ডান, বাম সব পক্ষই। গোয়েন্দা দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, কাকদ্বীপ মহকুমার ভোটার তালিকায় এই মুহূর্তে বাংলাদেশিদের অবস্থান শতকরা ১৮ থেকে ২০ ভাগ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর কাকদ্বীপে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ নিয়ে বারবার সতর্ক করছে রাজ্য সরকারকে। কিন্তু ভোটার তালিকার এই বিশাল সংখ্যাকে অবজ্ঞা করার মতো 'দেশপ্রেম' দেখাতে তাই রাজি নয় কোনও পক্ষই।

কাকদ্বীপের যে সমস্ত এলাকা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের প্রায় দখলেই চলে গিয়েছে সেগুলির মধ্যে অন্যতম হাতিয়া কলোনি। একসময়ে বাংলাদেশের উপজেলা হাতিয়া এখন পূর্ণাঙ্গ জেলায় পরিণত হয়েছে। সেখান থেকে চোরাপথে আসা লোকজন দেশের স্মৃতিকে টাটকা রাখার জন্য কাকদ্বীপেই বানিয়ে ফেলেছে হাতিয়া কলোনি। এক কথায় বাংলাদেশের এই কাকদ্বীপ সংস্করণে ভারতীয় খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। এহেন হাতিয়া কলোনিতে গত মার্চ মাসে 'ভারতীয়' হতে এসেছেন বছর চল্লিশের এক ব্যক্তি। সঙ্গে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও পরিবারের অন্যরা। নাম ভাঁড়িয়ে বর্তমানে এই ব্যক্তি 'অমূল্য দাশ'। 'মাছ ধরার ট্রলারে চেপে কেঁদো দ্বীপ পর্যন্ত এসেছিলাম। সেখান থেকে ভুটভুটিতে চেপে নামখানা হয়ে কাকদ্বীপ পৌঁছেছি। যদি এখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় ফের ফিরে যাব বাংলাদেশে'

জানালেন অমূল্য।

কাকদ্বীপ মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাংলাদেশিদের কাছে কখনও না ভুলতে পারা নামটি 'মেজর জিয়ার'। গোয়েন্দারা বলছেন কাকদ্বীপ, নামখানায় নদী, সমুদ্র পথে লোক ঢোকানোর মূল পাণ্ডা সাতক্ষীরার রাঙাবালিয়ার 'মেজর জিয়া'। শোনা যায় এই ব্যক্তি একসময়ে মুক্তিযুদ্ধেও অংশ নিয়েছিল। এখন কট্টর জেহাদি নেতা। আই এস আইয়ের বাংলাদেশের দক্ষিণ অংশের নেটওয়ার্কের অনেকটাই সামলায় এই ব্যক্তি। বঙ্গোপসাগরে ভারত-বাংলাদেশ দু'দেশের মৎসজীবীদেরই নাকি জিয়াই নিয়ন্ত্রণ করে। সমুদ্রে ট্রলার ও ট্রলি ছিনতাই হলে ভারতীয় মৎস্যজীবীরা জিয়ার দরবারে 'নজরানা' দিয়ে সেগুলি ছাড়িয়ে নিয়ে আসে বলে জেনেছেন গোয়েন্দারা।

বর্তমান, ০৫.০৯.২০০৬

সুন্দরবনে জলদস্যুদের হামলা; সর্বস্ব লুঠ করল মৎস্যজীবীদের

সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে জলদস্যুর কবলে পড়ে সর্বস্ব খোয়ালেন একদল মৎসজীবী। সোমবার ভোর রাতে সূর্যমণি খালে নোঙ্গর ফেলে, নৌকোর মধ্যে ঘুমে প্রায় অচেতন হয়ে পড়েছিলেন মৎসজীবীদের দলটি। গত কয়েকদিন ধরে সমুদ্রে মাছ ধরার ক্লান্তি ও জোয়ার আসার অপেক্ষায় সূর্যমণি খালের একটি গাছে তিনটি নৌকায় বেঁধে জাল টাঙিয়ে শুধু রাতটুকু কাটিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন মৎস্যজীবীরা। রাত দুটো-আড়াইটে নাগাদ আচমকাই পটকা ফাটার মতো শব্দে ঘুম ভেঙে যায় কয়েকজনের। নৌকাগুলি খাড়ির মধ্যে একটি জায়গায় আটকে থাকায় প্রথমে বুঝতে পারেননি তারা। পরে অন্ধকারের মধ্যেই নৌকার উপর কয়েকজনকে লাফিয়ে পড়তে দেখে বুঝতে পারেন জলদস্যু হামলা করেছে। তড়িঘড়ি নৌকার দড়ি খুলে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে, একটি আধুনিক ভুটভুটিতে চেপে মৎস্যজীবীদের তাড়া করে জলদস্যুদের দলটি। জলদস্যুদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র থাকায় প্রায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন মৎস্যজীবীরা। সূর্যমণি খালের ঢোকার মুখেই মৎস্যজীবীদের মারধর করে তারা লুটপাট চালায়। কেড়ে নেয় যথাসর্বস্ব। মাতলা নদীর বড়খালি খাড়ির মধ্যে দিয়ে চম্পট দেয় তারা। সর্বস্ব কেড়ে নেওয়ায় কোনও মতে লুকিয়ে রাখা একটি মোবাইল ফোন থেকে গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ করেন মৎস্যজীবীরা।

মৎস্যজীবীদের দলে ছিলেন কুলতলির চুপড়িছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বানিরদল গ্রামের বাসিন্দা শ্যামল নাইয়া, পঞ্চু মুদি, সুমন নাইয়া, চটিরাম রং, সুদর্শন পৈলান, শুভঙ্কর মণ্ডল, মহাদেব বর ও গণেশ টুডু। এরা প্রত্যেকেই বহুদিন ধরে সুন্দরবনের নদিখাড়িতে মাছ ধরে জীবনযাপন করছেন। কিন্তু এই ধরনের অভিজ্ঞতা প্রথম। পুরো দলের নেতৃত্বে ছিলেন চটিরাম রং। এদিন কুলতলিতে নিজের বাড়িতে বসে তিনি সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা জানাতে গিয়ে বলেন, "কয়েকজনের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে বলে, যা আছে সব বার করে দিতে। খাড়িতে কোমর সমান নোনা জল। রাতের অন্ধকারে তা ভেঙে পালানো প্রায় দুঃসাধ্য। কোনও মতে একটা নৌকায় চড়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচিয়েছি।" তিনি আরও জানান, জলদস্যুরা তাদের দুটি যন্ত্রচালিত নৌকা, মাছ ধরার জাল, প্রায় ২০ দিনের জন্য মজুত চাল-ডাল খাদ্য-সামগ্রী, নগদ বেশ কিছু টাকা ঘড়ি, মোবাইল নিয়ে পালিয়ে যায়। ভয় দেখানোর জন্য শূন্যে গুলি চালায়। জলদস্যু কবলিত মৎস্যজীবীরা গ্রামে খবর দিলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কুলতলি থানার পুলিশ ও উপকূল থানার পুলিশ ও বনদফতরের

আধিকারিকরা ঘটনাস্থলের দিকে রওনা হন। পুলিশ বাহিনী অবশ্য ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর আগেই অন্যান্য মৎসজীবীরা আক্রান্ত মৎস্যজীবী দলটিকে উদ্ধার করেন।

কুলতলির বিধায়ক রামশঙ্কর হালদার বলেন, "সুন্দরবনের বেশিরভাগ মানুষই দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করেন এবং মাছ ধরাই তাদের প্রধান জীবিকা। বর্তমান সরকারের উচিত এদের নিরাপত্তার দিকটি ভালভাবে বিবেচনা করার। এ ধরনের ঘটনার সামনে পড়লে তারা জলে জঙ্গলে মাছ ধরতে যেতে ভয় পাবেন।" ওই এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক জয়কৃষ্ণ হালদার জানিয়েছেন, "অনেকদিন সুন্দরবনের জঙ্গল নদীতে জলদস্যুদের কোনও গল্প ছিল না। হঠাৎ এই জলদস্যু হানা প্রশাসনকেই বেকায়দায় ফেলার কোনও রাজনৈতিক 'চাল' কিনা তা প্রশাসনকেই খতিয়ে দেখতে হবে।" এই ঘটনা সম্পর্কে জেলা আধিকারিক শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, "আমাদের কর্মীরা ঘটনাস্থলে আছেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন।"

সকালবেলা, ০৬.০৭.২০১১

আদালত কর্তৃক ধিকৃত সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম সংরক্ষণ

পশ্চিমবঙ্গে পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর জন্য ৭ শতাংশ সংরক্ষণ চালু রয়েছে। কিন্তু বিগত লোকসভা ভোটে সিপিএমের পরাজয়ে হতচকিত বামফ্রন্ট সরকার মুসলিমদের মন জয় করতে আরও ১০ শতাংশ সংরক্ষণের কথা ঘোষণা করেছে। উদ্দেশ্যে হল ২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে মুসলিমদের ভোট নিয়ে আবার মসনদে আসীন হওয়া। তবে পিছিয়ে পড়ার অর্থ হল তাকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে এবং পরিবারের মাসিক আয় ৩৭,৫০০ টাকার কম হতে হবে। এক পরিবারের মাসিক আয় যদি ৩৭ হাজার টাকা হয়, তবে সেই পরিবার কি করে পিছিয়েপড়া গোষ্ঠীভুক্ত হয়, সে উত্তর অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীর জানা নেই। সংবিধানের ১৬(৪) ধারা মেনেই ধর্মীয় সংস্পর্শ এড়িয়ে তিনি মুসলিম সংরক্ষণবিল কার্যকর করার চেষ্টা করেছেন। মুখে অবশ্য তিনি উল্লেখ করেছেন, মুসলিমরাই এই সুযোগ পাবেন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে। কারণ, রাজ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের বাস নয় নয় করে ২৫ শতাংশেরও বেশি। তাই এই সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বৌদ্ধ বা খৃষ্টানরা কোনও সুবিধাই পাবেন না মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য অনুযায়ী। রাজ্যে বর্তমানে ওবিসি ক্যাটাগরিভুক্ত মুসলিম উপ সম্প্রদায়ের সংখ্যা ১৫। এদের সংখ্যা ১৬.৮৩ লাখ। রাজ্যে এর আগেই আরও ৩৭টি মুসলিম উপগোষ্ঠী চিহ্নিত করা হয়। এদের মধ্যে ৪টি গোষ্ঠীকেও ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত করার চিন্তাভাবনা ছিল। এছাড়া খোট্টা, সর্দার এবং বেলদার উপগোষ্ঠীকেও ওবিসি ভুক্ত করার কথা হয়। এদের ধরলে মুসলিম উপগোষ্ঠী জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৭২.২ লাখ। পশ্চিমবঙ্গে যখন মুসলিম ভোট জয় করার জন্য সংরক্ষণের ভাঁওতা ঘোষণা করা হচ্ছে, তখন একই সংরক্ষণ অন্ধ্র হাইকোর্টে বাতিল বলে ঘোষণা করেছে। অন্ধ্র হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত বেঞ্চ রাজ্য সরকারের ঘোষণা মোতাবেক মুসলিম পিছিয়েপড়া গোষ্ঠীভুক্তরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪ শতাংশ এবং চাকুরির ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ সংরক্ষণের বিষয়টি অবৈধ বলে রায় দিয়েছেন। আদালত অন্ধ্রপ্রদেশ পিছড়েবর্গ কমিশনের সমীক্ষাকেই অবৈজ্ঞানিক ও অবাস্তব বলে আখ্যা দিয়েছে। কমিশনের সুপারিশ মোতাবেকই সংরক্ষণ আইন গঠিত হয়। ফলে সুপারিশ অবৈজ্ঞানিক হলে সংরক্ষণ আইনও যে ভিত্তিহীন তা বলাই বাহুল্য। যদিও সুপ্রীম কোর্ট তার এক অন্তর্বর্তী আদেশে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে

বলেছে এবং সাংবিধানিক বেঞ্চের কাছে রায়টি বিবেচনার জন্য পাঠিয়েছে। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সাচার কমিটির সুপারিশ মোতাবেকই রঙ্গনাথ মিশ্র কমিটি মুসলিম পিছিয়েপড়া গোষ্ঠীর জন্য ১০ শতাংশ এবং অন্যান্য পিছিয়েপড়া সম্প্রাদায়ের ৫ শতাংশ সংরক্ষণ দাবি করে।

উজ্জীবন, এপ্রিল ২০১০

How Much More for Hajj ?

A very revealing fact has been obtained from the Indian government's External Affairs Ministry Office through the RTI (Right to Information) Act. As per this information, the Indian Government has spent a staggering sum of 2,891.77 crore rupeess (28,920,000.000 Rs = US $ 672,558,140) for muslim Hajj pilgrimage in the last 5 years.

The editor-in-general of "Suchana Adhikar Manch" in Patiala, Punjab, Mr. D.C. Gupta and the publishing editor Mr. Kumar Sarin asked the Indian Government's External Affairs department about Hajj subsidy through the RTI Act on July 31,2010. The External Affairs secretary Mr. Manbir Singh replied in writing that the Central Government has been providing this Haij subsidy since 1991.

Mr. Manbir revealed that in just the last 5 years, a total of 2,891.77 crore rupees have been spent for 640,792 Muslim Hajj pilgrims. He also mentioned that between the years 2008 and 2009, 121,695 Muslim pilgrims went to Hajj from the country. The Government provided subsidy of 70,238 rupees (US $ 1,634) per person and a total of 864.77 crore rupees (US $ 201,162,791) was spent in just one year.

The ministry has also informed that the Indian Government does not provide any subsidy for pilgrimage for any other religious group.

As per a Hindustan Times news article published on April 10, 2010, it was disclosed that the Central Govt. spent 367 crore rupees (US $ 85,348,837) on 2006, 390 crore (US $ 90,697,675) on 2007 and 826 crore (US $ 192,093,023) on 2008 as subsidy for the Hajj pilgrimage.

National Spirit, 07.01.2011

মুসলিম উন্নয়ন নিয়ে নির্লিপ্ত রাজ্য

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর দপ্তর (পিএমও) পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের কাছে জানতে চেয়েছে যে ৩২ বছরে রাজ্য ২৭ শতাংশ মুসলিম জনসংখ্যার কতজনকে শিক্ষক, পুলিশ অথবা অন্য কোনও রাজ্যসরকারের দপ্তরে চাকরিতে বহাল করা হয়েছে বলে দৈনিক স্টেটসম্যানকে জানিয়েছেন রাজ্যের সংখ্যালঘু দপ্তরের নাম জানাতে অনিচ্ছুক এক পদস্থ আমলা। উল্লেখ্য, সাচার কমিটির রিপোর্ট পেশ হওয়ার পর দু'বছর আগে পিএমও রাজ্যসরকারের কাছে চিঠি লিখে রাজ্যে মুসলিমদের

আর্থিক অবস্থার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ চেয়ে পাঠিয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত রাজ্যসরকার তার কোনও উত্তর দেয়নি বলে দাবি করেছেন সেই আমলা।

সম্প্রতি রাজ্যসরকার রাজ্যে পরপর নির্বাচনগুলিতে সিপিএমের ভরাডুবির পর রাজ্যে মুসলিম উন্নয়নের স্বার্থে একাধিক প্রকল্প ঘোষণা করেছে। কিন্তু তার আগে কেন্দ্রীয় সরকার মুসলিম উন্নয়নের স্বার্থে রাজ্যে এমন ১৩টি জেলা চিহ্নিত করে দিয়েছিল যেখানে মুসলিম জনসংখ্যা ২৫ শতাংশের বেশি। সম্প্রতি পিএমওর অধীনে পার্সোনেল ডিপার্টমেন্ট থেকে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে এইসব জেলায় মুসলিম উন্নয়নের স্বার্থে রাজ্য সরকার কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে। সঙ্গে বিশেষ কয়েকটি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে সব জেলায় ২৫ শতাংশের বেশি মুসলিমরা বাস করেন সেখানে ডাক্তার, শিক্ষক এবং পুলিশের চাকরিতে মুসলিমদের যেন প্রাথমিকতার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়। পিএমওর তরফে রাজ্যসরকারকে এও বলা হয়েছিল যে এই সব জেলায় সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাসপাতাল, বিদ্যালয় (প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি), পুলিশ ফাঁড়ি, থানা গড়ে তুলে সেখানে নতুন পদ সৃষ্টি করে মুসলিমদের যেন চাকরিতে বহাল করা হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত রাজ্যসরকার কেন্দ্রীয় সরকারের এ ধরনের কোনও প্রস্তাবকে বাস্তবায়িত করার কোনও উদ্যোগ তো নেয়নি, কেন্দ্রীয় সরকারকে এ ব্যাপারে কোনও উত্তর দেওয়ারও প্রয়োজন বোধ করেনি বলে জানিয়েছেন সেই আমলা। তিনি আরও বলেন, রাজ্যে পশ্চাৎপদ মুসলিমদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের এ ধরনের প্রস্তাব অনেক আগেই বাস্তবায়িত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মুসলিম উন্নয়নের নামে এত ঢাকঢোল পেটানোর পরও রাজ্যসরকার উন্নয়নের প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এখনও উদাসীন।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন রাজ্যে সংখ্যালঘু উন্নয়নের প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রক ইতিমধ্যেই একটা ‘মেকানিজম’ গড়ে তুলেছে যাকে আরও কার্যকরী করে তোলা হচ্ছে বলে সংসদের বাজেট অধিবেশনে জানিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু দপ্তরের মন্ত্রী সলমান খুরশিদ।

দৈনিক স্টেটসম্যান, ১৫.০৮.২০০৯

মৌলবাদী হুমকি, আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন বাসিন্দারা

কলকাতাতেও মৌলবাদী হুমকি। মুসলিম মৌলবাদীদের হুমকিতে কার্যত প্রাণভয়ে দিন কাটাচ্ছেন ফিয়ার্স লেন, কলুটোলা স্ট্রিট, দেবেন্দ্র মল্লিক স্ট্রিট, শ্রীনাথবাবু লেন, জ্যাকেরিয়া স্ট্রিট এলাকার ২০টি পরিবার। অবস্থা এতটাই গুরুতর যে এই হুমকি সামাল দিতে স্থানীয় নাগরিক কমিটি, বিজেপি, কংগ্রেস, পুলিশ এবং বেশ কিছু বিশিষ্ট মুসলিম ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসতে বাধ্য হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের তরফে ওই ২০টি পরিবার এবং নাগরিক কমিটিকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, আপনাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে না। তবুও কিছুতেই আশ্বস্ত হতে পারছেন না। ওই এলাকার অ-মুসলিম বাসিন্দারা।

কলুটোলা মুসলিম ওয়েলফেয়ার অ্যাসাসিয়েশন নামে এক সংগঠন, কলুটোলা মসজিদেই তাদের কার্যালয় বলে দাবি করে সম্প্রতি চিঠি দিয়েছে কলুটোলা-ফিয়ার্স লেন এলাকার ২০টি পরিবারকে। এ চিঠির কপি দেওয়া হয়েছে আর এস এস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল, বিজেপি, সিপিএমের কলুটোলা লোকাল কমিটির সম্পাদক, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এবং কলুটোলা শান্তি কমিটির সম্পাদক কানাই ধরকে। মৌলবাদী ওই

সংগঠন তাদের চিঠিতে বলেছে, আগামী ১৪ আগস্ট তারা কলুটোলা এলাকায় পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস পালন করবে। সেকারণেই ওই এলাকার অমুসলিম বাড়িওয়ালাদের বলা হয়েছে ১৪ আগস্টের আগেই তারা যেন বাড়ি খালি করে এলাকা ছেড়ে চলে যায়। না হলে তাদের সকলকেই খুন করা হবে। এ ধরনের চিঠি পাওয়া মাত্রই স্থানীয় পিস কমিটি জরুরি এক সভা ডাকে। ওই সভায় যোগ দেন স্থানীয় বিধায়ক তাপস রায়, বিজেপির এক স্থানীয় নেতা, বড়বাজার, বৌবাজার ও জোড়াসাঁকো থানার ওসিরা এবং বেশ কিছু মুসলিম ধর্মীয় নেতা। চিঠি পাওয়া আতঙ্কগ্রস্ত মানুষদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার আশ্বাস দেন বিধায়ক তাপস রায় সহ সকলেই। তবুও ভয় কাটছে না তাদের। কারণ ওই চিঠিরই শেষাংশে বলা হয়েছে, মুসলিম কমান্ডো ইসলামিক সেবক সঙ্ঘ, পাকিস্তানের আই এস আই-এরই এক স্বীকৃত সংগঠন। এদের সঙ্গে নাকি নিয়মিত যোগাযোগও রয়েছে আই এস আই কর্তাদের সঙ্গে।

সংবাদ প্রতিদিন, ১০.০৫.১৯৯৯

7 States one step ahead

Contrary to common perception, the literacy level of Muslims is better than that of Hindus in seven Indian states, says a new book authored by a noted demographer.

At an all-India level, while The literacy level of the male population for all religious groups is 75.3 per cent and of Hindus 76.2 per cent, it is 67.6 per cent for Muslims, says the book *Population of India in New Millennium: Census 2001* by Mr Mahendra K Premi. former professor of Jawaharlal Nehru University (JNU). But in Andhra Pradesh, while Muslim males enjoy a literacy rate of 76.5 per cent, only 69.5 per cent of Hindus are literate. Similarly, in Gujarat, while Muslims have a literacy level of 82.9 per cent, it is 79.1 per cent for Hindus.

In Andhra Pradesh, the female literacy level among Muslims is 59.1 per cent as against 49.2 per cent for Hindus. Again in Gujarat, 63.5 per cent of Muslim females are literate compared to 56.7 per cent Hindus. Premi's book reveals that both male and female Muslims enjoy better literacy levels in seven states— Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Orissa and Tamil Nadu.

The Statesman, 29.12.2006

মাদ্রাসা শিক্ষাকে সংখ্যালঘু দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তে শোরগোল

রাজ্যে মাদ্রাসা শিক্ষাকে শিক্ষা দপ্তর থেকে কেটে সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও কল্যাণ দপ্তরের অধীনে নিয়ে আসার সরকারি সিদ্ধান্তকে ঘিরে শোরগোল বেধেছে। মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নতিই এই সিদ্ধান্তের কারণ বলে রাজ্য সরকার ব্যাখ্যা দিচ্ছে। কিন্তু অনেকেই মনে করেন, সেটা আসল কারণ নয়। আসল কারণ হল, ধর্মের নামে মুসলিমদের তুষ্ট করা। তা না হলে

রাইটার্স বিল্ডিংস ছাড়া কোনও জেলাতেই যে দপ্তরের অফিস নেই, সেই সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও কল্যাণ দপ্তরের হাতে মাদ্রাসা শিক্ষার ভার তুলে দিত না সরকার। মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত অনেকেই মনে করেন, এর ফলে প্রসারের বদলে মাদ্রাসা শিক্ষা সঙ্কুচিত হবে।

জানা গিয়েছে, এই সিদ্ধান্তে সিপিএম রাজ্য নেতৃত্ব এবং মন্ত্রিসভার একাংশ ক্ষুব্ধ। কিন্তু ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের পরামর্শে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এবার মাদ্রাসা শিক্ষা দেখাশোনার জন্য একজনকে মন্ত্রী করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান সিপিএমের তরুণনেতা ড. অবদুস সাত্তার মাদ্রাসা শিক্ষা বিষয়ক দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী। একই সঙ্গে তিনি সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও কল্যাণ দপ্তরেরও মন্ত্রী।

ওই দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী। বহু বছর আগে মাদ্রাসা ও জনশিক্ষার জন্য শিক্ষা দপ্তরের অধীনেই একজন পৃথক রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু গত ১৫ বছরে শিক্ষামন্ত্রীই মাদ্রাসা শিক্ষার বিষয়টি দেখতেন। এবার মাদ্রাসার জন্য শুধু একজনকে মন্ত্রী করা হয়েছে তাই নয়, ওই দপ্তরটিকেও শিক্ষা দপ্তরের আওতা থেকে বের করে সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও কল্যাণ দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যসচিব অমিতকিরণ দেব সোমবার এক নির্দেশে অবশ্য বলেছেন, সংখ্যালঘু দপ্তরের পরিকাঠামো তৈরি না হওয়া পর্যন্ত মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষা দপ্তরের হাতেই থাকবে। পাশাপাশি পরিকাঠামো তৈরি জন্য অর্থ দপ্তরেও প্রস্তাব পাঠিয়েছেন তিনি।

মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তে আরও কিছু প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। প্রথমত, মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কয়েক বছর ধরেই মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের কথা বলে আসছেন। তিনি সেখানে বিজ্ঞান, কম্পিউটার ইত্যাদি পড়ানোর কথাও বলছেন, যাতে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতরা মূল স্রোত থেকে পিছিয়ে না পড়ে। অথচ রাজ্য সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে শিক্ষা দপ্তর থেকে আলাদা করে উলটো দিকে হাঁটা শুরু করল।

দ্বিতীয়ত, সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও কল্যাণ দপ্তরের কাজ শুধুই মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নতি করা? রাজ্যে খ্রিষ্টান, শিখ সম্প্রদায় পরিচালিত কয়েকশো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। সেগুলিকে শিক্ষা দপ্তরের অধীনে রেখে মাদ্রাসা শিক্ষাকেই কেন শুধু সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও কল্যাণ দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হল তা নিয়ে অনেকেই বিস্মিত।

তাঁরা মনে করছেন, মুসলিমদের তুষ্ট করার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বামফ্রন্ট সরকার। অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা তা চাইছেন না। বঙ্গীয় খ্রিষ্টিয় পরিষদের পক্ষে হেরদ মল্লিক সোমবার বলেন, আমরা অন্যান্য বিষয়ে সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও কল্যাণ দপ্তরের অধীনে থাকতে রাজি আছি। কিন্তু আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিক্ষা দপ্তরের অধীনে রাখারই পক্ষপাতী আমরা।

বর্তমান, ০৮.০৮.২০০৬

তালাক ধর্মীয় অধিকার, কোর্টের এক্তিয়ার নয়

তালাক নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের তীব্র সমালোচনা করল 'জামাত-উল-উলেমার' ওড়িশা শাখা। তাদের বক্তব্য, ধর্মীয় বিষয়ে আদালতের হস্তক্ষেপ করার কোনও এক্তিয়ার নেই। পাশাপাশি তারা হুমকি দিয়েছে, তালাক হয়ে যাওয়া দম্পতি যদি শীর্ষ আদালতের সিদ্ধান্ত মেনে চলে তাহলে তাদের ধর্মচ্যুত করা হবে। বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে গোটা মুসলিম

সমাজ থেকে। উল্লেখ, ২০০৩ সালে ওড়িশার ভদ্রক জেলার শেখ শের মহম্মদ নামজা বিবিকে মদ্যপ অবস্থায় তিনবার তালাক বলেছিলেন। কিন্তু, মদের নেশায় এই ঘটনা ঘটে যাওয়ায় তালাক দেওয়ার পরেও ওই দম্পতি একসঙ্গে থাকতে চান। তিনবছর পর গত ২১ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট ওই মুসলিম দম্পতির নিরাপত্তা দিতে নির্দেশ দেয় ওড়িশা সরকারকে।

সোমবার কটক থেকে জামাত-উল-উলেমার আমিরে শরিয়াত অর্থাৎ সভাপতি মৌলানা সাজিদিন কোয়াসমি বলেছেন, ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের নেই। তালাক নিয়ে এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আদালতের উচিত ছিল ধর্মীয় সংগঠন এবং তাদের নেতা ও উলেমাদের সঙ্গে আলোচনা করা। নিজেদের এক্তিয়ারের বাইরে যাওয়া উচিত হয়নি। উলেমাদের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে এই দম্পত্তি যদি সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে ফের একসঙ্গে থাকেন, তাহলে আমরা নিশ্চিতভাবে ওদের মুসলিম সমাজ থেকেই বিতাড়িত করব। তিনি আরও বলেন, শীর্ষ আদালত যদি রাজ্য সরকারকে অন্য কোনও ব্যাপারে ওই দম্পত্তিকে নিরাপত্তা দেওয়ার কথা বলত, তাহলে আমরা আপত্তি করতাম না। কিন্তু, এটা সম্পূর্ণ ধর্মীয় বিষয়। কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভাবাবেগে আঘাত দেওয়া কোর্টের উচিত হয়নি। রাজ্যে সুন্নি সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ সংগঠন 'জামাত' এ ব্যাপারে শীঘ্রই চিঠি দেবে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে। ঘটনাটি খতিয়ে দেখার জন্য তারা লিখিতভাবে আর্জি জানাবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও আইনমন্ত্রীকেও। অবহিত করা হবে কেন্দ্রীয় সরকারকেও। সাজিদিন আরও বলেন, আমরা সুপ্রিম কোর্টকে অশ্রদ্ধা করছি না। কিন্তু, তালাক সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত পুনরায় বিবেচনা করে দেখতে আমরা আদালতকে আর্জি জানাব। সংসদেও গোটা বিষয়টি নিয়ে আলোচনার আর্জি জানানো হবে।

সংবাদ প্রতিদিন, ২৪.০৪.২০০৬

সরকারি চাকরি, স্কুল ও কলেজে মুসলিম সংরক্ষণ নয়, সুপ্রিম কোর্টের রায়

অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার স্কুল, কলেজ এবং সরকারি চাকরিতে মুসলিমদের ক্ষেত্রে পাঁচ শতাংশ আসন সংরক্ষণের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তা কার্যত খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। যদিও যে সব ছাত্রছাত্রীরা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছেন এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আওতায় যাঁদের চাকরিতে নিয়োগ করা হয়েছে তাঁদের ক্ষেত্রে নির্দেশ শিথিল করেছে প্রধান বিচারপতি ওয়াই কে সাভারওয়ালের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ। সংরক্ষণের আওতায় মেডিকেল কলেজগুলিতে ইতিমধ্যে তিনশ মুসলিম ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি করানো হয়। অন্ধ্রপ্রদেশের হাইকোর্টও মুসলিম সংরক্ষণের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিল। তারপর বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে ওঠে।

২০০৫ সালের ডিসেম্বরে অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্ট স্কুল-কলেজ এবং চাকরি ক্ষেত্রে পাঁচ শতাংশ আসন মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ করার অর্ডিন্যান্সকে খারিজ করে দেয়। রাজ্য সরকারের এই অর্ডিন্যান্সের প্রতিবাদে একাধিক আবেদন করা হয় হাইকোর্টে। তারপর তা সাংবিধানিক বেঞ্চে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সাংবিধানিক বেঞ্চ এই সংরক্ষণের ব্যাপারে রাজ্য অনগ্রসর জাতি কমিশনকে তলব করে। জানতে চাওয়া হয় কীসের ভিত্তিতে মুসলিমকে অনগ্রসর জাতিদের বর্গে ফেলা হয়েছে। কিন্তু কমিশন তার যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে না

পারায়, সাংবিধানিক বেঞ্চ জানায় সরকারকে ভুল পথে চালিত করেছে রাজ্য অনগ্রসর জাতি কমিশন। সাংবিধানিক বেঞ্চ তার রায়ে বলে, রাজ্য অনগ্রসর জাতি কমিশন তার কাজ পালন করতে পারেনি। সরকারকে ভুল পথে চালিত করেছে। এমনকী কী কারণে গোটা মুসলিম সমাজকে অনগ্রসর জাতিদের বর্গে ফেলা হল তা সঠিকভাবে দেখাতে পারেনি। সুতরাং সরকারের এই অর্ডিন্যান্স কার্যকর করা যাবে না।

দৈনিক স্টেটসম্যান, ০৫.০১.২০০৬

মুর্শিদাবাদে ঘাঁটি গেড়েছে বাংলাদেশি জামায়েতের জঙ্গিরা

চার-পাঁচ বছরে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ বাংলাদেশ থেকে জঙ্গি এবং আই এস আই চরদের ভারতে ঢোকার প্রধান প্রবেশদ্বার হয়ে উঠেছে। এমনটাই মনে করছে কেন্দ্র। একদিকে বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠন জামায়েত-উল-মুজাহিদিন এবং অন্যদিকে জামায়েত-উল-ইসলাম-এ-হিন্দ ও সিমি (স্টুডেন্টস ইসলামিক মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া) গোষ্ঠী সীমান্তবর্তী মুর্শিদাবাদ জেলা জুড়ে ঘাঁটি গেড়েছে। এমনকী ২০০১ সাল থেকে বাংলাদেশের জামায়েত-উল মুজাহিদিন গোষ্ঠী সীমান্ত পেরিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলায় তাদের ইউনিট খুলেছে বলেই কেন্দ্রের কাছে খবর রয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের এই জামায়েত গোষ্ঠী 'কিতাল-ফি-সাবিবিল্লাহ' নামে ইসলাম-রক্ষায় একটি সশস্ত্র বাহিনী গঠনও করছে।

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি বিদেশ মন্ত্রক এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এই মর্মে পৃথকভাবে রিপোর্ট জমা দিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে। যার ভিত্তিতে মাত্র সপ্তাহ দুয়েক আগে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের বিশিষ্ট অফিসার তথা জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এম কে নারায়ণন বাঙ্গালোরে এক অনুষ্ঠানে গিয়ে সরাসরি অভিযোগ করে বলেছেন, ভারতে সন্ত্রাসবাদ ছড়ানোর ঘাঁটি বা 'লঞ্চিং প্যাড'এ পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ।

স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-ও গত ১৮ অক্টোবর এখানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে স্থল, নৌ এবং বায়ু সেনার শীর্ষ কমান্ডারদের বার্ষিক সম্মেলনে বাংলাদেশকে ভারতের 'আর একটি নিরাপত্তা জনিত উদ্বেগ' বা অ্যানাদার সিকিওরিটি কনসার্ন বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বাহিনীর ওই কমান্ডার সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, অর্থের সন্ধানে ও রুটিরুজির তাগিদে বাংলাদেশ থেকে ব্যাপকহারে ভারতে অনুপ্রবেশ হচ্ছে এবং তারই সুযোগ নিয়ে আমাদের শত্রুরা ভারতে সন্ত্রাস ছড়াতে চাইছে। ওই কমান্ডার সম্মেলনের প্রস্তুতি হিসেবেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও বিদেশ মন্ত্রক পৃথকভাবে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে উদ্বেগজনক রিপোর্ট দুটি পাঠিয়েছে। সেখানে মুর্শিদাবাদকে ঘাঁটি করে বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানি জঙ্গি ও চরদের ভারতে ঢোকার ব্যাপারে বিশদ উল্লেখ রয়েছে।

সরকারি সূত্রের খবর, বিদেশ সচিব শিবশংকর মেনন যে গতকাল কলকাতায় গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে বৈঠক করেছেন, সেখানেও বাংলাদেশ থেকে আগত বিপদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং সেই আলোচনায় বিদেশ সচিব মেনন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে সীমান্তবর্তী মুর্শিদাবাদ জেলা দিয়ে বাংলাদেশি জামায়েত-উল-মুজাহিদিনের ভারতে ঘাঁটি গাড়ার তৎপরতা সম্পর্কেও অবহিত করেছেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও বিদেশমন্ত্রক ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠানো রিপোর্টে জানিয়েছে, বাংলাদেশে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে চলতি রাজনৈতিক হিংসা ও অস্থিরতার সুযোগে জামায়েত-উল-মুজাহিদিন ফের সক্রিয় হচ্ছে। সে দেশের উত্তর-পূর্বের

শ্রীহট্ট থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে সাতক্ষীরা পর্যন্ত জামায়েতের নতুন সশস্ত্র গোষ্ঠী 'কিতাল-ফি-সাবিবিল্লাহ' ৫টি কমান্ড-ডিভিশন গঠন করেছে। ফলে আগামীদিনে মুর্শিদাবাদ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশি ও পাকিস্তানি জঙ্গিদের আরও ব্যাপকহারে ভারতে প্রবেশের আশঙ্কা রয়েছে।

বর্তমান, ৩০.১০.২০০৬

সম্পন্ন মুসলিম ছাত্রছাত্রীদেরও উচ্চশিক্ষার সব খরচ দেবে রাজ্য

আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন মুসলিম পরিবারের ছাত্রছাত্রীদেরও দেশের বাছাই করা ৬০টি প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষার যাবতীয় খরচ দেবে রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার মহাকরণে সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী আব্দুস সাত্তার একথা ঘোষণা করে বলেন, আই আই টি, আই আই এম, এন আই আই টিসহ নামকরা ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি, ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠানে পড়বার জন্য কোনও মুসলিম ছাত্র সুযোগ পেলে তাদের কোর্স ফি'র পুরোটা সরকার দিয়ে দেবে। দেওয়া হবে হস্টেলে থাকার খরচও। আগে সর্বাধিক এক লক্ষ টাকা আয়ের কোনও মুসলিম পরিবারকেই এই সুযোগ দেওয়া হত। এখন তা সংশোধন করে বলা হয়েছে, যে সব মুসলিম পরিবারের আয় বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকা বা মাসে ২০ হাজার টাকার বেশি তাদেরও এই সুযোগ দেওয়া হবে।

মন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হয়, সরকার তো স্কিমটি চালু করেছে গরিব ও মেধাবী মুসলমানদের জন্য। তাহলে যে সব পরিবারের মাসিক আয় ২০ হাজার টাকার বেশি তারাও কি গরিব বলে ধরা হচ্ছে? মন্ত্রী বলেন, আরও বেশি সংখ্যক মুসলিম ছাত্রছাত্রী যাতে দেশের বাছাই করা প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পায় সেজন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজ্যের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি পড়ানোর প্রতিষ্ঠানও এই তালিকায় রয়েছে। চলতি বছরে ২২২৩ জন ছাত্রছাত্রীকে এই মেধাবৃত্তি দেওয়া হবে। বাছাই করা প্রতিষ্ঠানে পড়বার সুযোগ না পেলে অন্য প্রতিষ্ঠানে পড়লেও তার জন্য সরকার বছরে কোর্স ফি বাবদ ২০ হাজার টাকা, হস্টেল চার্জ হিসাবে আরও ১০ হাজার টাকা এবং ডে-স্কলারদের পাঁচ হাজার টাকা করে দেবে। সাত্তার সাহেব বলেন, তবে যারা বাছাই করা প্রতিষ্ঠানে সুযোগ পাবে তাদের জন্য যত লক্ষ টাকা প্রয়োজন সরকার তা দিয়ে দেবে।

এছাড়াও বেসরকারি সংস্থা ও সরকারি ক্ষেত্রে পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য মুসলিমদের কোচিং দেওয়ার ব্যবস্থা করছে সরকার। মুসলিমদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন নামি কোচিং সেন্টারের সঙ্গেও চুক্তি করতে চলেছে সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তর। এক্ষেত্রেও বছরে আড়াই লক্ষ টাকা উপার্জনক্ষম পরিবারের মুসলিম ছেলেমেয়েরাও এই সুযোগ পাবে।

বর্তমান, ১৪.০৯.২০০৭

মুসলিমদের জন্য নানা প্রকল্প ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

সাচার কমিটির রিপোর্টের পর সংখ্যালঘুদের মন জয়ের চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখছে না রাজ্য সরকার। আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটের আগে রবিবার সন্ধ্যায় পার্কসার্কাস ময়দানে 'মিলন মেলা'র উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বক্তব্যেও এমনই ইঙ্গিত পাওয়া গেল। কাগজে কলমে মিলন মেলা হলেও সেখানে শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য একগুচ্ছ সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের কথা ঘোষণা করলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, মোট ৫০০টি মাদ্রাসা কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে। মাদ্রাসা উন্নয়নের জন্য ২০ কোটি টাকা দেওয়া হবে। কলকাতা মাদ্রাসাকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উন্নীত করা হচ্ছে।

তিনি এদিন নতুন মাদ্রাসা নির্মাণ, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সাহায্য, ছাত্রাবাস নির্মাণ, কম্পিউটার শিক্ষা, সরকারি চাকরিতে মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানো, আবাসন নির্মাণ প্রভৃতি বিষয়ে সরকারের নানা পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এ রাজ্যের মুসলিমরা এখনও শিক্ষা, সরকারি চাকরিসহ অনেক ক্ষেত্রেই পিছিয়ে রয়েছে। সরকারি দপ্তরে মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব মোটেও আশাপদ নয়। এর পরিবর্তন ঘটাতে হলে মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণ দরকার। প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদেরও ইংরেজি, অঙ্ক, কম্পিউটার প্রভৃতি শেখাতে হবে। যারা পারিবারিক সূত্রে বিভিন্ন পেশায় যুক্ত, তাদের আধুনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য রাজ্য সরকার বিশেষ অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করছে। মুসলিম সমাজের মধ্যে কোথায় সমস্যা আছে, জেলা ধরে তার সমীক্ষা করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞ সংস্থাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান ২৪.১২.২০০৭

মুসলিমদের নানা সুবিধা পাইয়ে দিতে রাজ্যে ছয় টাস্ক ফোর্স

পঞ্চায়েত ভোটের আগে মুসলিমদের নানাভাবে খুশি করতে জোর তৎপরতা শুরু করেছে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার। এ জন্য রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক দপ্তর নতুন নতুন নির্দেশ জারি করে চলেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং চাকরিবাকরির ক্ষেত্রে মুসলিমদের জনসংখ্যার অনুপাতে সুবিধা পাইয়ে দিতে রাজ্য ছয় দপ্তরে বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করার প্রস্তাব দিয়েছে তারা। এই ছয় দপ্তর হল, শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, মহিলা ও শিশু কল্যাণ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন এবং পুর দপ্তর।

মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষায় উৎসাহ দিতে নতুন ঋণ প্রকল্প চালু এবং ডাক্তারি ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের সম্পূর্ণ বিনা খরচে পড়ার সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে সংখ্যালঘু বিষয়ক দপ্তর। মাদ্রাসার প্রসারে পাশাপাশি মুসলিমদের শিক্ষা বিস্তারে আরও বেশি করে সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরিতে উৎসাহ দেবে রাজ্য সরকার। এ জন্য নিয়মকানুন সরল করার উদ্যোগ নিয়েছে সংখ্যালঘু বিষয়ক দপ্তর। মুসলিমদের আরও বেশি করে ব্যাংকের ঋণ পাইয়ে দিতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করেছে ওই দপ্তর। এছাড়া মুসলিমদের কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে নাবার্ড এবং সিডবি'র মতো সরকারি ব্যাংকের সঙ্গে চুক্তি করতে চলেছে রাজ্য সরকার। স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা, সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনা, স্বর্ণজয়ন্তী শহরি রোজগার যোজনা এবং আরবানওয়েজ এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রামের মতো কর্মসংস্থান প্রকল্পে বরাদ্দ অর্থের ভাগ জনসংখ্যার নিরিখে মুসলিমদের দিতে হবে।

টাস্ক ফোর্সের সুপারিশমতো মুসলিমরা জনসংখ্যার অনুপাতে প্রাপ্য সুবিধা পাচ্ছে কিনা সেদিকে নজরদারির জন্য রাজ্য স্তরে মুখ্যমন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে ইন্টার মিনিস্টেরিয়াল এমপাওয়ার্ড কমিটি এবং জেলায় সভাধিপতিদের নেতৃত্বে সংখ্যালঘু কল্যাণ কমিটি গঠন করা হচ্ছে। এছাড়াও মুসলিমদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতিতে বিশেষভাবে জোর দিতে পৃথক অ্যাভাইসারি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। ছয় দপ্তরের মন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করার পাশাপাশি সংখ্যালঘু বিষয়ক দপ্তরের একজনকে টাস্ক ফোর্সের সদস্য করা হচ্ছে।

সাচার কমিটির রিপোর্টে রাজ্যে মুসলিমদের দুরবস্থার যে ছবি তুলে ধরা হয়েছে তাতে

সিপিএম রাজ্য নেতৃত্ব এবং সরকারি কর্তারা রীতিমতো অস্বস্তিতে। আগামী পঞ্চায়েতে ভোটের আগে তাই মুসলিমদের নানাভাবে খুশি করার চেষ্টা শুরু হয়েছে।

সেই লক্ষ্যেই সংখ্যালঘু কল্যাণ বিষয়ক দপ্তর সংখ্যালঘুদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য সম্প্রতি একটি অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করেছে। তাতে ওই দপ্তর বলেছে, মুসলিমদের উন্নতিতে সব দপ্তরকেই উদ্যোগী হতে হবে। অ্যাকশন প্ল্যানের অ্যাপ্রোচ পেপারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্যে মুসলিমদের পিছিয়ে থাকার নানা দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে সংখ্যালঘু বিষয়ক দপ্তর। তারা বলেছে, রাজ্যে ১১৬১টি স্কুলবিহীন গ্রাম আছে যেখানে জনসংখ্যার ৪০ শতাংশই মুসলিম। আর মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামগুলির মধ্যে মাত্র ৩৬ শতাংশ গ্রামে পাকা রাস্তা আছে। বর্তমান প্রজন্মের মাত্র ১১.৯ শতাংশ মুসলিম মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরোয়। মুসলিমদের ছাত্রছাত্রীদের মাথাপিছু শিক্ষাখাতে ঋণের পরিমাণ কম।

বর্তমান, ২৪.০৮.২০০৭

কলকাতা সংখ্যালঘু বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে

এবার কলকাতায় সংখ্যালঘুর জন্য সম্পূর্ণ আলাদা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রস্তাবিত নাম 'মৌলনা আবুল কালাম আজাদ বিশ্ববিদ্যালয়'। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের দপ্তর থেকে ছাত্রপত্র মিলেছে। কলকাতাসহ সারা দেশে সংখ্যালঘুদের জন্য মোট তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। আজমীরের বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম হবে গরিব-ই-নওয়াজ, কর্ণাটকের বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম হবে টিপু সুলতানের নামে। এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিস্থিতি, স্থান এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কী কী পাঠ্যক্রম চালু করা হবে তা খতিয়ে দেখতে প্রাক্তন বিদ্যুৎমন্ত্রী শঙ্কর সেন, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপচার্য আবিদ আহমেদ, অধ্যাপক সৈয়দ হামিদ, সৈয়দ শাহাবুদ্দিনসহ পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী এ আর আন্তুলে। তাঁর কাছে আগামী এক মাসের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেবে ওই কমিটি।

দৈনিক স্টেটসম্যান, ০৮.০৮.২০০৭

মুসলিমদের উন্নয়নের দিকেই শুধু নজর কেন্দ্রের : বি জে পি

দেশে দরিদ্রতম মুসলিমদের সংখ্যা ৫ কোটি। আর দরিদ্রতম হিন্দু রয়েছে ২৩ কোটি। কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ওই ৫ কোটি মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য প্রাণপাত করে চলেছে। হাজার হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করে সাচার কমিটির সুপারিশ রূপায়ণ করা হচ্ছে। কিন্তু একইরকম অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও স্রেফ হিন্দু হওয়ার কারণে ২৩ কোটি মানুষ যে তিমিরে ছিলেন, রয়ে যাচ্ছেন সেই তিমিরেই। এই অভিযোগ করে আজ বি জে পি বলেছে, এই সরকার দেশে ফের দ্বিজাতিতত্ত্বের জন্ম দিচ্ছে। কারণ ব্যাংকে ঋণ পাওয়া, বেছে বেছে মুসলিম এলাকায় রাস্তা নির্মাণ, উর্দু স্কুল গড়ে তোলা, স্কলারশিপ ইত্যাদি একঝাঁক প্রকল্পের সুবিধা পাবে ৫ কোটি চরম দরিদ্র মুসলিম। কিন্তু বাকি ২৩ কোটি দারিদ্র সীমার নীচে থাকা হিন্দুর জন্য পৃথকভাবে সরকারের কোনও উদ্যোগ নেই। আজ বিরোধী দল স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছে, আগামী নির্বাচনে তাদের প্রচারের কেন্দ্রেই থাকবে সাচার কমিটির সুপারিশ রূপায়ণের মাধ্যমে ইউ পি এ সরকার দেশে সম্প্রদায়িক বিভেদ তৈরি করছে। ভোটের জন্য চলছে মুসলিম তোষণ।

বি জে পি-র লোকসভার উপদলনেতা বিজয়কুমার মালহোত্রা বলেছেন, জনগণনা অনুযায়ী দেশে দারিদ্রসীমার নীচে থাকা মানুষের সংখ্যা ২৯ কোটি। এর মধ্যে হিন্দু ২৩ কোটি এবং মুসলিম ৫ কোটি। বাকি এক কোটি মানুষ অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। অর্থাৎ দারিদ্রসীমার নীচে থাকা মোট ভারতবাসীর ৭৯ শতাংশই হিন্দু। আর ১৭ শতাংশ মুসলিম। কিন্তু হিন্দু কিংবা অন্যান্য সম্প্রদায়ের সামাজিক ও আর্থিক উন্নতির জন্য সরকারের কোনও মাথাব্যথা নেই। অথচ ৫ কোটি দরিদ্র মুসলিমের উন্নতির জন্য সরকার প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে। প্রায় প্রতিদিনই নতুন নতুন পরিকল্পনা ঘোষিত হচ্ছে। মালহোত্রার প্রশ্ন, তাহলে হিন্দুরা কী পাপ করল? এদেশে হিন্দু হওয়া কী অপরাধ? বি জে পি আজ কড়া বিবৃতি দিয়ে বলেছে, এই সরকারের বহু ব্যর্থতা রয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় পাপ উন্নয়নের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম বিভাজন তৈরি করা।

বর্তমান, ০৮.০৯.২০০৭

তসলিমাকে দেশ ছাড়া করার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি ইমামের

তসলিমা নাসরিনকে অবিলম্বে দেশ ছাড়তে হবে এই দাবি জানিয়ে শুক্রবার টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে চিঠি দেন। এদিন ধর্মতলায় টিপু সুলতান মসজিদে হায়দরাবাদের কিছু নেতা আসেন। সেখানে ইমাম সৈয়দ মহম্মদ নুরুর বরকতির সঙ্গে বৈঠকের পর একটি চিঠি পুলিশ কমিশনার প্রসূন মুখোপাধ্যায়ের মারফত মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়। চিঠিতে জানানো হয়, তসলিমা ভারতীয় নাগরিক নয়। তাঁকে নাগরিকত্ব দেওয়া চলবে না। ভিসা বাতিল করে অবিলম্বে তসলিমাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে। মসজিদের সামনে একটি বিক্ষোভ সভাও হয়।

বর্তমান, ১৮.০৮.২০০৭

Marriage between a Hindu and non-Hindu under HMA not vaild: HC

New Delhi, 31 Dec. 2010

The marriage between a Hindu and a non-Hindu solemnised as per the Hindu rites is neither valid nor the parties can claim any benefits under the Hindu Marriage Act (HMA), the Delhi High Court has ruled.

The High Court also held that 'mere theoretical allegiance' to Hinduism would not make one a Hindu unless he or she had actually converted to the religion.

"Mere fact that the parties had solemnised the marriage as per the Hindu rites and ceremonies would not attract the applicability of the Hindu Marriage Act as the mandate of the law is that marriage has to take place between two Hindus," said Justice Kailash Gambhir in a recent judgement.

"It is imperative to prove that both the parties were Hindus at the time of the solemnisation of marriage," the court said.

The court rejected the woman's claim that her husband had converted to Hinduism as she failed to furnish any evidence to substantiate her claim.

The ruling came on a petition filed by Sangeeta, who challenged the family court's March 2010 order dismissing her divorce petition on the ground that her husband Preston Gomes is a Christian and there was no evidence to prove that he converted to Hinduism.

National Spirit, 07.01.2011

Muslim population on the rise

Washington, 28 Jan.

Pakistan may surpass Indonesia as the world's most populous Muslim nation while the Indian Muslims' ; number is estimated to cross, 23.6 crore in 2030. as the community's population worldwide is exppeced to grow about twice the rate of non-Muslims in the next two decades, says a new study released by The Pew Forum on Religion and Public Life. In the next two decades, the, the Muslim population globally is expected to grow about twice the rate of the non-Muslims, the study, *The future of the Global Muslim Population,* said. If current trends continue, Muslims will make up 26.4 per cent of the world's total projected population of 8.3 billion in 2030, up from 23.4 per cent of the estimated 2010 world population of 6.9 billion, said the report, India is projected to have an official Muslim population of 23,6182,000 in 2030, which would be nearly 16 per cent of the then Indian population. In 2010, India is estimated to have 1,77,286,000 Muslims, which is 14.6 per cent of the total Indian population.

With a projected population of 2,56,117,000 in 2030, Pakistan is expected to surpass Indonesia as the country with the single largest Muslim population. In 2010, Pakistan has an estimated Muslim population of 178,097,000. The report said, world's Muslim population is expected to increase by about 35 per cent in the next 20 years, rising from 1.6 billion in 2010 to 2.2 billion by 2030.

The average annual growth rate of Muslims in the next two decades has been projected to be 1.5 per cent compared with 0.7 per cent for the non-Muslims. While the global Muslim population is expected to grow at a faster rate than the non-Muslim population, the Muslim population nevertheless is expected to grow at a slower pace in the next two decades than it did in the previous two decades From 1990 to 2010, the global Muslim population increased at an average annual rate of 2.2 per cent, compared with the projected rate of 1.5 per cent for the period from 2010 to 2030, the report said.

Statesman, 29.01.2011

নারীপাচার ও পতিতাবৃত্তিতে এরাজ্য দেশের মধ্যে তৃতীয়

নারীপাচার এবং নাবালিকাদের পতিতাবৃত্তিতে আসার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ এখন দেশের মধ্যে তৃতীয় স্থানে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন দেশজুড়ে সমীক্ষা চালিয়ে যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে তাতেই বলা হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কর্নাটকের পরই নারীপাচার ও পতিতাবৃত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের স্থান। এটিকেই এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য বলে ধরে নিয়ে তার ভিত্তিতে রাজ্যের সমাজকল্যাণ দপ্তরও পাচার রোধে নানা পরিকল্পনা করে এগচ্ছে।

নারী পাচার রোধে গৃহীত পরিকল্পনা কতটা কার্যকর হয়েছে তা খতিয়ে দেখতে সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরের সচিবদের ডেকে শুক্রবার মহাকরণে বৈঠক করেন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরি। সমাজকল্যাণ সচিব সৈয়দ নুরুল হক বলেন, মানবাধিকার কমিশন যে রিপোর্টটি তৈরি করেছে তাতে বলা হয়েছে এখন দেশে প্রতি বছর যত নারী পাচার হয় তার ২৯.৫ শতাংশ হয় অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে, ১৫ শতাংশ কর্নাটক, ১২.৫ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গ এবং ১২.৩ শতাংশ তামিলনাড়ু থেকে। তবে ঠিক কত মহিলা পাচার হয়ে যাচ্ছে তার কোনও হিসাব আমাদের কাছে নেই। সে সংখ্যা অবশ্য খুব কমও নয়।

জানা গিয়েছে, মানবাধিকার কমিশন তাদের রিপোর্টে বলেছে সারা দেশে যত বাংলাভাষী মেয়ে পাচার হয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে ১২ শতাংশ বাংলাদেশি এবং ৮ শতাংশ নেপালি। অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে সীমান্তের জেলাগুলি টপকে মেয়েরা যে পতিতাবৃত্তিতে শামিল হচ্ছে তা এই রিপোর্ট থেকেই স্পষ্ট। সচিব জানান, কমিশনের তথ্য থেকে বাংলাদেশি এবং নেপালি মেয়েদের বাদ দিলে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাওয়া মেয়েদের সংখ্যা কমে যাবে। রাজ্যের স্থান সেক্ষেত্রে তৃতীয় থেকে নেমে চতুর্থ হবে।

যদিও দপ্তরের অন্য একটি সূত্র জানাচ্ছে, মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্টে মহিলাদের যে সংখ্যা দেওয়া হয়েছে তারা তো পশ্চিমবঙ্গ থেকেই পাচার হয়েছে। বাংলাদেশি বা নেপালি মেয়েরা তো এরাজ্য থেকেই পাচার হয়েছে।

সচিব জানান, উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ, সন্দেশখালি, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং, পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ, মুর্শিদাবাদের ডোমকল, জলঙ্গি এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের লোধাগুলি অঞ্চলকে পাচারপ্রবণ অঞ্চল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

রাজ্যের নিজস্ব সমীক্ষায় ধরা পড়েছে, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার মতো গরিব জেলাতে দারিদ্র থাকলেও সেখানে নারী পাচার হয় না। কিন্তু সীমান্ত লাগোয়া জেলাগুলি থেকে নারী পাচার যেন সস্তায় রোজগারের বিকল্প পথ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

শুধু আর্থিক কারণেই নয়, স্রেফ ভোগবাদী জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে অনেক মেয়েই মুম্বই, পুনে, গোয়া প্রভৃতি এলাকায় চলে যাচ্ছে, যাদের আর্থিক অবস্থা ততটা খারাপ নয়। তবুও দালালদের খপ্পরে পড়ে আরও 'ভালোভাবে' থাকার জন্যই শয়ে শয়ে মেয়ে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

বর্তমান, ০৯.০৬.২০০৭

ব্যাভিচারের অপরাধে পাথর ছুঁড়ে হত্যা

ব্যাভিচারের দায়ে প্রকাশ্যে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হল এক আফগান মহিলাকে। আফগানিস্তানে তালিবান শাসনের পতনের পর এই প্রথম এ জাতীয় ঘটনা ঘটল।

আফগান পুলিশসূত্রে এ কথা স্বীকার করে নিয়ে জানানো হয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকায় তদন্তকারী দল পাঠানো হবে।

শরিয়তি আইন অনুযায়ী ব্যভিচার ইসলামে অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ। চাবুক মারা থেকে শুরু করে পাথর ছুঁড়ে মৃত্যু— যা কিছু হতে পারে এর শাস্তি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ২৯ বছরের আমিনাকে তার বাড়ি থেকে হিঁচড়ে টেনে বের করে নিয়ে যায় স্থানীয় প্রশাসনের কয়েকজন কর্মী ও তার স্বামী। প্রকাশ্য স্থানে নিয়ে গিয়ে তার উপর ক্রমাগত পাথর ছোঁড়া হতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সে। তার প্রেমিকের অবশ্য এত কড়া সাজা হয়নি। একশ বার চাবুক মারার পর মুক্তি দেওয়া হয় তাকে। নব্বইয়ের দশকে আফগানিস্তানে মুজাহিদিনদের শাসনকালে বা তার পরবর্তী সময়ে তালিবানদের আমলে এধরনের ঘটনার কথা প্রায়শই শোনা গেলেও হামিদ কারজাইয়ের আমলে এই প্রথম ঘটল।

দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান ২৫.০৪.২০০৫

ইসলাম অথবা মৃত্যু : পশ্চিমী দুনিয়াকে হুমকি দিল আল কায়েদা

ইসলাম অথবা মৃত্যু। এর বাইরে আর কিছু নেই। এই ভাষাতেই পশ্চিমী দুনিয়াকে হুমকি দিল আল কায়েদার ইরাক শাখা।

ইন্টারনেটে সম্প্রচারিত এক বিবৃতিতে তারা আরও বলেছে, যতদিন না তামাম পশ্চিমী দুনিয়ায় ইসলামের পতাকা ওড়ানো সম্ভব হবে ততদিন তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ চলবে। পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট সম্প্রতি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে যে বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন, তার জবাবেই এই হুমকি দিয়েছে লাদেন বাহিনী।

বিবৃতিটি 'মুজাহিদিন কনসালটেটিভ কাউন্সিল' নামে এক সংগঠনের তরফে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তাতে পোপকে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, খ্রিষ্টধর্মের পরাজয়ের জন্য প্রস্তুত থাকুন। খ্রিষ্টানদেরপবিত্র ক্রুশকে গুড়িয়ে দেব আমরা। খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের সামনে ইসলাম বা মৃত্যু— এই দুইয়ের মধ্যে একটি পথ বেছে নেওয়ার রাস্তাই খোলা থাকবে। অতীতে মুসলিমরা যেভাবে কনস্ট্যান্টিনোপল জয় করেছিল, সেভাবেই এবার রোম দখল করা হবে। রোমের কাছেই ভ্যাটিকান সিটিতে থাকেন পোপ।

এদিন প্রচারিত ওই বিবৃতিতে আল কায়দা অভিযোগ তুলেছে, পোপ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের কথামতোই চলছেন। ইসলামি দুনিয়ার বিরুদ্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট যে ধর্মযুদ্ধ শুরু করেছেন তাকে এবং সেই যুদ্ধের সেনাদের অনুপ্রাণিত করতেই তিনি উদ্যোগী হয়েছেন।

হজে ভরতুকি নিয়ে স্থগিতাদেশ তুলে নিল সুপ্রিম কোর্ট : হজযাত্রীদের আর্থিক ভরতুকি দিতে পারবে না কেন্দ্র ও উত্তরপ্রদেশ সরকার— এই মর্মে রায় দিয়েছিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। সুপ্রিম কোর্ট আজ সেই রায় স্থগিত রাখল। প্রধান বিচারপতি ওয়াই কে সাবরওয়ালের নেতৃত্বাধীন একটি বেঞ্চ ওই নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি অবশ্য জানিয়েছে, শুধুমাত্র চলতি বছরের জন্যই সেটি প্রযোজ্য হবে। এবছরের নভেম্বরে নির্ধারিত হজযাত্রার জন্য গৃহীত সরকারি ব্যবস্থাও খতিয়ে দেখেছে বেঞ্চ।

বর্তমান, ১৯.০৯.২০০৬

ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে যুবককে গুলি করল বি ডি আর

দিনের বেলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে এক যুবককে মাথায় রাইফেল ঠেকিয়ে গুলি করে মারল বি ডি আর। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুরের সীমান্ত শহর হিলির দক্ষিণপাড়া এলাকায়। হিলি থানা সূত্রে জানা যায়, বি ডি আরের গুলিতে নিহত যুবকের নাম সৌরভ পোদ্দার (২৬) ওরফে চিন্টু। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, এদিন সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ সীমান্তের ওপাড়ে বাংলাদেশ হিলি স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেন থেকে একদল বাংলাদেশি সীমান্তপাড়ের চেষ্টা করে। ওই সময় ওপাড়ে প্রহরারত বাংলাদেশ রাইফেলস্-এর দুই জওয়ান তাদের পিছু ধাওয়া করলে কাঁটাতারবিহীন ওই এলাকা দিয়ে বাংলাদেশিরা ভারতীয় ভূখণ্ডের ৫০ গজ ভেতরে ঢুকে পড়ে। ঘটনাক্রমে সে সময় দক্ষিণপাড়ার বাসিন্দা ওই যুবক প্রাইভেট টিউশনি সেরে বাড়ি ফিরছিল। বি ডি আরের ওই জওয়ানরা তাঁকে বাংলাদেশি ভেবে জোরপূর্বক ওপাড়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে যুবকটি তাতে বাধা দিয়ে উল্টে তাদের বেআইনিভাবে ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ার বিষয়ে প্রশ্ন তোলে। এই ঘটনায় উক্ত বি ডি আরের একজন ক্ষেপে গিয়ে যুবকটির কপালে রাইফেল ঠেকিয়ে গুলি করে আবার ওপাড়ে পালিয়ে যায়। গুলিতে জখম ওই যুবক মাটিতে লুটিয়ে পড়লে এলাকার বাসিন্দারা ছুটে এসে তাঁকে বালুরঘাট হাসপাতালে নিয়েগেলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় দক্ষিণপাড়া সহ সমগ্র হিলিতে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এলাকার উত্তেজিত সাধারণ মানুষ বি ডি আরের পাশাপাশি বি এস এফের ভূমিকা নিয়েও ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শীরা অভিযোগ করে বলেছেন, ঘটনাস্থল থেকে সামান্য দূরে বি এস এফ জওয়ানরা দাঁড়িয়ে থাকলেও কেউ উক্ত বি ডি আরকে ধরার চেষ্টা করেনি। এদিকে বি ডি আরের গুলি চালানোর খবর বি এস এফের হেড কোয়ার্টার পাতিরামে পৌঁছাতেই বিশাল বাহিনী নিয়ে বি এস এফ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। বি এস এফের বিরুদ্ধে ওঠা সাধরণ মানুষের অভিযোগ প্রসঙ্গে বি এস এফ আধিকারিকদের কেউ কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

এদিকে বি এস এফের সামনে নিরীহ যুবকের মৃত্যুর প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বারো ঘন্টার হিলি বন্‌ধ-এর ডাক দিয়েছে বামফ্রন্ট। জেলা পুলিশ সুপার কল্যাণ কুমার মল্লিক বলেছেন, নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে এই ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান, ১৯.১০.২০০৬

উরশ স্পেশাল এল

বাংলাদেশের ৭টি জেলার সাড়ে ১৪০০ যাত্রী নিয়ে উরশ্ স্পেশাল ট্রেন সরাসরি এ বাংলায় ঢুকতেই চেরা আবেগের বরফ গলল। শুক্রবার দুপুরে নদিয়ার গেদে সীমান্ত দিয়ে এই ট্রেন ঢুকল ভারতে। আঞ্জুমান-ই-ফাদেরিয়ার উদ্যোগে বড়হুজুর পাক কেবলা পরিচালিত এই তীর্থযাত্রীদের ট্রেন শনিবার পৌঁছবে মেদিনীপুরে। তার আগে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত গেদে রেল স্টেশনে নেমে স্নান, খাওয়াদাওয়া ফাঁকেই ভাব বিনিময়ে মাতালেন দুই বাংলার মানুষ। নদিয়ার গেদে স্টেশনের কাছেই আন্তর্জাতিক সীমানা। রেললাইন ধরে মিনিট পাঁচেক উত্তরদিকে এগোতেই ওপারের রাজবাড়ি জেলা শুরু।

অনেক আগে থেকেই ট্রেন যোগাযোগ থাকায় রেললাইন পাতাই ছিল। তবে এখন নিয়মিত ট্রেন চলেনা। ওপার থেকে এপার আসার এই ট্রেন অবশ্য প্রতি বছর এই সময়ে বাঁধা ছঁকেই আসে। ঢাকা, রাজবাড়ি, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কুষ্টিয়া, পাবনা থেকে এবার যাত্রীরা এসেছেন। জানালেন যাত্রী সংগঠক জাকির হোসেন। সকলে ১১টা নাগাদ ট্রেন ঢুকলেও বি এস এফ, পুলিশ, কাস্টমসের পদস্থরা রাত থেকেই এলাকা ঘিরে রেখেছিলেন। তবে রাজবাড়ির এন জি ও কর্মী শামিমা খাতুন, গৃহবধূ মেহেবা পারভিন কিংবা রাজবাড়ি সরকারি কলেজের স্নাতক শিক্ষার ছাত্রী কল্পনা আখতারিরা বেশি আনন্দে মাতলেন। ট্রেন থেকে নেমে আলাপ জমালেন স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে। ছোটরা অবাক চোখে দেখছিল ভারত নামের দেশটাকে। নতুন কিছু খুঁজে না পেয়ে ছোট্ট শামিম শুধু বলল, "আমি ঐশ্বর্য রাইয়ের ছবি কিনি। এখানে দেখছি না তো!"

দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান, ১৭.০২.২০০৭

সিদ্দিকুল্লাকে জব্দ করতে স্বীকৃতিহীন মাদ্রাসাকে খুশি করতে চলেছে রাজ্য

রাজ্যে স্বীকৃত মাদ্রাসার প্রায় পাঁচ গুণ স্বীকৃতিহীন মাদ্রাসা রয়েছে। দিন দিন স্বীকৃতিহীন মাদ্রাসার সংখ্যা বাড়ছে। কিছুদিন আগেও এই সব মাদ্রাসাকে সন্দেহের চোখে দেখত বামফ্রন্ট সরকার। এগুলির পিছনে দেশ বিরোধী শক্তির মদত আছে বলেও সরকারি কর্তারা অভিযোগ তুলতেন। কিন্তু জমির ইস্যুতে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দকে, জব্দ করতে এই সব স্বীকৃতিহীন মাদ্রাসাকেই নানাভাবে খুশি করতে চলেছে বামফ্রন্ট সরকার। রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর জানতে পেরেছে, জমিয়তে নেতা সিদ্দিকুল্লা চৌধুরির অন্যতম শক্তি হল মাদ্রাসা। মাদ্রাসার অভাব-অভিযোগ নিয়ে দীর্ঘদিন আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাঁকে ভয়ংকর ব্যক্তি বলে গালমন্দ করলেও রাজ্য সরকার নাকি তলে তলে স্বীকৃতিহীন মাদ্রাসাগুলিকে খুশি করতে উঠেপড়ে লেগেছে। এজন্য সংখ্যালঘু শিক্ষা মিশন নামে নতুন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হচ্ছে। ওই কর্মসূচি অনুযায়ী স্বীকৃতিহীন মাদ্রাসাগুলিকে সর্বশিক্ষা অভিযানসহ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টা চলছে। এইভাবে মাদ্রাসার উপর সিদ্দিকুল্লার প্রভাব খর্ব করাই আসল উদ্দেশ্য রাজ্য সরকার ও সিপিএমের।

রাজ্য গোয়েন্দা পুলিশ সম্প্রতি রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে স্বীকৃতিহীন মাদ্রাসা নিয়ে একটি গোপন রিপোর্ট দিয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, রাজ্যে সরকার-স্বীকৃত মাদ্রাসা আছে ৫০৬টি। সেখানে স্বীকৃতিহীন অর্থাৎ মাদ্রাসা বোর্ডের অনুমোদনহীন মাদ্রাসার সংখ্যা ২৪৭৭টি। সীমান্তবর্তী কয়েকটি জেলায় স্বীকৃতিহীন মাদ্রাসার সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। যেমন উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদে স্বীকৃত মাদ্রাসা আছে যথাক্রমে ৪৫টি, ৫০টি, ১৮টি এবং ৭৩টি। সেখানে ওই জেলাগুলিতে স্বীকৃতিহীন মাদ্রাসা আছে যথাক্রমে ১২৪টি, ৩৮১টি, ৮৯টি ও ৩০৮টি। একইভাবে মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়িতে স্বীকৃত মাদ্রাসা আছে যথাক্রমে ৬৮টি, ২০টি, ১৬টি, ২৩টি ও ৮টি। অন্যদিকে ওই জেলাগুলিতে স্বীকৃত নয় এমন মাদ্রাসা আছে যথাক্রমে ৬১৭টি, ১০৮টি, ১০০টি, ৪৮টি এবং ৮৩টি।

জমির ইস্যুতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনশন ধর্মঘট চলার সময় জমিয়তে উলেমায়ে

হিন্দ কলকাতায় শহিদ মিনার ময়দানে কৃষিজমি রক্ষার দাবিতে যে জমায়েত করে তাতেই সিদ্দিকুল্লা চৌধুরিদের শক্তির আসল জায়গা টের পেয়ে যায় রাজ্য সরকার। মাদ্রাসার হাজার হাজার ছাত্র ভিড় জমায় জমায়েতে। এরপরই গোয়েন্দা দপ্তরের কাছে মাদ্রাসা নিয়ে রিপোর্ট তলব করে স্বরাষ্ট্র দপ্তর।

	স্বীকৃত মাদ্রাসা	*স্বীকৃতিহীন মাদ্রাসা*
জলপাইগুড়ি	৮	৮৩
কোচবিহার	২৩	১০০
দার্জিলিং	৩	৪৮
উত্তর দিনাজপুর	২০	৬১৭
দক্ষিণ দিনাজপুর	১৬	১০৮
মালদহ	৬৮	৮৫
নদীয়া	১৮	৮৯
কলকাতা	৯	১০১
হাওড়া	২৮	৬৩
পশ্চিম মেদিনীপুর	১৬	৭৬
পূর্ব মেদিনীপুর	১৬	১২
হুগলি	৩৫	৩৬
বর্ধমান	৩৪	৯৯
বীরভূম	২৯	৯১
মুর্শিদাবাদ	৭৩	৩০৮
পুরুলিয়া	৫	৩৯
বাঁকুড়া	১০	১৭
উত্তর ২৪ পরগনা	৪৫	১২৪
দক্ষিণ ২৪ পরগনা	৫০	৩৮১
মোট	**৫০৬**	**২৪৭৭**

বর্তমান, ০৬.০২.২০০৭

সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে নতুন প্রকল্প গড়তে নির্দেশ দিলেন মমতা

বিভিন্ন জেলায় মুসলিমদের জীবনমানের উন্নতি ও তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে নতুন নতুন প্রকল্প তৈরি করার জন্য সংখ্যালঘু দফতরকে নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি চান, চাকরিবাকরি, সুযোগসুবিধা থেকে তারা যেন বঞ্চিত না থাকে। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যালঘু দফতর নিজের হাতেই রেখেছেন।

বুধবার মহাকরণে তিনি এই দফতরের সচিব এস এন হকের সঙ্গে মুসলিম সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নতির জন্য নতুন প্রকল্প কী কী নেওয়া যায় তা নিয়ে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেন বলে সরকারি সূত্রে জানা যায়। মমতা চান যেসব ক্ষেত্রে মুসলিমরা এখনও পিছিয়ে রয়েছে, সেখানে সরকারের তরফে নতুন কল্যাণকর পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাতে তারা আর পিছিয়ে না থাকে।

সংখ্যালঘু দফতর এ ব্যাপারে শিগগিরই নতুন কিছু কাজ হাতে নেবে। তার মধ্যে প্রধান হল, মুসলিম-অধ্যুষিত জেলাগুলিতে একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখা কোন দিক থেকে

তারা এখনও পিছিয়ে। তাদের মধ্যে শিক্ষার অগ্রগতি, সরকারি অফিসে চাকরির সুযোগ-সুবিধা, জীবনধারণ প্রণালীর উন্নতি— সবই এই সমীক্ষায় দেখা হবে বলে জানা গেল।

মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি জানিয়েছেন, সাচার কমিটির প্রধান আর সাচারকে কলকাতায় আসার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তিনি এলে তাঁর সঙ্গে বসে মুসলিমদের নানাবিধ সমস্যা— এবং কীভাবে সেই সব সমস্যার সমাধান করে তাদের উন্নত জীবনযাপনে সরকারের তরফে সাহায্য করা যায়, তা আলোচনা করা হবে। এখানে উল্লেখ্য, সাচার কমিটির সুপারিশগুলি তদানীন্তন বামফ্রন্ট সরকারের গ্রহণযোগ্য না হওয়াতে তা বাস্তবে রূপায়িত করা হয়নি। বরং এই রিপোর্টের কঠোর সমালোচনা করেছিল ওই সরকার।

এদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গের ১২টি মুসলিম অধ্যুষিত জেলার জন্য যে মাল্টি সেকটরাল ডেভলপমেন্ট প্রকল্প বামফ্রন্ট সরকারের আমলে চালু হয়েছিল, তা ২০১২ সালের মার্চ মাসে শেষ হবে। এই প্রকল্পের কাজের সময়সীমা আরও বাড়ানো হবে কিনা তা এখনও নিশ্চিতরূপে জানা যায়নি। এই প্রকল্পে ৬৮৬ কোটি টাকা খরচ হবে। প্রকল্পের সিংহভাগ টাকা খরচ হয়ে গেছে। এই টাকা ১২ জেলার মুসলিমদের নানা ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য খরচ করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সংখ্যালঘু মন্ত্রকের অফিসাররা এসে এই প্রকল্পের কাজকর্ম দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন বলে সংখ্যালঘু দফতরের দাবি।

মমতা চান, মুসলিমরা যাতে শিক্ষার দিক থেকে এগিয়ে যেতে পারে তার জন্য নতুন সরকার সব রকমের চেষ্টা চালিয়ে যাক। কারণ শিক্ষাই তাদের টেনে তুলবে। বর্তমান সরকার ১০ হাজার মাদ্রাসার স্বীকৃতি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। সংখ্যালঘু দফতরের খরব ইতিমধ্যেই মাদ্রাসার স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য প্রচুর দরখাস্ত জমা পড়েছে। দরখাস্তগুলি খতিয়ে দেখে সরকার স্বীকৃতি দিয়ে দেবে।

দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান, ৩০.০৬.২০১১

রমজান মাসে কলকাতার মসজিদগুলি পরিষ্কার করবে পুরসভা

রমজান মাস চলাকালীন কলকাতার সমস্ত বড় বড় মসজিদগুলিকে পরিষ্কার করবে কলকাতার পুরসভা। এজন্য প্রত্যেকটা মসজিদে ২-৩ জন করে পুরকর্মী নিযুক্ত করা হবে। একথা জানান কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ (সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইন্টালি ওয়ার্কশপ) দেবব্রত মজুমদার। তিনি বলেন, রমজান মাসে যাতে কোনও দূষণ না ছড়ায় সেই জন্য সন্ধ্যাকালীন সেবা দেওয়া হবে। চুন ও ব্লিচিং পাউডার সরবরাহ করা হবে। উল্লেখ, কলকাতা পুরসভা গত বছরই রমজান মাসে এই ব্যবস্থা নিয়ে ছিল। এ বছর আরও ব্যাপকভাবে তা করা হবে বলে পুরসভাসূত্রে জানা গেছে। এদিকে বাগমারির কবরস্থানের বেহাল পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে কবরস্থান পরিদর্শন করতে যান কলকাতা পুরসভার ডেপুটি মেয়র ফারজানা আলম ও অন্যান্য পুরআধিকারিকরা। কবরস্থান পরিদর্শন করে উদ্বেগ প্রকাশ করে ডেপুটি মেয়র বলেন, এখানে রাস্তা খুবই খারাপ, ভালো আলোর ব্যবস্থা নেই। এখানে অনেকে মদ খেয়ে আড্ডা দেয়। ফলে এই স্থানের পবিত্রতা নষ্ট হয়। এ বিষয়ে তিনি কলকাতা পুরসভার হেলথ ম্যানেজার দেবাশিস সেনকে নির্দেশ দিয়েছেন ব্যবস্থা নিতে। তিনি আরও বলেন, সবেবরাত উপলক্ষেই কবরস্থান সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করা হবে।

দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান, ১৮.০৭.২০১১

সংরক্ষণ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মুসলিম ভোট ফেরানোর ব্যর্থ চেষ্টা

মুসলিমদের জন্য সরকারি চাকরিতে ১০ শতাংশ সংরক্ষণের ঘোষণা রাজ্যের মুসলিম জনতাকে আদৌ খুশি করতে পারেনি। মুসলিম সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, তাঁরা এই ঘোষণাকে মূলত 'কাগুজে' ঘোষণা হিসাবেই দেখছেন। তাঁদের মতে, এই ঘোষণার মূল লক্ষ্য, মুসলিম ভোটব্যাংক। তাঁদের আরও বক্তব্য, শেষ পর্যন্ত সাচার কমিশনের রিপোর্টকেই স্বীকার করতে বাধ্য হল সিপিএম। অথচ সাচার কমিশনের বিরুদ্ধেই বরাবর সরব এই বামফ্রন্ট সরকার।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত বহুল প্রচারিত উর্দু দৈনিক আখবার এ মশরিকের কার্যনির্বাহী সম্পাদক নাদিমুল হকের ভাষায়, সংরক্ষণকে স্বাগত। কিন্তু এই সরকার আদৌ তা চায় কি না, তা নিয়ে আমার প্রবল সন্দেহ আছে। বিধানসভা নির্বাচনের আর কয়েক মাস বাকি। এই সময় এমন ঘোষণা নির্বাচনী চমক ছাড়া আর কী হতে পারে। সংরক্ষণের মতো ব্যবস্থা কার্যকর করতে অন্তত দু-তিন বছর লাগে। ৩৪ বছর ধরে তো এই সরকার গদিতে। তাদের আজ হঠাৎ মনে পড়ল, রাজ্যের ৮৬ শতাংশ মুসলিম 'অধিক অনগ্রসর'। নাদিম আরও বললেন, এই ঘোষণা মুসলিমদের উপর কোনও প্রভাব ফেলবে না। আসন্ন বিধানসভা ভোটের জন্য তারা ইতিমধ্যে 'মাইন্ড সেট' করে ফেলেছে। এই ঘোষণা তাদের মনোভাবে কোনও পরিবর্তন আনতে পারবে না। তিনি বলেন, আমি বিগত ১০ বছরে অন্তত ৬ বার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। প্রত্যেকবারই তিনি মন্তব্য করেন, 'আমি জানি রাজ্যে মুসলিমরা অনেক পিছিয়ে।' নাদিমের আরও বক্তব্য, সংরক্ষণের নামে মুসলিমদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে ফ্রন্ট সরকার।

অবসরপ্রাপ্ত ইতিহাসের অধ্যাপক তথা প্রভাবশালী মুসলিম সংগঠন মিল্লি কাউন্সিলের নেতা সোলেমান খুরশিদ বলেন, সংরক্ষণের পদ্ধতিগত জটিলতা প্রচুর। ওবিসি সার্টিফিকেট পাওয়াই কার্যত অসম্ভব। ফর্মে ৩০-৩৫টি শর্ত রাখা হয়েছে। পূর্ব-পুরুষদের আমল থেকেই তারা একই পদবি ব্যবহার করছে, তা দেখাতে হবে। আর মুসলিমদের মধ্যে পদবি ব্যবহারের চল তেমনভাবে নেই। তাই নিজেকে ওবিসি প্রমাণ করা রীতিমতো কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এই ঝক্কি কাটানোর পর তো আসবে চাকরি পাওয়ার প্রশ্ন। তাই খুরশিদ সাহেবের মতে, বুদ্ধদেবের ওই ঘোষণা নির্বাচনকে মাথায় রেখেই। সংরক্ষণের ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকার যেসব ঘোষণা করেছে, তাতে বাঙালি আর উর্দুভাষী মুসলিমদের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি প্রয়াসও রয়েছে বলে মনে করছেন খুরশিদ। অল ইন্ডিয়া মাইনরিটিস অ্যান্ড উইকার সেকশনস কাউন্সিলের এক কর্তা ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, সংখ্যালঘু বলতে বামফ্রন্ট শুধু মুসলিমদেরই বোঝে। কারণ মুসলিম ভোটব্যাংক। তবে তাঁরও বিশ্বাস, মুসলিমদের জন্য চাকরিতে সংরক্ষণের ঘোষণা একটা মস্ত ভাঁওতা। শুধু মুখের কথা, এটা কাজে লাগবে না। কনফেডারেশন অব ওবিসি/এসসি/এসটিঅ্যান্ড মাইনরিটিস অব ওয়েস্ট বেঙ্গল-এর সাধারণ সম্পাদক কার্তিকচন্দ্র কাপাস এই ঘোষণাকে 'রাজনৈতিক চমক' আখ্যা দিয়ে বলেন, বামফ্রন্ট সরকার এতদিন ঘুমিয়েছিল কেন? মুসলিমদের জন্য আজ হঠাৎ এই মায়াকান্নাই বা কেন? তাঁর আরও বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গে কোনও রাজনৈতিক দল বা নেতা অনগ্রসর জাতি-গোষ্ঠীর জন্য কিছুই করেনি। মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ এ রাজ্যে মানা হয় নি। কার্তিকবাবু আরও জানান, মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা নিয়ে আলোচনার জন্য তাঁরা শীঘ্রই তাঁদের সংগঠনের রাজ্য কমিটির বৈঠক ডেকেছেন।

অন্যদিকে, সংরক্ষণের প্রক্রিয়ার মধ্যে এমন একটা ফাঁক রাখা আছে, যাতে সংরক্ষণ থাকা সত্ত্বেও মুসলিমদের চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে কোনও গ্যারান্টি থাকছে না। নিয়োগ কর্তাদের সিংহভাগ যদি চান, তাহলে নির্দেশের ওই ফাঁক গলেই মুসলিমদের চাকরি পাওয়া থেকে বঞ্চিত করতে পারবেন। এতে কোনও বিধিভঙ্গও হবে না। কীভাবে? মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্যে সরকারি চাকরিতে অতি অনগ্রসর শ্রেণির জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণ হবে। এই শ্রেণির মধ্যে ৪৯টি মুসলিম জনগোষ্ঠী, ৬টি হিন্দু জনগোষ্ঠী আর ১টি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী রয়েছে। প্যাঁচটা এখানেই। ধরা যাক, কোনও দপ্তর ১০০ জনকর্মী নেবে। সংরক্ষণ মানলে ওই ১০০ জনের মধ্যে ১০ জন আসবেন অতি অনগ্রসর শ্রেণি থেকে। ধরা যাক, ওই ১০টি পদের জন্য মোট ১০০টি আবেদন জমা পড়ল। যাদের প্রত্যেকেই অতি অনগ্রসর শ্রেণির হলেও ধর্মীয় বিচারে ৭০ জন মুসলিম জনগোষ্ঠীর। বাকি মাত্র ৩০ জন অন্য জনগোষ্ঠীর। এখন নিয়োগকর্তা ইচ্ছা করলে ৭০ জন মুসলিমকে বাদ দিয়ে ওই ৩০ জনের মধ্যে থেকে ১০ জনকে বেছে নিতে পারবেন। এতে একজন মুসলিমও চাকরি পেলেন না। আবার আইনও ভাঙা হল না।

বর্তমান, ২৬. ০৯.২০১০

গতি বাঁচাতে এবার জাতপাতের তাস খেলতে চলেছেন বুদ্ধদেব

গদি বাঁচানোর শেষ চেষ্টা হিসাবে এবার লালু-মুলায়ম-মায়াবতীদের ধাঁচে জাতপাতের রাজনীতিতেই গা ভাসাতে চলেছে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর বামফ্রন্ট সরকার। রাজ্যে অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণির (ও বি সি) মানুষের প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণ করতে আগামী মাসে বিশেষ সুমারি বা সেন্সাস শুরু করতে চলেছে তারা। রাজ্যে ওবিসি'দের জন্য সংরক্ষণের হার আরও বাড়ানোর লক্ষ্যে মাস দুয়েকের মধ্যে এই সুমারির কাজ শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাইটার্স বিল্ডিংস এবং আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের কর্তারা। অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণদপ্তরের মন্ত্রী যোগেশ বর্মণ বলেন, "ও বি সি'দের প্রতি সুবিচার করতে হলে তাদের প্রকৃত সংখ্যা এবং আর্থিক অবস্থা জানা জরুরি। আমরা অনেক আগেই কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, জনগণনায় এই বিষয়টি যুক্ত করা হবে কি না। কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক আমাদের চিঠি দিয়ে সেই সম্ভাবনার কথা নাকচ করে দিয়েছে। এখন সর্বভারতীয় স্তরে নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু হলেও তাতে নিশ্চিত হতে পারছি না। তাই নিজেরাই সুমারির সিদ্ধান্ত নিয়েছি।" মহাকরণ সূত্রের খবর, জনসংখ্যা নিরূপণে রাজ্যের বিশেষ কিছু এলাকায় নমুনা সুমারি করা হবে। এই ব্যাপারে আলোচনার জন্য বিভাগীয় সচিব এস এন হক আগামীকাল মঙ্গলবার বৈঠক ডেকেছেন।

প্রসঙ্গত, আগামী বছর জনগণনায় জাতভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের দাবি তুলেছে দেশের প্রায় সব দলই। কিন্তু এর ফলে জাতপাত আরও মাথাচাড়া দিতে পারে মনে করে কেন্দ্র এখনও সবুজ সংকেত দেয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও বামফ্রন্ট সরকার যেভাবে নিজেদের উদ্যোগেই রাজ্যে জাতভিত্তিক জনগণনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাতে পরিষ্কার রাইটার্সের গদী বাঁচাতে জাতপাতের তাসই খেলতে চলেছ তারা। বছর কুড়ি আগে এইভাবেই মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করে কেন্দ্রের সরকার বাঁচাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং। বিন্দেশ্বরী মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টে ও বি সি'দের জন্য

২৭ শতাংশ সংরক্ষণ চালু করতে বলা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে ১৭৭টি সম্প্রদায়কে ওবিসি বলা হয়েছিল ওই রিপোর্টে। কিন্তু রাজ্যের তৎকালীন ভূমি ও ভূমি সংস্কারমন্ত্রী বিনয় চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন কমিটি সেই সুপারিশ খারিজ করে দিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও তখন বলতেন, পশ্চিমবঙ্গে ও বি সি-টো বি সি বলে কিছু নেই। অনেক আন্দোলনের পর সরকারি চাকরিতে ৭ শতাংশ সংরক্ষণ চালু হয় তাদের জন্য। সম্প্রতি ও বি সি মুসলিমদের জন্য আলাদা ১০ শতাংশ সংরক্ষণ চালু করার কথা ঘোষণা করা হলেও তা কার্যকর করা যায়নি। কিন্তু একের পর এক নির্বাচনে গরিব মানুষ বামফ্রন্টের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ায় সি পি এমের ভোট ম্যানেজাররা মনে করছেন, ও বি সি'দের জন্য সংরক্ষণ আরও না বাড়ালে এই বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠা অসম্ভব। জানা গিয়েছে, মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখিত ১৭৭টি সম্প্রদায়ের সংখ্যা নিরূপণ করে ও বি সি-কোটা বৃদ্ধি করা হবে। এখন তফসিলি জাতি উপজাতি এবং ও বি সি মিলিয়ে মোট ৩৫ শতাংশ সংরক্ষণ চালু আছে। মুসলিমদের জন্য ১০ শতাংশ কোটা চালু হলে তা বেড়ে হবে ৪৫ শতাংশ। সুপ্রিম কোর্ট ৫০ শতাংশ পর্যন্ত সংরক্ষণ মঞ্জুর করেছে। ফলে ও বি সি'দের জন্য আরও অন্তত ৫ শতাংশ বৃদ্ধিতে কোনও বাধা নেই। এস সি, এস টি, ও বি সি এবং সংখ্যালঘুদের একটি সংগঠনের নেতা কার্তিক কাপাসের দাবি, পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার অনুপাতে ২৭ শতাংশ সংরক্ষণের দাবি তুলেছি আমরা।

বর্তমান, ১৪.০৬.২০১০

চাকরি ও ব্যাংক ঋণে পর্যাপ্ত সুযোগ দিতে হবে মুসলিমদের

মুসলিমদের মন জয় করতে সি পি এম এখন মরিয়া। আর এক বছর পরেই পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ভোট আসন্ন। তাই সি পি এম আজ দাবি তুলল, ১) দলিত মুসলিম এবং ও বি সি মুসলিমদের সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ দিতে হবে। ২) রাজ্য পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ানদের চাকরিতে মুসলিমদের পর্যাপ্ত সুযোগ দিতে হবে। ৩) বিভিন্ন চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সংখ্যক মুসলিমদের নাম প্যানেলভুক্ত করতে হবে। ৪) ভূমি সংস্কার কর্মসূচীতে, বাড়িঘর বা শিল্প নির্মাণের জন্য জমি বণ্টনে, পেট্রল পাম্প ও রান্নার গ্যাসের ডিলারশিপে মুসলিমদের প্রাপ্তি সুযোগ সুনিশ্চিত করতে হবে। ৫) ব্যাংকগুলির ঋণপ্রদানের ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ মুসলিমদের জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে। ৬) পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসা সিলেবাসের ধাঁচে গোটা দেশে মাদ্রাসা পাঠ্যক্রম চালু করতে হবে। ৭) মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ এবং স্টাইপেন্ড ভাতার অঙ্ক মোটা হারে বাড়াতে হবে। ৮) একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মুসলিমদের জন্য আলাদা 'সাব প্ল্যান' করতে হবে। আরও একগুচ্ছ দাবি জানিয়েছে সিপিএম। গুজরাত দাঙ্গার দোষীদের কঠোর দণ্ডের দাবিও তার মধ্যে অন্যতম।

মুসলিমদের উন্নয়নে এরকম বহুবিধ দাবিসমেত পার্টির তরফে আজ এখানে একটি দাবিসনদ ঘোষণা করেছেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত। এদিন পার্টির সদর দপ্তর এ কে গোপালন ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি সনদটি ঘোষণার সময় প্রকাশ কারাত পাশে রেখেছিলেন সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, এম পি তথা মুসলিম উন্নয়ন সংক্রান্ত পার্টি সাব কমিটির আহ্বায়ক মহম্মদ সেলিমকে।

কারাত বলেন, রাজ্য সরকারগুলির পাশাপাশি কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকারের কাছেও

সিপিএম মুসলিমদের উন্নয়নকল্পে এই দাবিসনদ পেশ করবে। তবে সর্বাগ্রে পার্টি আজ প্রকাশিত দাবিসনদটি বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সংগঠনের কাছে পাঠিয়ে তাদের মতামত জানবে। তার ভিত্তিতে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সিপিএম এখানে মুসলিমদের উন্নয়কল্পে একটি সর্বভারতীয় সম্মেলন বা কনভেনশনের আয়োজন করবে। ওই সর্বভারতীয় কনভেনশন থেকে সিপিএম মুসলিমদের উন্নয়নকল্পে দাবিসনদটি চূড়ান্ত করবে বলেও জানান পার্টির সাধারণ সম্পাদক।

স্বাভাবিকভাবেই আজ রাজনৈতিক মহলের একাংশে এবং পর্যবেক্ষকদের মধ্যে সিপিএমের বিরুদ্ধে মুসলিম তোষণের জোরদার অভিযোগ উঠেছে। তার আগাম আঁচ করেই এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে প্রকাশ কারাত বলেন, 'এবার যে আমাদের বিরুদ্ধে মুসলিম তোষণের অভিযোগ নিয়ে দেশব্যাপী অপপ্রচার চলবে তা ভালোভাবেই জানি। কিন্তু এরকম অপপ্রচারের ভয় পেয়ে ইউ পি এ সরকারের পিছিয়ে যাওয়া বা নতিস্বীকার করা চলবে না। মুসলিমদের জাতীয় মূলস্রোতে প্রবেশের জন্য শিক্ষায় ও চাকরিতে সম্যক সুযোগ প্রাপ্তির সুবিধা সরকারকে করে দিতেই হবে।'

প্রকাশ কারাত জাতীয় রাজনীতির বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে মুসলিমদের উন্নয়ন কল্পে পার্টির এই দাবি সনদের ব্যাখ্যা দিলেও, বাম রাজনীতির পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন যে মূলত পশ্চিমবঙ্গে আগামী বছর পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিকে চোখ রেখেই সিপিএম এখন মুসলিমদের তুষ্ট করতে এমন মরিয়াভাবে আসরে নেমেছে। কারণ সম্প্রতি শিল্পায়নে জমি অধিগ্রহণের ইস্যুতে ভাঙর নন্দীগ্রামসহ পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে মুসলিম সম্প্রদায়ের এক বড় অংশ মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তথা সিপিএমের বিরুদ্ধে বেঁকে বসেছে।

বর্তমান, ০৬.০৩.২০০৭

ভারতে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেব, হুমকি আল কায়েদার

আমেরিকা এবং বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় দেশের পর এবার সরাসরি ভারতের বিরুদ্ধে 'জোহাদ' ঘোষণা করল আল কায়েদা। লাদেনবাহিনীর হুমকি ভারতে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেব। শুরু হবে বিস্ফোরণ, আত্মঘাতী হানা। তারা এবার টের পাবে কত ধানে কত চাল। আলকায়েদার এই হুমকি সংবলিত প্রচুর সি ডি জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। আর এর জেরে উপত্যকা জুড়ে দেখা দিয়েছে চরম আতঙ্ক। পুলিশ এবং উপত্যকায় মোতায়েন বিভিন্নবাহিনীর কর্তাদের মধ্যে চলছে ঘনঘন বৈঠক। পুলিশ ওই সিডি-র বিষয়বস্তু নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে। এই চরম হুমকি সম্বলিত সিডিটি শুক্রবার স্থানীয় এক সংবাদ সংস্থার দপ্তরে পাঠায় জঙ্গিরা। সঙ্গে আল কায়েদার অন্যতম শীর্ষ নেতা আবু আবদুল রহমান আল-আনসারির জারি করা একটি বিবৃতিও ছিল।

শ্রীনগরে এদিন জুম্মাবারের নমাজের সময় আচমকা ৩০টি সিডি মসজিদের ভিতর ছুঁড়ে দেওয়া হয়। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল গোপাল শর্মা জানিয়েছেন, তাঁরা বিষয়টি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আছেন। আপাতত সিডি টির যথার্থতা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এখনই এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে তিনি অস্বীকার করেছেন। ওই বিবৃতিতে আনসারি দাবি করেছেন, কাশ্মীর উপত্যকার বিভিন্ন মসজিদে অন্তত এক হাজার কপি সিডি বিতরণ করা হয়েছে। সিডি-তে এ কে অ্যাসল্ট রাইফেল হাতে মুখোশ পরিহিত এক জঙ্গিকে একটি লিখিত বিবৃতি পড়তে দেখা গিয়েছে। আরবি ও উর্দু ভাষার ১৫ মিনিটের ওই

সিডি-তে কয়েকজন হুরিয়ত নেতার ছবি দেখিয়ে তাঁদের ভূমিকার সমালোচনাও করা হয়েছে। এছাড়াও দেখানো হয়েছে কয়েকজন কাশ্মীরি রাজনৈতিক নেতার ছবি। তবে সিডি-তে হাজির হওয়া মুখোশ পরিহিত জঙ্গিই আনসারি কি না, তা স্পষ্ট নয়।

এই হুমকিতে অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। জনসাধারণকে ভয় দেখাতে জঙ্গিদের এটি একটি সস্তা পদক্ষেপ বলে এদিন দিল্লিতে মন্ত্রকের মুখপাত্র মন্তব্য করেছেন।

বর্তমান, ০৯.০৬.২০০৭

সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের স্কলারশিপের জন্য ১৭ কোটি টাকা মঞ্জুর

যে কাজটি বামফ্রন্ট সরকার গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেনি, চরম আর্থিক টানাটানির মধ্যেও সেই কাজটি করল নতুন সরকার— অর্থাৎ সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের স্কলারশিপের জন্য ২০১০-২০১১ সালে রাজ্য সরকারের দেয় ১৭ কোটি টাকা মঙ্গলবার মঞ্জুর করল এই দফতর। কেন্দ্র এর জন্য বরাদ্দ ৫১ কোটি টাকা দেওয়া সত্ত্বেও বিগত সরকার এই টাকা বরাদ্দ না করার কারণে ৫.৯৬ লক্ষ প্রি-ম্যাট্রিক সংখ্যালঘু এই বছরের স্কলারশিপ পায়নি।

সচিবের রিপোর্টে যখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়টি জানতে পারলেন, তখনই তিনি অর্থমন্ত্রী ড. অমিত মিত্রকে এই টাকার বরাদ্দ করা যায় কিনা বিবেচনা করে দেখতে বলেছিলেন। তখন সংখ্যালঘু দফতর এই ১৭ কোটি টাকা চেয়ে ফাইলটি এই দফতরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের, যাদের মধ্যে বেশিরভাগই মুসলিম, এই স্কলারশিপের টাকা না পাওয়ার ফলে তারা যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, সেই কথা বিবেচনা করেই অর্থের সঙ্কট থাকলেও, এই টাকা সরকার মঞ্জুর করল।

আগামি ৩০ জুলাই নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী যিনি সংখ্যালঘু দফতরেরও ভারপ্রাপ্ত— কিছু ছাত্র-ছাত্রীর (প্রি-ম্যাট্রিক এবং পোস্ট ম্যাট্রিক) হাতে এই স্কলারশিপের টাকা তুলে দেবেন বলে মঙ্গলবার মহাকরণে সরকারি সূত্রে জানা গেল। যেসব ছাত্ররা মেডিকেল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে, তারা পড়াশুনার পুরো টাকাই পাবে। তাদের মধ্যে কয়েকজন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবে।

গত আর্থিক বছরের স্কলারশিপের টাকা খরচ করা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রিপোর্ট না দিলে ২০১১-২০১২ সালের স্কলারশিপের জন্য কেন্দ্রের টাকা পাওয়া নিয়ে একটি অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল। রাজ্য সরকার এই ১৭ কোটি টাকা মঞ্জুর করাতে সেই অনিশ্চয়তা কেটে গেল। নিয়ম অনুসারে সংখ্যালঘু ছাত্রদের স্কলারশিপের জন্য কেন্দ্র দেয় ৭৫ শতাংশ টাকা আর রাজ্য দেয় ২৫ শতাংশ। পোস্ট ম্যাট্রিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীরা, যারা এই স্কলারশিপ পায়, তাদের সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ।

এই আর্থিক বছরের প্রি-ম্যাট্রিক স্কলারশিপের জন্য রাজ্য সরকার এবার কেন্দ্রের কাছে প্রায় ৭ কোটি টাকা বেশি চাইবে। কারণ এবার ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা গতবারের তুলনায় বেড়েছে। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক দিল্লিতে যে বৈঠক ডেকেছে, তাতে যোগ দিতে মঙ্গলবার দিল্লি গেলেন সংখ্যালঘু দফতরের বিশেষ সচিব এস এন হক। তিনি দিল্লি রওনা হওয়ার আগে অর্থ দফতরের এই ১৭ কোটি টাকা মঞ্জুর হওয়ার কথা জেনে গেলেন। নইলে কেন রাজ্য সরকার গত আর্থিক বছরের স্কলারশিপের জন্য এই টাকা মঞ্জুর করেনি, তার জন্য জবাবদিহি করতে হত— শুধু তাই নয়, এই আর্থিক বছরে কেন্দ্রের কাছ থেকে

এই বরাদ্দ টাকা পাওয়া নিয়েও সমস্যা দেখা দিত।

ইতিমধ্যে, কবে স্কলারশিপের টাকা দেওয়া হবে, তার খবর জানতে প্রায় প্রতিদিনই ছাত্রদের অভিভাবকেরা সংখ্যালঘু দফতরে টেলিফোন করছেন। দফতর সূত্রের খবর, এখন এই টাকা যথাসম্ভব তাড়াতাড়িই দেওয়া শুরু হয়ে যাবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মিলে সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন ধরনের স্কলরশিপের জন্য বছরে খরচ করে প্রায় ১২২ কোটি টাকা। এই স্কলারশিপের টাকা আরও বাড়ানো যায় কিনা তাও বর্তমান সরকারের চিন্তাভাবনার মধ্যে রয়েছে বলে জানা গেল।

দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান, ২৭.০৭.২০১১

মাদ্রাসা নয়, চাই মূলধারার শিক্ষা

পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু সমাজ ভীষণ দরিদ্র ও অশিক্ষিত। তাদের জন্য প্রয়োজন মূলধারার শিক্ষা ও সরকারি সহযোগিতা, মাদ্রাসা মূলধারার শিক্ষা নয়। বিশেষ করে খারিজি মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমে মধ্যযুগীয় প্রাচীনতা ও ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া অন্য কিছু শেখানো হয় না। কোথাও ব্যতিক্রম থাকতে পারে, সেটা আলোচনার বিষয় নয়। এখন প্রশ্ন হল, খারিজি মাদ্রাসায় পড়ে আদৌ কোনও চাকরি পাওয়া যাবে কিনা? নিশ্চিত পাওয়া যাবে না। কারণ ফেকাহ্ ও হাদিস পড়া কোনও ব্যক্তিকে নিয়ে সরকারি অফিসগুলি কী করবে? কোনও সরকারি বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে এদের শিক্ষকতার চাকরি দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ এরা গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইংরাজি প্রভৃতি নানা বিষয়ে অজ্ঞ। কারিগরি বিষয়ে সম্পূর্ণ অপারদর্শী।

সর্বোপরি মৌলবাদী ও গোঁড়া প্রাচীনপন্থী কিছু মানুষজন মাদ্রাসা ঘিরে জীবনযাপন করেন। গ্রামের মানুষের আর্থিক সাহায্যে এঁরা অলসভাবে দিনযাপন করে কর্মবিমুখ হয়ে পড়েন। এঁরা চান গ্রামে গ্রামে দু'চারটি করে মাদ্রাসা নির্মিত হোক— তাহলে এঁদের গ্রাসাচ্ছদের একটা সুবন্দোবস্ত হয়। সভ্যতার থেকে মুখ ফিরিয়ে এরা চান মেয়েরা বোরখা পরে গৃহের আড়ালে থাকুক। গ্রামে গ্রামে মৌলবী সমাজ এই একবিংশের প্রথম দশকেও প্রচার করেন— টিভি দেখা নিষিদ্ধ, ছবি আঁকা ও সাহিত্য রচনা হারাম তথা নিষিদ্ধ ও অবৈধ কাজ। বিজ্ঞানের যে-কোনও আবিষ্কারকে এঁরা ঘৃণার চোখে দেখতে ভালোবাসেন। এঁরা চান আপামর মুসলমান সমাজ মাদ্রাসায় আরবি জানুক আর মধ্যযুগীয় ভাবনায় নিজেকে চালিত করুক। মাদ্রাসা আর এই অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মৌলবী সমাজ এক সুতোয় বাঁধা।

আমরা জানি, একবিংশের প্রথম দশক এখন অতিক্রান্ত। এই ক্রান্তিলগ্নে ওদের ডাকে সাড়া দেওয়া সম্ভব? সম্ভব নয়, উচিতও নয়। ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়। তাকে মাদ্রাসায় কুক্ষিগত করে মোল্লাতন্ত্র নিজেদের স্বার্থ ও আখের গোছাতে ব্যস্ত।

অথচ আমরা জানি, পশ্চিমবঙ্গের আপামর মুসলমান সমাজ ধর্মনিরপেক্ষতা ও শান্তি চান। তাই মাত্র চার শতাংশ মুসলমান আজ মাদ্রাসা অভিমুখী। এই চার শতাংশ অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারভুক্ত। এদের পড়াশোনার খরচ জোগানোর ক্ষমতা নেই। তাই খারিজি মাদ্রাসায় গিয়ে দু'বেলা খাওয়া, সামান্য আশ্রয় ও আরবি শিক্ষাটুকু পেতে চান। এরা পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক সাহায্য পেলে সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতেই পড়ত, মাদ্রাসায় যেত না।

প্রকৃত সত্য এই যে, পশ্চিমবঙ্গে আদৌ দশ হাজার খারিজি মাদ্রাসা নেই। কিন্তু যেই সরকারি অনুমোদনের প্রশ্ন এসেছে তখনই ব্যাঙের ছাতার মতো মাদ্রাসা গজিয়ে উঠতে দেরি হবে না। কারণ আজ যেটি প্রাথমিক অনুমোদিত, আগামীতে আন্দোলন করে সেগুলি

পূর্ণ অনুমোদন করিয়ে নেওয়া অসম্ভব কিছু নয়। যে-কোনও রাজনৈতিক দল সেই আন্দোলনে ইন্ধন জোগাবে— কারণ ভোট। ভোটের রাজনীতিতে সবই সম্ভব।

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের সঙ্গে 'মাদ্রাসা' কথাটি যুক্ত করাটিও অযৌক্তিক ও ব্যাকরণগত ভুল। 'মাদ্রাসা' কথার অর্থ হল শিক্ষাক্ষেত্র বা বিদ্যালয়। তাহলে আলিয়া মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয় কথাটির অর্থ দাঁড়াল আলিয়া শিক্ষাক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়। ত্রুটিপূর্ণ মনে হচ্ছে নাকি! বরং আসুন আমরা ইতিহাস সচেতন হই। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম হোক— কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়। নজরুল ইসলাম আপামর বাঙালির প্রিয় কবি। সর্বোপরি তিনি ধর্মনিরপেক্ষ ও উদার ছিলেন। তাঁর নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ করে আমরা এক মহতী কর্তব্য সম্পাদন করি।

মাদ্রাসা নয়, সংখ্যালঘু এলাকায় স্কুল-কলেজ হোক, গার্লস কলেজ হোক। আমরা পূর্ণ সমর্থন করছি। বিজ্ঞান মঞ্চ স্থাপিত হোক গ্রামে গ্রামে, যাতে মানুষ যুক্তিবাদী ও চিন্তাশীল হয়ে ওঠে। খারিজি মাদ্রাসার অনুমোদন দিয়ে আগামী দিনের জন্য অশান্তি ও নতুনতর মৌলবাদের প্রসারে উৎসাহ না দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

এই সিদ্ধান্ত এখনই প্রত্যাহার করা হোক। আসুন, সব সমাজের মানুষ মিলে মিশে বসবাস করি। সবার উপরে মানুষ সত্য। —নাসিম-এ-আলম, কার্ণাহার, বীরভূম

দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান, ০৯.০৭.২০১১

যে সমস্ত বই ও পত্র পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে

(তথ্যসূত্র ও স্বীকৃতি)

১।	স্বদেশ সংহতি সংবাদ	মাসিক পত্রিকা
২।	ও বি সি সংবাদ	,,
৩।	স্বস্তিকা	সাপ্তাহিক পত্রিকা
৪।	দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান	দৈনিক সংবাদপত্র
৫।	বর্তমান	,,
৬।	একদিন	,,
৭।	দ্য স্টেটস্‌ম্যান	,,
৮।	সালাম আজাদ	এথ্‌নিক ক্লিনসিং
৯।	সালাম আজাদ	সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কেন দেশত্যাগ করছে
১০।	রমেশচন্দ্র মজুমদার	বাংলাদেশের ইতিহাস
১১।	মায়ের ডাক	মাসিক পত্রিকা
১২।	সকালবেলা	দৈনিক পত্রিকা
১৩।	আনন্দবাজার পত্রিকা	,,
১৪।	National Spirit	সাপ্তাহিক পত্রিকা
১৫।	Hindu Voice	মাসিক পত্রিকা
১৬।	Shri J. N. Mondal	দলিত নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল পদত্যাগ করেছিলেন কেন?

"যে শুধু নিজের সুখ সুবিধা আরাম বিরাম নিয়ে থাকে সে কি আর মানুষ। দেশের দুঃখ দুর্দশায় যাহার প্রাণ কাঁদে না, জাতি ও সমাজের বিপদে আপদে যে ব্যথা অনুভব করে না সে তো নিতান্ত জড় পদার্থ। গাছ পাথরের সঙ্গে তাহার পার্থক্য কি? এরূপ লোক শত সহস্র থাকিলেই বা জাতির কি আসে যায়?..."

— শ্রী শ্রী প্রণবানন্দ মহারাজ